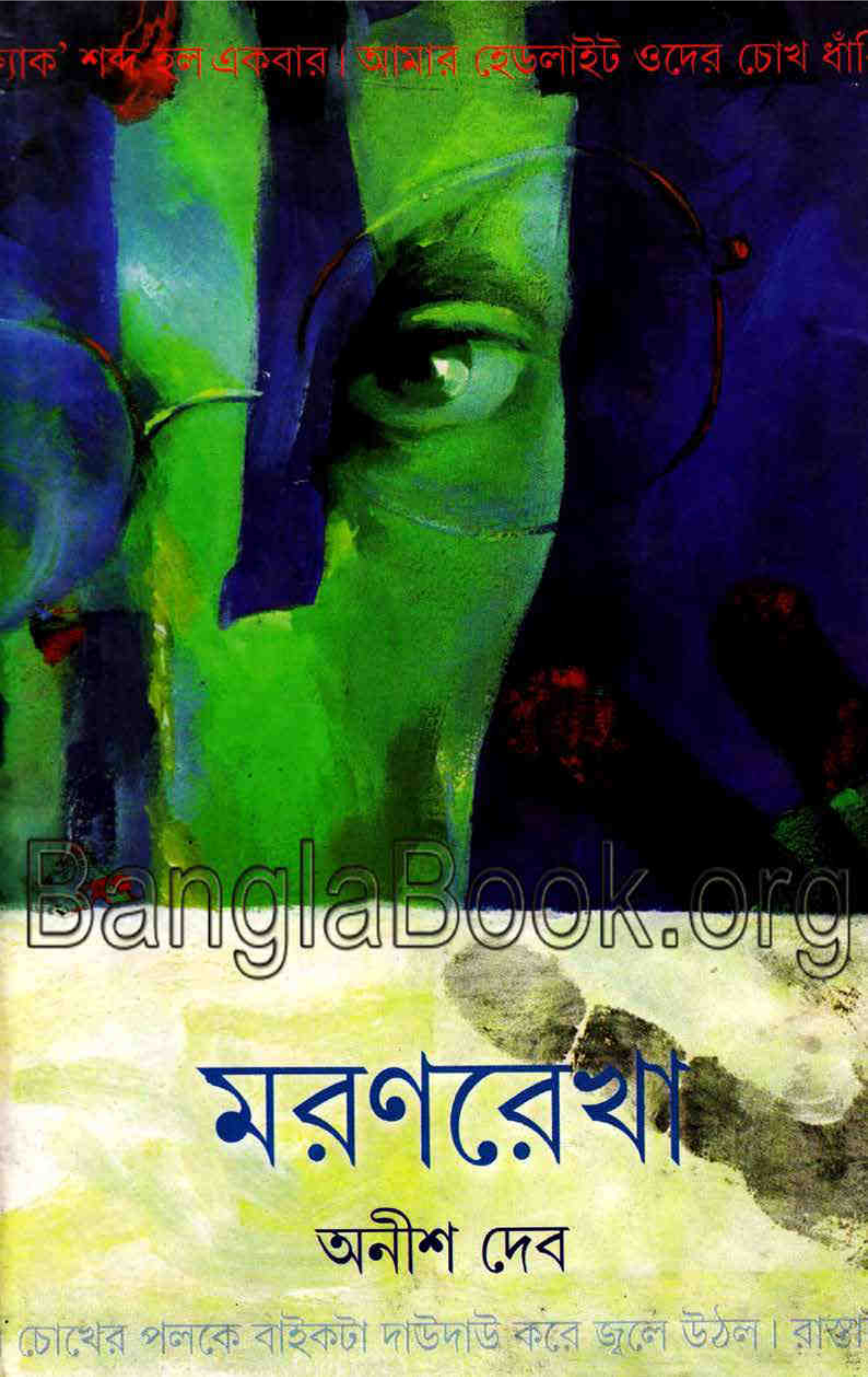

্যাক' শব্দ হল একবার। আমার হেডলাইট ওদের চোখ ধাঁ
BanglaBook.org
মরণরেখা
অনীশ দেব
চোখের পলকে বাইকটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। রাস্তা



জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতায়। স্কুলের পড়াশোনা ঃ হিন্দু স্কুল। সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি. টেক., এম.টেক. ও পিএইচ.ডি.। পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক।

কর্মজীবনে ১৯৮৩ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার। ১৯৯০ থেকে ওই বিভাগেই রিডার, আর ১৯৯৮ থেকে প্রফেসার। ২০১৬-য় অবসর নিয়েছেন।

লেখালেখির শুরু ১৯৬৮-তে, অধুনালুপ্ত 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'য়।

প্রকাশিত কয়েকটি গল্পগ্রন্থ ঃ **অনীশের সেরা ১০১, অশরীরী ভয়ংকর, দেখা যায় না শোনা যায়, তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট, ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা, বারোটি রহস্য উপন্যাস, পাঁচটি রহস্য উপন্যাস, ভয়পাতাল, কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র, বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প, ভৌতিক অলৌকিক, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র** ইত্যাদি।

জনপ্রিয়-বিজ্ঞান গ্রন্থ **বিজ্ঞানের হরেকরকম, সহজ কথায় ইন্টারনেট, কেমন করে কাজ করে যন্ত্র, রোমাঞ্চকর ধূমকেতু** ইত্যাদি।

প্রধান নেশা—রহস্য-গোয়েন্দা, অলৌকিক ও কল্পবিজ্ঞান কাহিনি লেখালেখি, জনপ্রিয় বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান গবেষণা এবং কম্পিউটার।

পেয়েছেন প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৮), ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯), **পাই নিয়ে রূপকথা** বইয়ের জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার (২০১২) ও দীনেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (২০১৪)। সম্পাদনা করেছেন অল্পকালজীবী কয়েকটি মাসিক পত্রিকা ও বিমল করের 'গল্পপত্র' পত্রিকার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা।

প্রচ্ছদ **রঞ্জন দত্ত**

মরণরেখা

মরণরেখা

অনীশ দেব

এ পি পি
১১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

MARONREKHA
ANISH DEB

- প্রকাশ কাল
  কলকাতা বইমেলা, ২০০৫

- বর্ণবিন্যাস
  এপিপি লেজারগ্রাফ
  ১১৭ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
  কলকাতা-৭০০ ০০৯

- প্রকাশক
  অশোক রায়
  এপিপি
  ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
  কলকাতা-৭০০০০৯

- মুদ্রক
  ফ্যাক্টরী :
  রেনবো প্রিন্টার্স
  ৪০ডি /এইচ/৭/৮ উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী রোড
  অফিস :
  ১৬সি, ধনদেবী খান্না রোড
  কলকাতা- ৭০০ ০৫৪

- প্রচ্ছদ
  অমিতাভ চন্দ্র

মূল্য ঃ ৭০ টাকা

বরুণ রায়
প্রীতিভাজনেষু

'মরণরেখা' লেখাটি প্রথম বেরোয় 'সুখী গৃহকোণ' পত্রিকায় ২০০৪ সালের এপ্রিল সংখ্যায়। সামান্য ঘষামাজা করে নিয়ে আসা গেল এই বইয়ের দু-মলাটে। 'মোনালিসার শেষ রাত' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে 'মাসিক রোমাঞ্চ' পত্রিকায়। বই হয়ে বেরোয় ১৯৮৩-তে। সেটাকেও একধরনের মমতা থেকে নিয়ে এলাম এই বইতে। শেষ লেখাটি, অর্থাৎ, 'আমার যুদ্ধ' বেরিয়েছিল 'প্রসাদ' পত্রিকায় ১৯৮৬-তে। পরে, ১৯৯৮-এ, 'আঁধারপ্রিয়া' বইতে জায়গা পায়। সেটাকেও সামান্য পরিমার্জনা করে নিয়ে এলাম এই বইতে। ব্যস, সাফাই এইটুকুই।

অনীশ দেব

সূচিপত্র

মরণরেখা

ছোট্ট একটা নোংরা ঘরে ছোট্ট একজন নোংরা মানুষ।

ঘরের ভেতরটা যেমন নোংরা তেমনই নোংরা ওঁর মনের ভেতরটাও।

সেইজন্যেই ওঁকে সবাই ভয় পায়। আমিও সেই নিয়মের বাইরে নই। তাই ওঁকে একটু-আধটু যেমন ভয় পাই তেমন সাবধানও থাকি। আসলে আমার কাজের লাইনটাই 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' টাইপের। মানে, আমার দুটিমাত্র চাকর : জীবন আর মরণ। এ ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

নাগিনাসাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিড়ি টানছিলেন। ছোট্ট ঘরটা বিড়ির গন্ধে বস্তির বাথরুমের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমি ঘরে ঢোকামাত্রই নাগিনাসাহেব সামনের টেবিলের ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। চোখের মণি দুটো ওপরে তুলে এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যে, মণিদুটো বলতে গেলে ভুরুর নীচে লুকিয়ে পড়ল।

'বোসো, চন্দর। ইমার্জেন্সি। বহত জরুরি কথা আছে।'

আমার নাম চন্দ্রকান্ত। নামটা খারাপ না হলেও এ-লাইনের পক্ষে বড্ড লম্বা। তাই সবাই চন্দর বলে ডাকে।

আমি টেবিলের এপাশে বসে পড়লাম। নাগিনাসাহেবের বিড়ির গন্ধকে ঠেকানোর জন্যে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম। তারপর নোংরা ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নাগিনাসাহেবের মনের ভেতরটা আঁচ করার চেষ্টা করলাম।

ঘরটা মাপে বড়জোর দশ বাই দশ—অথচ তার ভেতরে ঠাসা কয়েকশো জিনিস।

দুটো শো-কেসজাতীয় আলমারি। তার বেশিরভাগ কাচই ভাঙা। যেগুলো ভাঙা নয় সেগুলো এমনই ময়লা যে, তার ওপিঠে কী আছে দেখার উপায়ও নেই।

আলমারি দুটোর মাথায় রাজ্যের খবরের কাগজ, পিচবোর্ডের বাক্স, কাপড়ের পুঁটলি এসব হাবিজাবি চাপানো। তার পাশ দিয়ে ইলেকট্রিকের তার চলে গেছে। সেই তার বেয়ে মর্নিংওয়াক করছে ইঁদুরছানা।

ঘরটা অন্ধকার—তাই দিনের বেলাতেও এক[illegible] বাল্‌ব জ্বলছিল। মাথার ওপরে একটা পুরোনো আমলের ডাব্বু পাখা ক্যাঁচক্যাঁচ করে ঘুরছিল। ঘরের চারটে দেওয়ালেই ড্যাম্প আর নোনা। এখানে-ওখানে রং খসে গিয়ে সিমেন্ট-বালি দাঁত বের করে হা-হা করে হাসছে।

'চন্দর, একটা মেয়েকে বারাসাত থেকে তোল্লাই করে লিয়ে আসতে হবে। আজ রাতে।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলাম, নাগিনাসাহেব হাত তুলে আমাকে বাধা দিলেন 'না, না, কিডন্যাপিং-এর কেস না। তোমার কাজের লিস্টি কি আমার মালুম নেই? এটা একটা পিকিউলিয়ার স্পেশাল কেস।' বিড়িতে একগণ্ডা কড়া টান। তারপর 'আসলে চন্দর, এই মেয়েটা দল বদলি করছে। বাবুরামের গ্যাং থেকে আমার গ্যাঙে আসতে চায়।'

আন্ডারওয়ার্ল্ডে দলবদলের ব্যাপারটা পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ডের মতোই পপুলার। আজ কেউ মাফিয়া ডন নাগিনার অ্যালসেশিয়ান তো কাল ডন বাবুরামের ডোবারম্যান। তবে আমি কারও কুকুর নই—যদিও আমি নিয়মিত ডন-বৈঠক করি—মানে, ডনদের সঙ্গে বৈঠক। আমি কাজ দিই, ওরা পয়সা দেয়।

আমি কাজ করি স্বাধীনভাবে। তবে ডনদের কাজিয়ার মধ্যে থাকি না। যেহেতু কাজটা মন দিয়ে করি তাই আমাকে না হলে ওদের চলে না। আবার ওরা আছে বলেই আমি আছি। এ-লাইন বেলাইন হলে আমার কপাল ঠনঠন গোপাল।

নাগিনাসাহেব বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা নাকের ফুটোয় গুঁজে দিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। সেই অবস্থাতেই ডানহাতের আঙুলে চেপে ধরা বিড়িটায় কায়দা করে একজোড়া টান দিলেন। তারপর গল্পটা আমাকে শোনালেন।

মেয়েটির নাম নিশা। বছরপাঁচেক ধরে বাবুরামের দলে আছে। এখন দল ছেড়ে দিতে চায়। সাধারণত এরকম শখ হলে সে খালাস হয়ে যায়। কিন্তু নিশার বেলায় সেটা হয়নি। কারণ, ওই দলেরই মিরচান্দানি নামে একটা ছেলে নিশাকে ভালোবেসেছে—ওকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়। তাই মিরচান্দানি নিশাকে নাগিনাসাহেবের দলে ঢোকাতে চায়। পরে ও নিজেও দলবদল করবে। কারণ, ওরা দুজনে নাগিনার দলে চলে এলে আর কোনও চিন্তা নেই। ওরা বিয়ে-শাদি করে দলে থাকতেও পারে, দল ছেড়েও দিতে পারে। নাগিনাসাহেবের দলে এরকম কোনও বেরহেম নিয়ম নেই যে, দল ছাড়লে দুনিয়া ছাড়তে হবে।

সুতরাং, খুব সাবধানে এবং গোপনে নিশাকে নাগিনাসাহেবের কাছে নিয়ে আসতে হবে। এর এতটুকু এদিক-ওদিক হলে চলবে না।

নাগিনাসাহেব হাতে বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ওটা ছুড়ে ফেলে দিলেন ঘরের মেঝেতে। তারপর জিভ ঠোঁটে ঠেকিয়ে 'থু-থু' শব্দ করলেন।

'চন্দর, তুমি তো জানো, আমি কাউকে ডিসটার্ব করি না—যদি না সে আমাকে ডিসটার্ব করে। মন চায় তো আমার গ্যাঙে থাকো, কাম করো, খাও-দাও ফুর্তি মওজ করো—আর যদি মন না চায় তো কোই বাত নহি—যেখানে মন চায় চলে যাও। কোনও সালা বলতে পারবে না নাগিনা বেরহেম, সঙ্গদিল, নাগিনার মনে কোনও দয়া-মায়া নেই। নাগিনার সিরফ একটাই কথা

ডোন্ট ডিসটার্ব মি।'

নাগিনাসাহেবের কথাগুলো শুনতে-শুনতে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিলাম। বেশ মিষ্টি করে সুরেলা ঢঙে কথাগুলো বলছিলেন নাগিনা। কিন্তু আমি জানি, সাঙ্ঘাতিক দয়ালু এই মানুষটার আসল কথা হল : 'ডোন্ট ডিসটার্ব মি।' এই কথাটার আসল অর্থ যারা জানে তারা জানে। আমিও জানি।

এই ঘরটা নাগিনাসাহেবের ড্রয়িং রুম। তবে 'ড্রয়িং' বলতে ছন্নছাড়া আঁকিবুকি।

ঘরের একপাশে বেশ কয়েকটা নোংরা জামাকাপড়। একটা পেরেক থেকে অন্তত গোটাছয়েক ক্যালেন্ডার ঝুলছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ওপরেরটা এ-বছরের— বাকিগুলো তার আগের এবং তার আগের।

হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। ওটা মেঝেতে ফেলে পায়ে ঘষে নিভিয়ে দিলাম।

যে-চেয়ারটায় বসেছিলাম সেটা ঠকঠক করে নড়ছিল। সেই আওয়াজে ফোঁস-ফোঁস শব্দটা আমি শুনতে পাইনি।

নাগিনাসাহেব ঘাড় হেলিয়ে কান পাতলেন। তারপর বললেন, 'খাওয়ার সময় হয়ে গেছে...' এবং জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন।

মানুষটা উঠে দাঁড়াতেই বোঝা গেল উচ্চতা মোটেই বেশি নয়। গাট্টাগোট্টা গোলগাল চেহারা। মাজা রং। মাথায় কোঁকড়ানো চুল—বেশ ছোট করে ছাঁটা। ঠোঁটজোড়া কালচে। অল্পস্বল্প গোঁফ আর দু-চারদিনের না-কামানো দাড়ি। কেন যে এই লোকটাকে সবাই নাগিনা 'সাহেব' বলে কে জানে!

থুতনিতে আলতো করে বারকয়েক আঙুলের টোকা মারলেন নাগিনা। পেরেকে ঝোলানো ক্যালেন্ডারগুলোর দিকে পা ফেলে এগোতে-এগোতে বললেন, 'কাজটায় রিস্ক আছে—তাই তোমাকে ডেকেছি। এ-কাজে গায়ের জোর চাই, মনের জোর চাই, বুদ্ধির জোরও জরুরি। আমার গ্যাঙে এরকম কোনও মাল নেই। তা ছাড়া আমার সবক'টা বাবুয়াকেই বাবুরামের গ্যাঙের বাবুয়ারা চেনে। যদি ওরা ধরে ফ্যালে যে, নিশাকে আমি তুলছি, তাহলে গ্যাং-ওয়ার লেগে যাবে। আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা আছে সেটা ভায়োলেট হয়ে যাবে। তুমি এ-কাজ নামালে সালা আমি বলব, কে করেছে কওন জানে। আই অ্যাম ক্লিন। তোমার ছাড়া লাইনে আর কে আছে!'

কথাটা তোয়াজের বলে শুনতে খারাপ লাগে না। তবে কথাটা মিথ্যে নয়। গায়ের জোর আমার আছে। মনের জোর, এবং বুদ্ধির জোরও। আমি নিয়মিত ডন-বৈঠক করি—এবার অবশ্য ব্যায়ামের কথা বলছি। ছোটবেলা থেকে দুঃখ-কষ্ট-লাথি-ঝাঁটা খেয়ে বড় হয়েছি—তাই মনের জোর তৈরি হয়েছে। আর বুদ্ধির জোর আমার কাজ-কারবারের ক্যাপিটাল।

ক্যালেন্ডারগুলোর নীচে দুটো কাচের বাক্স চাদরে চাপা দেওয়া ছিল। নাগিনা সেখানে গিয়ে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়লেন। একটানে চাদরটা সরিয়ে দিলেন। তারপর বাক্সের ঢাকনা খানিকটা করে খুলে দিলেন।

অমনি ফোঁস-ফোঁস শব্দটা প্রচণ্ড বেড়ে গেল।

তখনই আমি চন্দ্রবোড়া সাপ দুটোকে দেখতে পেলাম।

দুটো সাপ মোটামুটি একই মাপের—জিলিপির আড়াই প্যাঁচ তৈরি করে দিব্যি শুয়ে আছে। তবে দুটোরই তেকোণা মাথা কুণ্ডলীর প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে—শূন্যে সামান্য উঠে আছে। চেরা জিভ দুটো নড়ছে, চেরা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সড়সড় করে বেরোচ্ছে আর ঢুকছে।

মোটাসোটা পিছল দেহ, সারা গায়ে গাঢ় বাদামি চাকা-চাকা দাগ। ফোঁস-ফোঁস শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ওদের শরীরটা বারবার ফুলে-ফুলে উঠছে।

এই সাপ দুটো আগে কখনও নাগিনাসাহেবের ঘরে দেখিনি।

'ওরা আসলে ব্যাঙের গন্ধ পেয়েছে—' আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন নাগিনা। কড়ে আঙুল কানে ঢুকিয়ে চোখ বুজে মুখ বেঁকিয়ে কান চুলকোলেন কিছুক্ষণ। তারপর কয়েকবার কেশে ঘরের এককোণে গিয়ে দেওয়ালের খাঁজে শব্দ করে থুতু ফেললেন।

চন্দ্রবোড়ার নাক নেই। তার বদলে আছে জ্যাকব্‌সন্‌স অরগ্যান। ওরা চেরা জিভ দিয়ে ঘ্রাণরেণুর খবর নেয়। তারপর সে-খবর পৌঁছে দেয় জ্যাকব্‌সন্‌স অরগ্যানে। সেখানেই চলে গন্ধবিচার।

লেখাপড়া-টরা আমিও করেছিলাম...সে কবেকার কথা! মনে পড়লে আক্ষেপ হয়। তাই সে-ব্যথা ভুলতে নাগিনাসাহেবের দিকে মনোযোগ দিলাম।

'আমার সেফটির জন্যে এ-দুটোকে আনিয়েছি, চন্দর।' থুতনিতে আলতো টোকা মারতে-মারতে বাক্স দুটোর কাছে ফিরে এসে বললেন নাগিনাসাহেব, 'তোমার নামের সঙ্গে ওদের নামের মিল আছে : চন্দ্রবোড়া।' এ-কথা বলেই নাগিনা গলা মিহি করে খিকখিক করে হেসে উঠলেন 'জানো তো, ওদের বহুত বিষ—হেভি জহরিলা। সালা এক-একটা বিষদাঁতই এক-এক সেন্টিমিটার লম্বা। এরা যে-কোনও পজিশন থেকে ছোবল মারতে পারে...হুঁ!'

চন্দ্রবোড়া সাপের খবর নাগিনাসাহেবের চেয়ে আমি কিছু কম রাখি না। ওরা ছোবল মারলেই নামের আগে চন্দ্রবিন্দু। কিন্তু নাগিনাসাহেব এই জোড়া-সাপ নিয়ে কী ছক কষছেন? আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন নাকি?

সেটাই নাগিনাসাহেবকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি এই যমজ সাপ নিয়ে কী করছেন? দুশমনদের ভয় দেখিয়ে দোস্ত বানাবেন নাকি?'

'এরা হেভি সার্ভিস দেয়, চন্দর। শুনলে তোমার তাজ্জব মনে হবে।'

কথা বলতে-বলতে বাক্সদুটোর পাশে রাখা একটা টিনের কৌটো হাতে তুলে নিলেন নাগিনা। কৌটোর ঢাকনা খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। একটা বড়সড় ব্যাং বের করে নিয়ে এলেন বাইরে। তারপর 'চকাৎ' শব্দ করে ওটার মাথায় চুমু খেলেন।

আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল।

কিন্তু তখনও অনেক বাকি ছিল।

আচমকা ঝুঁকে পড়ে ব্যাংটাকে একটা কাচের বাক্সে ফেলে দিলেন নাগিনা। বললেন, 'এরা জেনারালি ইঁদুর বা পাখি খেতে পছন্দ করে। কিন্তু সেগুলো এখানে রোজ-রোজ জোগাড় করা মুশকিল। তাই ব্যাঙের আদত করাচ্ছি।'

সাপটা বোধহয় ক্ষুধার্ত ছিল। কারণ, ব্যাংটা বাক্সে পড়ামাত্রই ওটা ছোবল মারল।

আর একইসঙ্গে আমাকে চমকে দিয়ে নাগিনার হাত সাপটার ঘাড় লক্ষ করে ছোবল মারল।

সাপটার ঘাড় মুঠো করে ধরা অবস্থায় নাগিনার হাত ধীরে-ধীরে উঠে এল বাইরে। সাপটা হাঁ করে আছে বটে, কিন্তু বোঝা যায় ওর তেজের আঁচ কমে গেছে। একটু আগেই ও ব্যাংটার শরীরে বিষ ঢেলে ব্যাংটাকে কাহিল করে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর পিছল শরীরটা নাগিনার হাত পেঁচিয়ে ধরল। কিছু একটা করতে চাইল।

আমাকে আবার অবাক করে দিয়ে নাগিনাসাহেব চন্দ্রবোড়াটার তেকোণা মাথার ওপরটায় চকিতে চুমু খেলেন। ঠিক যেন ঠোঁটের ছোবল।

তারপর সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে ওর জোড়ুয়া ভাইটাকে আর-একটা ব্যাং দিলেন। বাক্সের ঢাকনা দুটো ঠিক করে জায়গা মতো টেনে দিলেন এবং কৌটোর মুখ বন্ধ করে সেটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন। অবশেষে শব্দ করে হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে শরীরটা সোজা করে আমার দিকে চেয়ে হাসলেন।

'চন্দর, আমার গ্র্যান্ডফাদার বেদে ছিল। সাপ-খেলা দেখিয়ে পেট ভরাত। আমিও মাঝে-মাঝে সাপ নিয়ে খেলি। আর...আর সাপের মাথায়ও চুমু খাই, ব্যাঙের মাথায়ও চুমু খাই। দু-তরফে চুমু খাওয়ার খেলা আমার জানা আছে। তাই আর-কেউ এ-কাজ করলে ভীষণ রাগ হয়....।'

বুঝলাম, নাগিনা ইশারায় আমাকে সাবধান করছেন। তাতে আরও বুঝলাম, নিশার কেসটা খুবই জবরদস্ত। মেয়েটাকে গোটা সহিসলামৎ ইন-ওয়ান-পিস নাগিনার কাছে পৌঁছতেই হবে—যে করে হোক।

আমি বললাম, 'নিশাকে ঠিক কোন জায়গা থেকে ক'টার সময় তুলতে হবে বলুন। আর ওকে কোথায় নিয়ে আসব—এখানে?'

নিজের ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। আজকের ঘটনা আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ওই মেয়েলি কণ্ঠস্বর। রাতের স্বপ্নে যে-মেয়েলি চিৎকারটা আমি শুনতে পাই, আজ ক্লাসরুমে সেই মেয়েটিই যেন আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছিল। যতই ব্যাপার দুটো পাশাপাশি মিলিয়ে দেখছি ততই যেন বিশ্বাসটা মজবুত হচ্ছে। মাকে এসব বলা যাবে না। মিতা ফিরলে ওর সঙ্গে একবার আলোচনা করে দেখব। সত্যিই কি আমার ভয়ের কোনও ভিত্তি আছে? ভাবতে-ভাবতে তন্দ্রায় চোখ বুজে এল।

রাতের অন্ধকারে লেকের জল চিরে ছিপটা আবার ভেসে আসছিল। আগের মতোই সেই দুটো ছায়ামূর্তি। আবার মাথায় লাঠির আঘাত। তারপর তীক্ষ্ণ কিছু বুকে বিঁধে যাওয়ার বেদনা। ঠান্ডা জল আমার নাকে-মুখে ঢুকে পড়ছে। দম আটকে আসছে। আ-আঃ!

মিতার ধাক্কায় আমার স্বপ্ন ভাঙল। বড়-বড় শ্বাস নিয়ে আমি হাঁপাচ্ছিলাম।

ও বলল, 'তুই আজ ডক্টর প্রধানের কাছে যাসনি?'

মিতাকে সব খুলে বললাম।

ও কিছুক্ষণ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর বলল, 'তুই কি তাহলে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবি?'

আমি বললাম, 'কী জানি—।'

'ক্লাসে তোর কথাগুলো টেপ করলে পারতিস—।'

'কেন?'

'আমার বন্ধু রমা আছে, তুই চিনিস, আমাদের বাড়িতে অনেকবার এসেছে। ওই যে চশমা চোখে, রোগা মতন, কথায়-কথায় হিন্দি বলে—।'

আমি হেসে বললাম, 'মনে পড়েছে, সমস্তিপুরের প্রোডাক্ট—ক্যালকাটায় ইম্পোর্টেড। ওকে একদিন বলেছিলাম, পল সায়েন্সে এম. এ. না পড়ে হিন্দিতে পড়লে পারতে। ও বলেছিল, কেন এম. এ. পাশ করে আবার সমস্তিপুরে ফিরে যাব নাকি! সেই রমা তো?'

মিতা হেসে বলল, 'হ্যাঁ। ওর পিসেমশাই ডক্টর নবকৃষ্ণ সেন। ভদ্রলোক অনেকরকম ভাষা জানেন। তোর কথাগুলো শুনলে উনি হয়তো বলতে পারতেন তার মানে কী। আর তার থেকেই তোর স্বপ্নের হয়তো একটা সলিউশন বেরিয়ে আসত।'

কথাগুলো মিতা মন্দ বলেনি। এরকম চেষ্টা একটা করলে ক্ষতি কী?

আমার পাড়ার বন্ধু সমীরের একটা নতুন বিদেশি টেপরেকর্ডার আছে। তাতে রেকর্ডার অন করলেই টেপ ঘোরে না। রেকর্ডার অন করে কেউ কথা বলতে শুরু

করলেই রেকর্ডিং শুরু হয়, আবার কথা থেমে গেলেই রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে যায়। অটোমেটিক রেকর্ডিং সিস্টেম। শুনেছি বিদেশি লেখক আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনার নাকি এইরকম টেপ-রেকর্ডার ব্যবহার করতেন। উপন্যাস লিখতেন না, টেপ-রেকর্ডারের সামনে সময়-সুযোগ মতো বলে যেতেন। পরে তাঁর সেক্রেটারি কথাগুলো টাইপ করে ড্রাফট তৈরি করত। আর গার্ডনার সেগুলো কারেকশান করে ফাইনাল ম্যানাসক্রিপ্ট দিয়ে দিতেন প্রকাশকদের।

ঠিক করলাম, আজ সন্ধেবেলায় সমীরের কাছে যাব, টেপ-রেকর্ডারটা ক'দিনের জন্য ধার চাইব। তারপর দেখি কী হয়!

সুতরাং মিতাকে বললাম, 'সাজেশানের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু মাকে কিছু বলিস না। এই ড্রিম পাজ্‌লটা আমাদের দুজনকেই সল্‌ভ করতে হবে।'

মিতা হাসল, বলল, 'এখন ওঠ তো। মুড়ি আর তেলেভাজার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি, খাবি চল।'

'যাচ্ছি, যা। আর শোন, ড্রিম থিয়োরির ওপরে দু-একটা বই আমাকে জোগাড় করে দিতে পারিস?'

মিতা আবার হাসল, বলল, 'ঠিক শুনছি তো, দাদা? বস্তুবাদী ফিজিক্সের অধ্যাপকের এ কী দুরবস্থা! ক'দিন আগে তুই-ই তো বলতি স্বপ্নতত্ত্ব-টত্ত্ব সব আজগুবি।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'চিরদিন কি কারও সমান যায় রে—।'

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি বহুবর্ণ ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পায়ের নীচে সবুজ ঘাস। আমার পাশে কেউ হাসছে রিনরিন স্বরে। দামি সেন্টের গন্ধ নাকে আসছে। তার রঙিন পোশাকের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মুখটা কিছুতেই চোখে পড়ছে না। দূরে ঢাল বেয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে টলটলে জলের ঝরনা।

সমীরের কাছ থেকে টেপরেকর্ডার ধার চেয়ে এনে মাথার কাছে অন করে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু সকালে প্লে-ব্যাক করে দেখি কোনও কথা তাতে ধরা পড়েনি। শুধু হালকাভাবে আমার নাকডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার যে নাক ডাকে তা আগে জানতাম না। মিতা ওই নিয়ে সারাদিন আমার পেছনে লাগল। মা টেপরেকর্ডারের ব্যাপার না জানায় ওর রঙ্গরসিকতার মাথা-মুন্ডু বুঝে উঠতে পারছিল না।

'সব বলছি। ওকে তুলবে সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে....বারাসাতের ডাকবাংলো মোড় থেকে বাঁদিকের ন্যাশনাল হাইওয়ে থারটি ফোরে চার কিলোমিটার দূর থেকে। তুমি ডাকবাংলো মোড়ে পৌঁছে আমাকে এই মোবাইল নাম্বারটায় ফোন কোরো...।' কথা বলতে-বলতে পকেট থেকে একটা ছোট চিরকুট বের করলেন নাগিনাসাহেব—ওটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

চিরকুটটা নিলাম। কম্পিউটারে ছাপানো একটা সংখ্যা ৫৪০৩।

নাগিনার দিকে চোখ তুলে তাকালাম। এরকম উদ্ভট মোবাইল নাম্বার দেওয়ার মানে কী?

আমার অবাক হওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসলেন তিনি 'শুরুতে ৯৮৩০ আছে। আর শেষে ০৩—এই দুটো ব্যাপার তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে। সেফটি, চন্দর, সেফটি। আজকাল পুলিশ যা শুরু করেছে—ঠিকঠাক ঘুষ নিতে চায় না।' থুতনিতে বারকয়েক টোকা মারলেন নাগিনা। সাপ দুটোর দিকে তাকালেন ওরা তখন ওদের কাজ করে চলেছে।

নাগিনাসাহেব বললেন যে, নিশাকে ওঁর কসবার এই ডেরাতেই নিয়ে আসতে হবে। ডাকবাংলো মোড়ে পৌঁছে ওঁকে ফোন করলেই বাকি সমাচার জানা যাবে।

আমি চুপটি করে বসেছিলাম। নাগিনাসাহেবের কথা শেষ হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'আপনি বলছেন কাজটায় রিস্ক আছে। তার মানে...।'

'হেভি রিস্ক।' হাসলেন নাগিনা। আমার কাছে এসে পিঠ চাপড়ে দিলেন : 'কিন্তু আমি জানি এ-কাজ পারলে তুমিই পারবে। মনে রেখো, নিশাকে আমার গোটা চাই। নো অপশন।'

'ভয় নেই, নাগিনাসাহেব। আমি গোটা না ফিরলেও নিশা গোটা পৌঁছবে।'

'কাজটার জন্যে কী নেবে বলো। একটুও লজ্জা না করে বলে ফ্যালো—।'

লজ্জাশরম! হাসি পেল আমার। লজ্জাশরম আবার কী! ও জিনিসটা গায়ে মাখে, না মাথায় দেয়?

নাগিনাসাহেবের চোখে চোখ রেখে বললাম, 'চার লাখ দেবেন।'

'এখন নেবে?' চোখ ছোট করে তেরছা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে জানতে চাইলেন নাগিনা।

হাসলাম, বললাম, 'নাঃ, এখন আপনার কাছেই থাক। আপনার চেয়ে সেফ কোনও ব্যাঙ্ক কলকাতায় আছে নাকি!'

'বিসওয়াস, বিসওয়াস!' আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন নাগিনা, 'এইজন্যেই তোমাকে আমার এত ভালো লাগে।'

আমি কবজি উলটে ঘড়ি দেখলাম। বললাম, 'আর দেরি করব না। অপারেশনটার

জন্যে অনেক অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনি আমার সঙ্গে আর কনট্যাক্ট করার চেষ্টা করবেন না। সবসময় আপনার দেওয়া নাম্বারে আমি কনট্যাক্ট করব...।'

বেশ জোরে হেসে উঠলেন নাগিনাসাহেব। বললেন, 'চন্দর, তোমার সঙ্গে আমি আজ নতুন কাজ করছি না। আমি জানি, তুমি দেড়ডজন ক্যাশকার্ড ইউজ করো। আর তিনদিন পরপর নতুন-নতুন কার্ড কেনো, পুরোনো কয়েকটা ফেলে দাও। না ব্রাদার, তোমার তারিকা আমার বহত পসন্দ। ও. কে.। রাতে তা হলে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে—উইথ নিশা?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

নোংরা ঘর এবং নোংরা মানুষটাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসতে যাব, হঠাৎই তিনটে লোক হুট করে ঢুকে পড়ল। তাদের মধ্যে দুজনের গালে, আর একজনের গলায়, কাটা দাগ। যাকে বলে একেবারে আগ মার্কা ছাপ। নাগিনার দলে নাম লেখানোর বেসিক কোয়ালিফিকেশান।

একটু পরেই বুঝলাম, আমার বুঝতে ভুল হয়েছে।

কারণ, মাঝের টাকমাথা বেঁটে লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে ঢুকিয়েছে বাকি দুজন। এবং লোকটার গাল বেয়ে সরু রক্তের রেখা গড়িয়ে পড়ছে।

বাকি দুজনের একজন নাগিনাকে বলল, 'বস, পরেশ মালির কাছ থেকে সুপারি নিয়ে এই সালাই নদুয়াকে উড়িয়েছে। কিছুতেই সালা বলছে না, পরেশ মালি এখন কোথায় ঠেকা বসিয়েছে।'

মাঝের লোকটা নাগিনার দিকে কাকুতিভরা চোখে তাকিয়ে বলল, 'সচ বলছি, মালিক, পরেশ মালির ঠেকা আমি জানি না। সুপারি আমি নিইনি। নদুয়াকে খালাস করেছে আমজাদ। বিসওয়াস করুন, মালিক।'

কাঁচা গালাগাল দিয়ে আর-একজন একটা নেপালা বের করে নিল হাতের আড়াল থেকে। সোজা বেঁটে লোকটার গলায় চেপে ধরল। তারপর খিস্তির বন্যা ছুটিয়ে দিল করপোরেশনের পাইপ-কাটা জলের মতো।

'রুক যা, পাঞ্জি!' বলে একবার হাততালির শব্দ করলেন নাগিনা।

সঙ্গে-সঙ্গে নেপালা-উঁচিয়ে-ধরা লোকটা—যার নাম সম্ভবত পাঞ্জি—থমকে গেল, মুখ ঘুরিয়ে তাকাল নাগিনাসাহেবের দিকে।

নাগিনা হাসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে বলছিলাম না, চন্দ্রবোড়াগুলো হেভি সার্ভিস দেয়।' তারপর মুখে চুকচুক আওয়াজ করে হাতছানি দিয়ে টাকমাথা বেঁটে লোকটাকে ব্যঙ্গ করে কাছে ডাকলেন, 'আ যা, বাবুয়া! আ যা! আ যা! চুমা লে লে!'

নাগিনাসাহেবের লোক দুজন বেঁটে লোকটাকে টানতে-টানতে নাগিনার আরও কাছে নিয়ে গেল। নাগিনা ওর থুতনি ধরে আদর করে নেড়ে দিয়ে বললেন, 'যা বাবুয়া, চুমা খা লে।' তারপর পাঞ্জির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পাঞ্জি, একটু চুমা দিয়ে দে একে। তারপর বডিটা খালে ছেড়ে দিস। কাউকে জহরিলা সাপে কাটলে আমি কী করতে পারি....।' হাসলেন নাগিনা।

বেঁটে লোকটাকে পাঞ্জি ও তার জাতভাই টানতে-টানতে নিয়ে গেল চন্দ্রবোড়ার বাক্সের দিকে। তারপর একটা বাক্সের ঢাকনা সরিয়ে দিল। অমনি ফোঁস-ফোঁস শব্দ শুরু হল।

অনেক দেরিতে ব্যাপারটা বুঝতে পারল লোকটা। তখন ও পাগলের মতো চেঁচাতে শুরু করল—কিছুতেই কাচের বাক্সদুটোর দিকে যেতে চাইছিল না—প্রাণপণে চেষ্টা করছিল পিছিয়ে আসতে।

নাগিনাসাহেব তখন গুনগুন করে গান ধরেছেন 'আজ ফির জিনে কি তমন্না হ্যায়/আজ ফির মরনে কা ইরাদা হ্যায়...।'

আমি নোংরা ঘর আর নোংরা মানুষটাকে ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

সামনে এখন অনেক কাজ।

চৌত্রিশ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপরে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ধাবায় বসে ছিলাম। ধাবার খাঁচাটা এমনভাবে সোজা হয়ে আছে যেন কোনও ঝুল্লুস মাতাল পড়ে যাওয়ার পর অতিকষ্টে আবার বেঁকাতেড়াভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাচের গ্লাসে দেওয়া তিন নম্বর চা শেষ করে সিগারেট ধরাতেই গাড়িটা দেখতে পেলাম।

সাদা রঙের একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি। ধাবা ছাড়িয়ে অন্তত একশো মিটার এগিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। একটা মেয়েকে খানিকটা যেন ধাক্কা মেরেই নামিয়ে দিল গাড়ি থেকে। তারপর দরজা বন্ধ করেই গাড়ি ছুট।

ঘড়ি দেখলাম সাতটা বাজতে পনেরো মিনিট।

ধাবার ময়লা এবড়োখেবড়ো টেবিলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গের ব্যাগটা মাথা গলিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। চটপট পা ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলাম।

ধূসর সন্ধ্যা নেমে এসেছে বটে তবে এখনও পুরোপুরি আঁধার হয়নি। মেয়েটি একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কালো অথবা গাঢ় রঙের কোনও শাড়ি। হাইওয়ে ধরে ছুটে যাওয়া গাড়ির হেডলাইটের আলো মাঝে-মাঝে মেয়েটিকে ছুঁয়ে

চলে যাচ্ছে।

আমি আর দেরি করলাম না। এখন সময়ের দাম সবচেয়ে বেশি। চট করে রাস্তা পার হয়ে রাস্তার পাশের ঢালে নেমে গেলাম। সেখানে আমার বাইক দাঁড় করানো ছিল। বাইকের ডিকিতে অপারেশানের মেশিনপত্তর ঠাসা। আর তার গায়ে দুটো হেলমেট ঝুলছে।

লক খুলে একটা হেলমেট বের করে নিলাম। সেটা মাথায় দিয়ে নিশাকে লক্ষ করে বাইক ছুটিয়ে দিলাম। আমার বুকের ভেতরে যুদ্ধের বাজনা শুরু হল। এই বাজনা আমার বড় ভালো লাগে।

রাস্তা মসৃণ। দুপাশে বড়-বড় গাছ। আরও দূরে খুচরো ছোট মাপের ঘর-বাড়ি। কোথাও-কোথাও ঝুপড়ি দোকানপাট।

আকাশে বাঁকা চাঁদ মুচকি হাসছে। তার আড়ালে বোধহয় নিয়তিও।

মেয়েটির কাছে পৌঁছে বাইক থামালাম। চারপাশে নজর করে দেখলাম। রাস্তার ধার ঘেঁষে পার্ক করা অন্য কোনও গাড়ি কিংবা বাইক চোখে পড়ল না।

ও একটু যেন ভয় পেয়ে গেল প্রথমটায়—তার পরেই অবশ্য সামলে নিল। বাইকের পেছনে তাড়া করে আসা ধুলো এড়াতে মুখে আঁচল চাপা দিল। কিন্তু কৌতূহল ভরা চোখ দুটো সবসময় আমাকে লক্ষ করছিল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনার নামটা কাইন্ডলি বলবেন?'

'নিশা—নিশা সেনগুপ্ত।'

'বাবুরামের গ্যাঙের নিশা?' চাপা গলায় জানতে চাইলাম।

'হ্-হ্যাঁ।'

এইরকম কোশ্চেন-আনসারই হওয়ার কথা ছিল। ডাকবাংলো মোড়ে পৌঁছে নাগিনাসাহেবকে ফোন করে সেটা জেনেছিলাম। কথার শেষে তিনি বলেছিলেন একটু পরে আবার ফোন করতে।

আমি নিশাকে চোখের ইশারা করে বাইকের পেছনের সিটটা দেখিয়ে বললাম, 'বসে পড়ুন। নাগিনাসাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন।'

আঁচল সরে গেল মুখ থেকে। আর-একটা চাঁদ বেরিয়ে পড়ল আড়াল থেকে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এরকম রূপসী মুখ আমি বহুদিন দেখিনি।

ফরসা লম্বাটে মুখ। নাকে নাকছাবি। কপালে একফোঁটা টিপ। বাঁ চোখের পাশে একটা ছোট্ট তিল। ওকে কোনও গ্যাঙে ঠিক মানায় না। সেইজন্যেই হয়তো ওর দাম এত বেশি।

'জলদি বসে পড়ুন—দেরি করবেন না।' দ্বিতীয় হেলমেটটা বের করে নিশার হাতে দিলাম 'এটা মাথায় দিন। নইলে ট্র্যাফিক পুলিশের খপ্পরে পড়লে সব প্ল্যান

চৌপাট হয়ে যাবে।'

নিশা আমার কথা শুনল। হাতের হ্যান্ডব্যাগটা সামলে নিয়ে হেলমেট মাথায় দিয়ে বসে পড়ল বাইকে।

সঙ্গে-সঙ্গে বাইক ঘুরিয়ে ছুটিয়ে দিলাম ডাকবাংলো মোড়ের দিকে।

একটু পরেই মনে হল, নাগিনাসাহেবকে একটা ফোন করা দরকার। নিশাকে তোলার কিছুক্ষণ আগে ওঁকে দ্বিতীয়বার ফোন করেছিলাম। তখন নাগিনাসাহেব বাকি ইনফরমেশান দিয়েছিলেন। নিশা যে কালো সিল্কের শাড়ি পরে থাকবে সেটা বলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, কাজ হয়ে গেলে ফোন করে জানাতে।

ডাকবাংলো মোড় ছাড়িয়ে যশোর রোডে খানিকটা পথ এসে বাইক থামালাম। গাড়ি থেকে নেমে নিশাকে বললাম, 'আসুন, একটু চা-টা খেয়ে নিই।'

নিশা বলল, 'সময় নষ্ট করার কী দরকার! নাগিনাসাহেবের ওখানে পৌঁছে তারপর....।'

আমি হেসে বললাম, 'আমরা যে সময় নষ্ট করতে চাইব না সেটাই সবাই ভাববে। বাবুরামের দলের লোকরাও। সেইজন্যেই সময় নষ্ট করাটা জরুরি। আমার কাজের স্টাইল একটু আলাদা। আসুন—।'

চারপাশে সন্দেহের নজর বোলাতে-বোলাতে নিশা আমার পিছু নিল। রাস্তার ধারের একটা ব্যস্ত দোকানে ঢুকে পড়লাম আমরা।

দোকানটায় চা, সিঙাড়া, মিষ্টি, কোল্ড ড্রিংক্স—সবই পাওয়া যায়। কাউন্টারে বেশ ভিড়। একটা কোণের টেবিল খালি দেখে সেটা বেছে নিলাম। কোণের টেবিলের সুবিধে হচ্ছে, কে ঢুকছে কে বেরোচ্ছে স্পষ্ট নজর রাখা যায়।

নিশাকে জিগ্যেস করলাম, 'কী খাবেন, বলুন—।'

ও আমার মুখোমুখি বসেছিল। তেরছা চোখে আমাকে দেখল, তারপর বলল, 'জাস্ট একটা কোক।'

লক্ষ করলাম, দোকানের অনেকেই নিশাকে বারবার দেখছে। অবশ্য ও দেখার মতোই।

আমি বেয়ারাকে ডেকে দুটো কোক দিতে বললাম। ওর হাতে একটা বিশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, 'বকশিশ। এই টেবিলে আর কেউ যেন ডিসটার্ব না করে। আমরা মিনিট পনেরো বসব।'

একগাল হাসি এবং সেলাম। তারপরই দুটো হিমশীতল কোক এসে গেল।

আমি নিশাকে কোক নিতে ইশারা করলাম এবং নাগিনাসাহেবকে ফোন লাগালাম।

'হ্যালো। চন্দর বলছি। ও এখন আমার কাছে।'

নাগিনা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'শাবাশ। মিরচান্দানি আমাকে ফোনে জানিয়েছে

নিশাকে ও স্পটে নামিয়ে দিয়েছে। ওকে— ।'

নাগিনাসাহেবকে বাধা দিয়ে বললাম, 'ফোনে কোনও নাম নেওয়ার দরকার নেই, লাইন ট্যাপ হতে পারে। আমরা ঠিক আছি। ডোন্ট উয়ারি।'

'তোমরা এখন কোথায়?'

'একটা মিষ্টির দোকানে।'

'কীসব উলটোপালটা বলছ!' খেঁকিয়ে উঠলেন নাগিনা : 'দোকান-ফোকান না—জায়গার নাম বলো।'

'আপনার শরীর কেমন আছে?' হেসে জিগ্যেস করলাম। তারপর বললাম, 'লাইন ছেড়ে দিচ্ছি। পরে আবার ফোন করব।'

'একমিনিট, একমিনিট! তোমরা একজ্যাক্টলি কোন জায়গাটায়....?'

'বাচ্চাদের মতন বেকার কোশ্চেন কেন করছেন, স্যার? পরে কথা হবে।'

লাইন কেটে দিলাম।

নিশা স্ট্র-এর ওপরে ঠোঁট চেপে ছিল, মুখে তুলে বলল, 'আপনি দেখছি খুব কশাস।'

হেসে বললাম, 'এটাই এ-লাইনের দস্তুর, ম্যাডাম। কেন, আপনি কশাস থাকেন না?'

'থাকি। তবে সাবধান থাকলেই তো সবসময় বাঁচা যায় না। মরতেও হয়।' ঠোঁটে আঙুল বোলাল নিশা।

'মরতে আপনি ভয় পান?'

'নাঃ!'

'কেন?'

'আপনার কি ধারণা আমি বেঁচে আছি?'

কথাটা আমাকে ধাক্কা দিল। নিশার দিকে ভালো করে তাকালাম। ওর টানা-টানা চোখে আচমকা একটা দুঃখের ছায়া নেমে এসেছে যেন।

'কেন, এ-কথা বলছেন কেন?'

হাসল নিশা 'আমার অবস্থা ছোটবেলার সেই শোলোক কাটা খেলার মতো—"রাজা একটি বালিকা চাইল......নাও, নাও, বালিকা নাও।" কখনও বাবুরাম, কখনও নাগিনাসাহেব। লাইফটাই কী করে যেন লুডোর ছক্কা হয়ে গেল—যে যখন খুশি যেমন খুশি দান চালছে।' হঠাৎই তাচ্ছিল্যে ঠোঁট নাড়ল, বলল 'এসব আপনাকে বলে কী লাভ! আপনি তো জাস্ট কুরিয়ার....।'

'কুরিয়ার না হলে কী বলতেন?'

'বলতাম, আমাকে একটা প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল লাইফ দিন। সাদামাটা ঘরকন্না

করব, বাচ্চা কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াব, কর্তার মাথা টিপে দেব...ধুৎ, কীসব আনসান বকছি! নিন, কাজের কথা থাকলে বলুন—।'

মাথা ঝুঁকিয়ে শব্দ করে কোকটা শেষ করতে লাগল নিশা।

আমি ওকে লক্ষ করছিলাম। নিশা বাবুরামের দলের মেয়ে। সেখানে নানান অভিজ্ঞতায় পোড় খেয়েছে। ওর চেহারা সুন্দর এবং আধুনিক। ওর মুখে এসব সেকেলে নস্টালজিয়া বেমানান লাগার কথা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, জীবনের কতকগুলো পুরোনো শেকড় যুগ-যুগ ধরে একইরকম থেকে যায়—একটুও বদলায় না।

আমি নিচু গলায় বললাম, 'আমি কুরিয়ার না হলে যা-যা বলতেন সেগুলো মিরচান্দানি আপনাকে দিতে পারে, ম্যাডাম।'

নামটা শুনে চমকে মুখ তুলে তাকাল নিশা। আমাকে তির-বেঁধানো নজরে দেখল। তারপর 'ও—আপনি অনেক খবরই রাখেন দেখছি!'

'এ লাইনের দস্তুর, ম্যাডাম।' হেসে বললাম।

'কী তখন থেকে "ম্যাডাম, ম্যাডাম" করছেন! কানে কটকট করছে। আপনার সঙ্গে তো আমার বড়জোর দু-আড়াই ঘন্টার লাইফ। ওইটুকু সময় নাম ধরে "তুমি" বলে ডাকলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।' চারপাশে একবার নজর বোলাল নিশা। একমুহূর্ত ভাবল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, 'মিরচান্দানি আমার মালিক বদলের গেটপাশ—বাবুরাম থেকে নাগিনাসাহেব। আমি যা চাই তা ও দিতে পারবে বলে মনে হয় না। হয়তো বড়জোর কয়েক বছরের ফুর্তি দেবে। কিন্তু সেটুকুও তো আমি কখনও পাইনি।'

'হয়তো পেতে চাওনি।'

ও কিছু বলার আগেই দোকানে তিনটে লোক ঢুকল।

ওদের চেহারা সুবিধের নয়। গায়ের রং কালো। মুখে খুচরো পাপের ছাপ। চঞ্চল চোখ এদিক-ওদিক ছিটকে যাচ্ছে।

নিশাকে বললাম, 'উঠে পড়ো—জলদি। তুমি আগে বেরিয়ে যাও। আমি পরে যাচ্ছি।'

ও ভয়ের চোখে একবার পেছন ফিরে তাকাল। তারপর আমার কথা শুনল। পায়ে-পায়ে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

আমি বেয়ারাটিকে ইশারায় ডাকলাম। কোল্ড ড্রিংক্স-এর দাম মিটিয়ে দিয়ে পা বাড়ালাম।

যেতে-যেতে আড়াচোখে লোক তিনটের দিকে দেখলাম। ওরা লোভের চোখে নিশার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম, ওরা সাধারণ কুকুর—শিকারি কুকুর নয়।

বাইরে বেরিয়ে নিশাকে বললাম, 'একটা জরুরি কাজ সেরে নিতে হবে।'

ও ভুরু উঁচিয়ে তাকাল 'কী কাজ?'

'কোনও বড়-সড় দোকানে একটা লেডিজ টয়লেট খুঁজে বের করতে হবে। সেখানে তোমাকে শাড়িটা পালটে নিতে হবে—আমার ব্যাগে তিনটে শাড়ি আছে, যে-কোনও একটা বেছে নিয়ো।'

'শাড়ি পালটাব কেন?'

আমি হাসলাম 'তুমি যে কালো শাড়ি পরে আছ সেটা বাবুরামের গ্যাঙের অনেকে জানে। নাগিনাসাহেবও জানেন। আমি কোনও রিস্ক নিতে চাই না। আর...' ইশারায় ওর পিঠে ঢলে পড়া ঢেউখেলানো চুলের দিকে দেখালাম 'এই চুল ঘাড় পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে।'

নিশা আঁতকে উঠল 'আপনি—আপনি....!'

আমি হাতের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিলাম, বললাম, 'নিশা, বি আ গুড গার্ল। চুল চলে গেলে আবার গজাবে, লাইফ চলে গেলে—ফুস্‌-স্‌।' আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে কথা শেষ করলাম।

ওকে নিয়ে বাইকের দিকে এগোতে-এগোতে বললাম, 'তুমি যে দলছুট হয়েছ সেটা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবুরাম জানতে পারবে। তারপর ওর গ্যাঙের খেঁকি কুকুরগুলো তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে। এই পোশাকে তোমাকে দেখলে ওরা চট করে চিনে ফেলবে। হয়তো শাড়ি-চুল পালটালেও তোমাকে চিনতে পারবে...তবে রিস্কটা একটু কমবে।'

আমরা বাইকে উঠে স্টার্ট দিতে-না-দিতেই কোথা থেকে একটা সাদা মারুতি ভ্যান বুলেটের মতো ছুটে এসে আমাদের ওভারটেক করে একেবারে হুমড়ি খেয়ে থামল।

আমি বাইক চালিয়ে দিলাম। কার্গো প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মেশিন বের করে নিলাম। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন চিফ্‌স স্পেশাল মডেল থার্টি সেভেন। পয়েন্ট থ্রি এইট স্পেশাল ক্যালিবার। ডাবল অ্যাকশন পাঁচ রাউন্ড গুলি ছোড়া যায়। ওজন প্রায় চারশো গ্রাম।

আমেরিকার এই মেশিনটার সঙ্গে আমি কায়দা করে লেসার পয়েন্টার লাগিয়ে নিয়েছি।

বাইকটাকে চোখের পলকে সাপের মতো প্যাঁচ খাইয়ে মারুতির ড্রাইভারের জানলার কাছে নিয়ে গেলাম।

ততক্ষণে মারুতির পেছনের জানলা দিয়ে পিস্তল ধরা একটা হাত বেরিয়ে এসেছে।

আমি চলন্ত বাইক থেকেই ড্রাইভারের মাথায় গুলি করলাম।

ওদের পিস্তলের আওয়াজে আমার রিভলভারের 'ফট' শব্দটা চাপা পড়ে গেল। রাস্তার পাবলিক ছোটাছুটি করতে শুরু করল। একইসঙ্গে কানে এল নানান গলার চিৎকার, ছুটন্ত গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ, গাড়ির 'প্যাঁ-পোঁ' হর্ন। সবমিলিয়ে একেবারে দক্ষযজ্ঞ।

আমি ঝুঁকে পড়ে বাইক চালাচ্ছিলাম। নিশাকে বললাম, যতটা সম্ভব মাথা নিচু করে থাকতে। হু-হু বাতাসে আশপাশের আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছিল। তবে বুকের ভেতর যুদ্ধের বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম।

গাড়ি নিয়ে কোনও অ্যাকশন হলে আমি সবার আগে ড্রাইভারকে টপকে দিই। তাতে বিরাট একটা সুবিধে আছে। বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, গাড়ির অন্য ছেলেগুলো স্টিয়ারিং ধরতে জানে না। আর কেউ যদি জানেও তা হলে ডেড বা হাফ-ডেড পাইলটকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে পজিশন নিতে-নিতে অনেকটা সময় চলে যায়।

যখন মনে হল যশোর রোড ধরে বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছি, পেছনে আর কোনও ফেউ নেই, তখন বাইকটাকে একটা অন্ধকার সাইড রোডে ঢুকিয়ে দিলাম।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর একটা মাঠের পাশে অন্ধকার নির্জন জায়গা দেখে গাড়িটা সাইড করলাম। ব্যাগ থেকে শাড়ির প্যাকেটটা বের করে নিশার হাতে দিলাম 'কুইক! ওই গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঝট করে শাড়িটা চেঞ্জ করে নাও।'

নিশা কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। চাঁদের আলোয় ওর নাকছাবিটা চিকচিক করছিল।

আমি ওকে ছোট্ট করে ঠেলা দিলাম 'সময় নষ্ট কোরো না—জলদি।'

হ্যান্ডব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে ও গাছের আড়ালে যেতেই মাঠের দিকে মুখ করে 'ছোট বাইরে'-র ভঙ্গিতে দাঁড়ালাম। এই অভিনয়টা নাকগলানে পাবলিকের জন্যে।

পনেরো কি কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যেই নিশা চলে এল। বলল, 'কালো শাড়িটা প্যাকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছি।'

'গুড।' বলে প্যাকেটটা ওর হাত থেকে নিয়ে ব্যাগে চালান করলাম। ওর হ্যান্ডব্যাগটা ফিরিয়ে দিলাম।

তারপর কার্গো প্যান্টের বাঁদিকের পকেট থেকে কাঁচি বের করে ওকে বললাম, 'ঘুরে দাঁড়াও।'

ও ঘুরে দাঁড়াতেই ঘাড় বরাবর কচাকচ কাঁচি চালালাম। তারপর দু-কানের পাশেও।

এখন নিশার মুখটা খানিকটা অন্যরকম লাগছে। তাড়াহুড়োয় ওকে এর চেয়ে বেশি বদলানো যাবে না। তবুও শেষ তুলির টান হিসেবে একটা বড় লাল টিপ শার্টের বুকপকেট থেকে বের করে ওর কপালের ছোট্ট কালো বিন্দির ওপরে সেঁটে দিলাম।

ব্যস।

আমরা বাইকে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট করলাম।

'লোকটাকে ওরকমভাবে মেরে ফেললেন? ওর হয়তো ফ্যামিলি আছে...।'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালাম। বাবুরামের গ্যাঙের মেয়ের মুখে এ কী ভক্তিগীতি!

তারপর বললাম, 'ফ্যামিলি আছে কিনা পরে জেনে নেব। এখন বাইকে ওঠো—।'

আবার বাইক নিয়ে ছুট।

একনম্বর গেটে পৌঁছে আমরা ভি. আই. পি. রোডের দিকে বাঁক নিলাম। বাইকের রিয়ারভিউ কনভেক্স মিরারে বরাবর আমার নজর ছিল। কিন্তু সন্দেহ হওয়ার মতো কোনও গাড়ি চোখে পড়েনি।

সন্দেহ হওয়ার মতো একটা দৃশ্য চোখে পড়ল এবার।

ভি. আই. পি. রোড ধরে এসে এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার রাস্তার কাছে পৌঁছতেই আমি বাইকের স্পিড কমিয়ে দিলাম। কারণ, সামনে তাকিয়ে দেখি একটা বাইক ভি. আই. পি. রোডে আড়াআড়িভাবে কাত হয়ে পড়ে আছে। তার কাছাকাছি বেশ খানিকটা তেরছাভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছাই-রঙা মারুতি গাড়ি। রাস্তার সোডিয়াম লাইটে গাড়ির রংটা বিবর্ণ শ্যাওলার মতো দেখাচ্ছে। মারুতি আর বাইকের মাঝামাঝি জায়গায় চার-পাঁচজন লোক জটলা করে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে কথাবার্তা বলছে। ভি. আই. পি. ধরে ছুটে চলা বাস-মিনিবাস ইত্যাদি স্পিড কমিয়ে মারুতি আর বাইকটাকে দিব্যি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা মোটামুটি একটা অ্যাক্সিডেন্টের ছবি।

তবে ছবিটা নকলও হতে পারে।

এটা ভাবলাম এই কারণে যে, আমার লাইনে বেঁচে থাকার ট্রেড লাইসেন্স হল সন্দেহ।

এক মুহূর্ত দেরি না করে বাইক ঘুরিয়ে দিলাম এয়ারপোর্টে যাওয়ার রাস্তার দিকে। আর ঠিক তখনই নিশার মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করল।

ও বলতে যাচ্ছিল, 'বাইক ঘোরালেন কেন?' কিন্তু কথা শেষ করার আগেই ফোন বেজে ওঠায় ও ফোন ধরল।

আমি বাইকের স্পিড কমিয়ে দিলাম। শব্দও।

ও ফোনে 'হ্যালো' বলল, কয়েক সেকেন্ড কী শুনল—তারপরই ফোনটা আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি সবে স্পিড নিতে শুরু করেছিলাম, ওর কান্না শুনে গাড়ি থামিয়ে দিলাম।

জায়গাটা নির্জন। রাস্তার দুপাশে এলোমেলো গাছপালা। একটু এগোলেই হোটেল এয়ারপোর্ট অশোক।

আমি ঘুরে তাকালাম নিশার দিকে 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

ও কোনও কথা বলতে পারল না। বারবার ফুঁপিয়ে উঠছিল। ফোনটা হাতের মুঠোয় ধরা।

আমি বাইক থেকে নেমে দাঁড়ালাম। একহাতে হ্যান্ডেল ধরে রেখে মোবাইল ফোনটা ছিনিয়ে নিলাম ওর হাত থেকে।

ফোনটা কানে লাগাতেই কথা শুনতে পেলাম। একজন পুরুষ চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলছে।

'...বুঝলি? মিরচান্দানি শেষ...খতম। আমাদের সামনে ওর ঝাঁঝরা বডি পড়ে আছে। ওর ফোন থেকেই তোকে ফোন লাগিয়েছি। এবার তোর পালা....।'

লোকটা বাজেভাবে হাসছিল। আমি লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা নিশাকে ফিরিয়ে দিলাম।

মিরচান্দানির কোনও ফ্যামিলি ছিল না। কিন্তু নিশাকে এ-কথা বলার কোনও মানে হয় না। ও তখনও কাঁদছিল। মিরচান্দানির কাছে ওর হয়তো খুব বেশি প্রত্যাশা ছিল না, কিন্তু ওর কান্না দেখে বুঝলাম, মিরচান্দানি ওকে আলতো করে ছুঁয়ে ফেলেছিল—ওর বাইরেটা, আর ভেতরটাও।

'আমার ফোন নাম্বার শুধু মিরচান্দানি জানত—আর কেউ জানত না।' ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলল নিশা, 'আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেল....সব শেষ।'

হঠাৎই ও বাইক থেকে নেমে পড়ল 'আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। দল বদলে আমার আর কোনও সাধ নেই। আই হ্যাভ চেঞ্জড মাই মাইন্ড।'

আমি যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে আঁতকে উঠলাম। মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেছে! আমাকে ছেড়ে এই মুহূর্তে চলে গেলে ও আর ক'মুহূর্তই-বা বাঁচবে?

ঠিক তখনই নজরে পড়ল, দুটো মোটরবাইক ভি. আই. পি. রোডের দিক থেকে এদিকে আসছে।

হয়তো এতক্ষণেও শিকারের দেখা না পেয়ে ওরা খুঁজতে বেরিয়েছে। চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে নিশাকে ওরা ছেঁকে তুলতে চায়। কিন্তু কেন? শুধুই দলবদলের জন্যে? নাকি অন্য কোনও গভীর কারণ আছে?

ঝট করে বাইকে উঠে পড়লাম। নিশাকে বললাম, 'মাথা ঠান্ডা রাখো—প্লিজ। একটু পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি। নাগিনাসাহেবকে আর-একবার ফোন লাগাতে হবে।'

বাইক ছুটিয়ে দিলাম এয়ারপোর্টের দিকে। রিয়ারভিউ মিররে দেখলাম। বাইক দুটো আচমকা স্পিড বাড়িয়ে নিল, আর হেডলাইট নিভিয়ে দিল। আমার বাইকটা নিশ্চয়ই ওদের সন্দেহের নজরে পড়েছে।

এয়ারপোর্ট এলাকায় সিকিওরিটির কড়াকড়ি একটু বেশি। এখানে সাবধান থাকাটা জরুরি। মাথা গরম করে আমি গুলি চালানোর ঝুঁকি নিতে পারি না। ওরাও নিশ্চয়ই কোনও ঝুঁকি নেবে না। কিন্তু যদি নেয়?

নিশাকে বললাম, বাইকের ডিকির ডালাটা খুলে ভেতরে হাত ঢোকাতে। যে-রিভলভারটা ওর প্রথম হাতে ঠেকবে সেটাই আমার হাতে দিতে।

আমার প্যান্টের পকেটে যে-দুটো মেশিন আছে সেগুলো ছোট মাপের। এ ছাড়া তিনটে হেভি মডেল ডিকিতে রেখেছি। নিশা তারই একটা বের করে আমার হাতে দিল।

একপলক দেখেই বুঝলাম, বেরেটা মডেল এইট থাউজ্যান্ড কুগার-জি আইনক্স। নাইন মিলিমিটার প্যারা ক্যালিবার। ডাবল অ্যাকশন। পনেরো রাউন্ড গুলি ছোড়া যায়। ওজন প্রায় এক কেজি।

এই ইটালিয়ান মেশিনটা এককথায় মার্ভেলাস।

পিস্তলটা বাগিয়ে ধরেই আমি বাইকের হেডলাইট নিভিয়ে দিলাম। তারপর এয়ারপোর্টের কাছাকাছি পৌঁছে স্পিড কমিয়ে দিলাম। খেয়াল করলাম, প্রতিপক্ষও স্পিড কমিয়ে দিয়েছে। বুঝলাম, ওরা ঝামেলা চায় না।

এই সুযোগটাই আমাকে কাজে লাগাতে হবে।

নিশাকে অবাক করে দিয়ে আচমকা বাইক ঘুরিয়ে দিলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গতি মারাত্মক বাড়িয়ে ছুটে চললাম ওদের বাইকের মুখোমুখি। এবং বিপজ্জনক দূরত্বের মধ্যে এসেই আমার বাইকের হেডলাইট জ্বেলে দিলাম।

মুখোমুখি ছুটে আসা বাইক দুটোর একটা থেকে গুলি ছুটে এল। 'ক্র্যাক' শব্দ হল একবার। আমার হেডলাইট ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, তাই নিশানা ফসকে গেল। আমি বেরেটা তুলে ওদের একজনকে টিপ করে একবার ফায়ার করলাম।

আমারও নিশানা ফসকে গেল।

লোকটার গায়ে না লেগে গুলিটা বোধহয় বাইকের ট্যাঙ্কে গিয়ে লাগল। কারণ, চোখের পলকে বাইকটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। রাস্তাটা আলোয় আলো হয়ে গেল।

আমি ততক্ষণে ওদের পাশ কাটিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেছি। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, অন্য বাইকটা টালমাটাল হয়ে রাস্তা ছেড়ে মাতালের মতো আগাছার ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

আমি পিস্তলটা প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিলাম। ওটার তাপ টের পেলাম শরীরে।

নিশা আমার জামা খামচে ধরে ছিল। কেন জানি না মনে হল, ওর শক্তপোক্ত ভাবটা অনেক নমনীয় হয়ে গেছে।

বাইক চলে এল ভি. আই. পি. রোডে। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে চললাম। নজর সবসময় সামনের রাস্তায় আর রিয়ারভিউ মিরারে। পথে আর কোনও নতুন ঝামেলা আছে কি না কে জানে!

পাঁচ থেকে বড়জোর সাতমিনিট। আমরা পৌঁছে গেলাম 'সাফারি' গেস্ট হাউসের কাছাকাছি।

বাইকটা মেটাল রোড থেকে নামিয়ে কাঁচা রাস্তায় নিয়ে গেলাম। সেখানে দুটো পুরানো ভাঙা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশেই ইটের পাঁজা আর স্টোন চিপ্‌স-এর টিবি। গাড়িদুটোর আড়ালে বাইকটা এমনভাবে দাঁড় করালাম যাতে রাস্তা থেকে চট করে চোখে না পড়ে। তারপর নিশাকে বললাম, 'নেমে পড়ো। আমরা একটা গেস্ট হাউসে ঢুকব।'

নিশার মনে প্রশ্ন ধাক্কা মেরেছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

সবকিছু ঠিকঠাক মতো লক-টক করে ওকে নিয়ে হাঁটা দিলাম। বাইকটা ইচ্ছে করেই এমন দূরে রেখেছি যাতে বোঝা না যায় বাইকের সওয়ারিরা কোথায় গিয়ে ঢুকেছে।

'সাফারি'-তে আগে থেকেই ঘর বুক করে রেখেছিলাম। ম্যানেজার এরশাদ আমার অনেকদিনের দোস্ত। এই গেস্ট হাউসটার সবচেয়ে বড় গুণ হল, ওরা কাউকে কোনও প্রশ্ন করে না। আর কেউ উলটোপালটা প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় 'জানি না', 'দেখিনি', 'শুনিনি' আর 'বলতে পারছি না'।

এরশাদ বলে, 'আমার মুসাফিরখানায় যারা আসে তাদের আরাম দেওয়াই আমার মকসদ। ব্যস, আর কিছু না। এর বেশি কিছু আমি জানি না।'

সুতরাং খাতায় বানানো নাম-টাম লিখে তিনতলার ঘরে পৌঁছে গেলাম।

বড় মাপের ফ্যাশানদুরস্ত ঘর। ভোমরার গুঞ্জন তুলে এসি চলছে। ফ্লুওরেসেন্ট আলো মার্বেলের মেঝে থেকে ঠিকরে আসছে। রুম ফ্রেশনারের সুন্দর গন্ধ মনটা ভালো করে দিতে চাইছে।

বেয়ারা চলে যেতেই নিশা ভুরু উঁচিয়ে জানতে চাইল, 'আমরা এখানে এলাম কেন? এভাবে সময় নষ্ট করার মানে কী?'

আমি সিগারেট ধরালাম। একটু সময় নিয়ে বললাম, 'এখানে আমরা একটু রেস্ট নেব। আগেই তো তোমাকে বলেছি, আমার কাজের স্টাইল আলাদা।'

নিশা ধবধবে চাদর মোড়া বিছানার একপাশে বসে পড়ল। চোখের কোণ মুছে বলল, 'একটা মেয়েকে নিয়ে হোটেলে নাম ভাঁড়িয়ে ওঠার স্টাইলটা বস্তাপচা। স্টিঙ্কিং।'

'কেন, মিরচান্দানির সঙ্গে এরকম স্টাইলে কোথাও উঠেছিলে নাকি?'

নিশা হঠাৎই কেঁদে ফেলল। মুখ নিচু করে মাথা নেড়ে বোঝাতে চাইল 'হ্যাঁ'।

আমি ওকে কান্নার সময় দিলাম। ভালোবাসা স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে না। বাবুরামের গ্যাঙে ওই মারাত্মক জীবনযাপনের ফাঁকে নিশা আর মিরচান্দানির মধ্যে ভালোবাসার একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল। সেই বিক্রিয়ার ঘোর কাটতে কিছুটা সময় লাগবে।

আমি মোবাইল ফোন বের করে নাগিনাসাহেবকে ফোন করলাম।

'হ্যালো—আমরা ঠিক আছি।'

'কে, চন্দর? তোমরা এখন কোথায়?'

নাগিনাসাহেব বড্ড নাছোড়বান্দা পাবলিক। বললাম, 'আমরা এখন রাস্তার ধারে, একটা বটগাছের তলায়।'

এবার নাগিনাসাহেবের মাথায় জল ঢুকল। বুঝলেন, সঠিক জায়গা আমি বলতে নারাজ।

'কোনও ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট হয়নি তো?'

'না। তবে মনে হয় বাবুরামের গোটাদুয়েক টপকে গেছে।'

'নিশা?'

'পারফেক্টলি ও. কে.।'

'ওর গায়ে যেন আঁচ না লাগে। মনে থাকে যেন। তোমরা কখন আমার এখানে ঢুকছ?'

'ঠিক নেই। রাত হতে পারে।'

'নিশাকে ফোন দাও।'

নিশার কাছে গিয়ে ওর হাতে ফোন দিলাম।

ও মুখ তুলল। চোখ মুছল। দু-তিনবার 'হুঁ-হাঁ' করল ফোনে। তারপর ফোনটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিল।

আমি নাগিনাসাহেবের সঙ্গে কথা বলতেই তিনি উল্লাসে ফেটে পড়লেন : 'শাবাশ, চন্দর। তুমি তো জিনিয়াস আছ।'

'পরে কথা হবে। বাই।' ফোন কেটে দিলাম।

আমি বিছানার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, 'ওরা আমাদের যত পারে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াক। ওরা ভাবতেও পারবে না, আমরা হোটেলের ঘরে নিশ্চিন্তে রিল্যাক্স করছি। সেইজন্যেই বলছিলাম, আমার স্টাইল একটু আলাদা।'

নিশা ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকাল, বলল, 'সরি—।'

চুল কেটে ফেলায় ওর বয়েস বেশ খানিকটা কম দেখাচ্ছে।

'খিদে পাচ্ছে?'

'একটু-একটু—।'

আমি রুম সার্ভিসকে ডেকে ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, কোল্ড ড্রিঙ্ক্স আর হার্ড ড্রিঙ্কস-এর বোতল দিতে বললাম।

সেলাম ঠুকে বেয়ারা চলে গেল। এরশাদের সঙ্গে আমার মাখামাখির কথা 'সাফারি'-র বেয়ারারা ভালো করেই জানে। তাই মুখ বুজে ঝটপট সার্ভিস দেয়।

সিগারেটের শেষ টুকরোটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলাম।

নিশা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অস্পষ্ট ভাঙা গলায় বলল, 'আমার জন্যে এত খরচ করছেন কেন? আই অ্যাম ফিনিশ্‌ড।'

'শেষ হওয়ার আগে কেউ শেষ হয় না। তা ছাড়া এগুলো আমার ইনভেস্টমেন্ট—তোমাকে টিপটপ অবস্থায় নাগিনাসাহেবের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এ-কাজের জন্যে আমি পয়সা পাই।'

'এসব কাজ ছাড়া লাইফে আর কোনও কাজ খুঁজে পাননি?'

'না, পাইনি। আমার লাইফ তুমি কী জানো!' চেয়ার ছেড়ে বিছানায় উঠে বসলাম 'বাবা কে জানি না। মা যে-কাজ করত সেটা কোনও মেয়ে সাধ করে করতে চায় না। আমাকে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া করিয়েছে। লেখাপড়া মাস্টাররা শিখিয়েছিল, আর খারাপ কাজগুলো আমি নিজে-নিজে শিখে নিয়েছিলাম। তবে ভেবেছিলাম, বেলাইনে যাব না...কিন্তু মায়ের ক্যান্সারটাই সব প্ল্যান চৌপাট করে দিল। আমি চন্দ্রকান্ত থেকে চন্দর হয়ে গেলাম। চন্দ্রবিন্দুর ব্যাবসায় এসে পড়লাম।'

'আপনার মায়ের ক্যান্সার হয়েছিল?' নিশার চোখে মায়া ফুটে উঠল।

'হ্যাঁ। তার ট্রিটমেন্ট করার খরচ সামলাতে গিয়েই পা পিছলে গেল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! মা-কে ফেরাতে পারলাম না—আর আমিও ফিরতে পারলাম না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'এখন আগে-পিছে কেউ নেই। সব সময় দুটো খতরনাক চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরি—জীবন আর মৃত্যু। হয় টপকাও—নইলে টপকে যাও।' হাসলাম আমি 'হুঃ...আমার নামটা চন্দ্রকান্ত না হয়ে চন্দ্রবিন্দু হলে ভালো হত।'

'আর আমার নামটা বিসর্গ হলে বেশ মানাত। একটা শূন্য নয়—দু-দুটো শূন্য।'

'তা কেন হবে? তুমি কি জীবনে কিছু পাওনি?'

'পেয়েছি কিনা বুঝতে পারিনি। তাই পেলেও সেটা শুধু ভগবানই জানেন।'

বেয়ারা এসে খাবারদাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। ওর হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিলাম। তারপর নিশাকে বললাম, 'এসো, একটু খেয়ে নাও।'

খেতে-খেতেই ওর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কেন জানি না ওকে দেখে আমাকে কথায় পেয়ে বসেছিল। আর কথা বলতে-বলতে নিশাও ধীরে-ধীরে সহজ হয়ে উঠছিল।

'মিরচান্দানির আগে কেউ ছিল না?'

'ছিল—দুজন।' চোখ মুছল নিশা।

'কী নাম ছিল ওদের?'

উত্তর দিতে ও খানিকটা সময় নিল। তারপর

'জেনে কী লাভ! তবে তখনও আমি নষ্ট হয়ে যাইনি—।'

'বাবুরামের গ্যাং প্রথম—না তার আগেরও হিস্ট্রি আছে?'

'সেরকম কিছু না। ছোটখাটো কেপমারি, ড্রাগ পেডলিং।' হাসল নিশা 'ওটা ছিল আমার ট্রেনিং পিরিয়ড।' তারপর তেরছা চোখে তাকিয়ে আচমকাই প্রশ্ন করল, 'আপনি কোন গ্যাঙে আছেন?'

মুখ ভরতি ফ্রায়েড রাইসকে পেপসি দিয়ে নীচে নামিয়ে বিষণ্ণ হাসলাম। একটু সময় নিয়ে বললাম, 'কারও কেউ নইকো আমি, কেউ আমার নয়...।'

'কেউ কখনও আপনার হয়নি—একফোঁটাও লাভ-হিস্ট্রি নেই?'

'অদ্ভুত কথা। লাভ-হিস্ট্রি। নিশা, আমার সব লাভ-হিস্ট্রি আসলে ক্ষতির হিস্ট্রি—ওসব শুনে লাভ নেই। শুধু-শুধু আবার কষ্ট পাব।'

'এখনও ওসব কথা মনে করে কষ্ট পান? তা হলে তো খুবই ক্ষতির হিস্ট্রি!'

আমি মাথা নাড়লাম 'হ্যাঁ—।'

'এই লাইফ আপনার ভালো লাগে?'

বুকে একটা ধাক্কা লাগল।

নিশা এমন করে তাকাল, এমন ঢঙে কথাটা বলল যে আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

'এটা আমার লাইফ নয়—অন্য একটা বেপরোয়া বন্দুকবাজ খতরনাক লোকের লাইফ—আমি তার হয়ে প্রক্সি দিচ্ছি, তার হয়ে বেঁচে আছি। এই লাইফটাকে আমি ঘেন্না করি, কিন্তু জড়িয়ে গেছি। আর বেরোনো যাবে না।'

নিশার অদ্ভুত দৃষ্টি, ওর গা থেকে ভেসে আসা পারফিউমের গন্ধ, এয়ারকুলারের মিহি শব্দ—সব মিলিয়ে আমার কেমন ঘোর লেগে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, স্বপ্ন দেখছি।

'ভালোই বলেছেন। আমিও বোধহয় প্রক্সি দিচ্ছি। যতই দলবদল করি, আসল ব্যাপারটা একই থাকবে। বাবুরাম, নাগিনাসাহেব—সব সমান। বিবেক চলে যাওয়ার পর আর কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না।'

খাওয়া শেষ করে ভুরু তুলে তাকালাম 'বিবেক! কেন, তোমার বিবেক বলে কিছু নেই?'

'ওই বিবেক না।' হাসল নিশা 'বিবেক মিরচান্দানি—মিরচান্দানি।'

'ওকে খুব ভালোবাসতে?'

'আমার পক্ষে যতটা ভালোবাসা সম্ভব।' নিশার খাওয়া আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ও কোল্ড ড্রিঙ্কস-এ চুমুক দিচ্ছিল।

'একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'করুন—।'

'নাগিনাসাহেব তোমাকে দলে টানার জন্যে এত ঝামেলা ঘাড়ে নিচ্ছেন কেন, এত খরচ করছেন কেন? হি টোল্ড মি য়ু আর ভেরি প্রেশাস।'

ঠোঁট টিপে চুপ করে রইল নিশা। আমাকে একটানা এমনভাবে দেখছিল যে, আমার অস্বস্তি হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পর মলিন হেসে জিগ্যেস করল, 'কেন জানতে চাইছেন?'

'খুব জানতে ইচ্ছে করছে। যদি অসুবিধে থাকে তা হলে বলতে হবে না।'

'তেমন অসুবিধে কিছু নয়, তবে...এখন ওসব কথা থাক। মুডটা অফ হয়ে যাবে।'

আমি হার্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে বসলাম। নিশাকে জিগ্যেস করলাম, ওর জন্যেও গ্লাস নেব কি না। ও বলল, না, ওর এসবে তেমন অভ্যেস নেই।

আমি গ্লাসে কয়েক চুমুক দেওয়ার পর বললাম, 'একটা অদ্ভুত ফিলিং হচ্ছে, নিশা। তোমার জীবনের সঙ্গে দু-তিন ঘণ্টার জন্যে জড়িয়ে গেলাম। অথচ আগের জীবনটাও ভালো করে জানি না, পরের জীবনটাও ভালো করে জানতে পারব না।'

'ঠিকই তো! পোস্টম্যান কত সুখ-দুঃখের খবর দেওয়া-নেওয়া করে—সে কি আর গল্পগুলো জানতে পারে! খামের ভেতরে কী গল্প লুকিয়ে আছে সেটা পোস্টম্যানের জানার রাইট নেই।'

'কিন্তু আমার যে গল্পটা ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।'

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল নিশা 'তা হলে তো পোস্টম্যানের কাজটা আপনাকে ছাড়তে হবে। সেটা কি পারবেন?'

'খুব শক্ত কাজ। তবে চেষ্টা করে দেখা যায় না এমন শক্ত বোধহয় নয়।'

আমার মনে হচ্ছিল, আমি নেশার ঘোরে উলটোসিধে বকে চলেছি। কিন্তু এত অল্পে আমার তো নেশা হয় না!

এমন সময় নিশার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

ও বিছানায় রাখা হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে ফোনটা ধরতে যাচ্ছিল, আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত চেপে ধরলাম। মাথা নেড়ে ইশারা করে বললাম, ফোন ধোরো না।

ওর ফোনটা আমি তুলে নিয়ে কথা বললাম।

'হ্যালো—।'

'তু কওন হ্যায় বে? নিশাকো ফোন দে।' সেই রুক্ষ পুরুষ কণ্ঠস্বর।

আমি ঠান্ডা মাথায় বললাম, 'নিশার টাইম খতম। ওকে ঠিকানায় লাগিয়ে দিয়েছি।' তারপর মুখ দিয়ে গুলি ছোড়ার আওয়াজ করলাম।

'সালা কওন হ্যায় তু?'

'মিরচান্দানিকা জিন। জয় রামজিকি—।'

লাইন কেটে দিয়ে নিশাকে ফোনটা ফিরিয়ে দিলাম।

'কী, পারবেন ছাড়তে?' নিশা জিগ্যেস করল।

'কী ছাড়ব?'

'ওই যে বললাম, পোস্টম্যানের কাজ—।'

'ছাড়তে পারব কি না জানি না...তবে তোমার কথা শুনে ছাড়তে ইচ্ছে করছে। ছাড়লেই তোমার গল্পটা জানতে পারব। তাই তো? সেটা কি কম!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'আসলে আমার হাতে এত রক্ত লেগে আছে...এখন হাত ধুলেও যাবে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'জানি, আমার রক্ত দিয়েই রক্তের গল্পটা শেষ হবে।'

'আমারটাও বোধহয় তাই।'

'উঁহু। নাগিনাসাহেব তোমাকে হয়তো চোখের মণি করে রাখবেন। তোমার কাছে বাবুরামের গ্যাঙের কত খবর আছে। তা ছাড়া তুমি বিউটিফুল...।'

'সে তো বাইরেটা। ভেতরটা তত বিউটিফুল না।'

'কে জানে! আমি তো এখনও ভালো করে দেখতে পাইনি। বিউটিফুল হতেও তো পারে!'

'সর্বনাশ করেছে! আপনি আবার আমার প্রেমে পড়ে গেলেন নাকি?'

প্রেমে পড়েছি? এই মেয়েটার? অবাক হয়ে গেলাম আমি। কত সহজে কথাটা বলল ও! কত সহজে মিরচান্দানির জন্যে চোখের জল ফেলল। আবার কত সহজে সেটা মুছেও নিল।

বিপজ্জনক জীবন নিয়ে যারা বল লোফালুফি খেলে তারা এমন সহজভাবেই বোধহয় জীবনটাকে নেয়।

নিশাকে ভালো করে দেখলাম আমি।

আমার দেওয়া শাড়ির প্যাকেট থেকে যে-শাড়িটা ও বেছে নিয়েছে সেটার রং হালকা নীল। তার সঙ্গে কালো ব্লাউজ আর লাল টিপ তেমন মানানসই হয়নি। কিন্তু ওর ধারালো সুন্দর মুখ সব গরমিল ঢেকে দিয়েছে।

ওর ফরসা মুখে চোখ দুটো এত গভীর যে, মনে হয় তুলিতে আঁকা— কাজল পরেছে বলে ভুল হয়। বাঁ চোখের পাশে একটা ছোট্ট তিল। নাকের ডগাটা সামান্য ভোঁতা এবং ওপরদিকে বাঁকানো। তাতেই কেমন একটা খুকি-খুকি ভাব জড়িয়ে গেছে মুখে। আর ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল ওকে পুতুল-পুতুল করে দিয়েছে।

এরকম অ্যাসেটকে বাবুরাম ঠিক কী কাজে লাগাত? বোধহয় পুলিশকে বেওকুফ বানানোর কাজে। কিংবা গেস্টদের এনটারটেইন করার কাজে।

'হাঁ করে কী দেখছেন?'

নিশা প্রশ্নটা করতেই চমকে উঠলাম। সত্যিই তো, এতক্ষণ ধরে কী দেখছিলাম আমি?

মনটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নেশার ঘোর কাটালাম। কবজি উলটে হাতঘড়ি দেখলাম। রাত অনেক বেড়েছে। এবার নিশ্চিন্তে বেরোনো যেতে পারে।

'আমার কথার জবাব দিলেন না?' নিশা জিগ্যেস করল।

'এখন না—পরে। আমাদের এখন উঠতে হবে।'

আর সময় নষ্ট না করে দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আমরা চলে এলাম বাইকের কাছে।

নিশা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আপনি বড় অদ্ভুত পাবলিক।'

'কেন?'

'হোটেলে উঠলেন, এতক্ষণ সময় কাটালেন, অথচ...।'

আমি হাসলাম 'কেন, তোমার ইগো হার্ট করেছি?'

'না, তা না...তবে...।'

'তবে কী? নিশা, তুমি আমাকে কী দিতে পারো? বড়জোর একটা শরীর— যার সঙ্গে সম্পর্ক পাঁচ-সাত মিনিটের। এরকম সম্পর্ক তোমার আগেও কত হয়েছে, ভেঙেছে। ওতে আমার কোনও টান নেই। টান আছে এমন কিছু দিতে পারলে ভেবে দেখতাম।'

'যদি সত্যি-সত্যি দিই?' নিশার চোখের কোণে জলের বিন্দু চিকচিক করে উঠল।

'দিয়েই দ্যাখো—।'

'এই কথাগুলো আপনি বিশ্বাস করেন?' ধরা গলায় ও বলল।

'করি। কেন, তুমি করো না?' একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'নিশা, আমি

এখনও পোস্টম্যান। হাতের কাজটা আগে আমাকে শেষ করতে হবে। তারপর...যাকগে, চলো।'

'তারপর কী?'

নিশা স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখের কোণ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। কোনও কথা বললাম না। শুধু এলোমেলো পথ ধরে বাইক ছুটিয়ে দিলাম।

আকাশের চাঁদ ওপর থেকে মজা দেখছিল। দেখছিল, একটা পোস্টম্যান কীভাবে চাকরি নিয়ে দোটানায় পড়েছে।

বাইক চালাতে-চালাতে আমি নিশার গন্ধ টের পাচ্ছিলাম। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। জোর করে ঘুম তাড়িয়ে রাস্তায় মনোযোগ দিলাম। বিপদের গন্ধের জন্যে তৈরি থেকে হু-হু করে বাইক ছুটিয়ে চললাম।

নিশার মতো অ্যাসেটকে নাগিনাসাহেব কী কাজে লাগাবেন কে জানে!

ছোট্ট একটা নোংরা ঘরে ছোট্ট একজন নোংরা মানুষ।

ঘরটা সকালে যে-অবস্থায় দেখে গেছি রাতে ঠিক যেন তার জেরক্স কপি। অর্থাৎ, ওরিজিনালের চেয়ে একটু আবছা। তবে মাথার ওপরে সেই ডাব্বু পাখার ক্যাঁচকঁ্যাচ। আর পলেস্তারা খসা দাঁত বের করা দেওয়ালে বাল্‌বের আলোর মলিন প্রলেপ।

ঘরে নাগিনাসাহেবের পেটেন্ট বিড়ির গন্ধের সঙ্গে নিশার পারফিউমের গন্ধ মিশে গেল—একটা নাম-না-জানা গন্ধ তৈরি হল।

নাগিনাসাহেব চেয়ারে দু-পা তুলে হাঁটুজোড়া উঁচু করে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে ছিলেন, আর ঠোঁট টিপে চোয়াল নেড়ে কী একটা চিবোচ্ছিলেন—বোধহয় গুট্‌খা বা ওইরকমই কিছু। আমাকে আর নিশাকে দেখেই ঠোঁট বন্ধ রেখে 'উঁ-উঁ' করে ফুর্তির শব্দ করলেন। তড়াক করে চেয়ার থেকে নেমে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে গেলেন ঘরের কোণে। অনেকটা বমি করার ঢঙে মুখে ভাসা লাল রঙের তরল উগরে দিলেন দেওয়ালের খাঁজে। তারপর দু-চারবার থু-থু করে আমাদের দিকে তাকালেন। দু-চোখ উল্লাসে টগবগ করছে।

'তো নিশা আ গই! আ গই নিশা।' হাতভঙ্গি দিয়ে দু-হাত তুলে নাগিনাসাহেব এমন একটা ভঙ্গি করলেন যেন খুব টান-টান ওয়ান ডে ম্যাচে শেষ বলে জিতে গেছেন।

আমি নোংরা লোকটাকে দেখছিলাম।

ময়লা পাঞ্জাবিতে গুট্খার রসের দাগ। পাজামাটা গোড়ালি থেকে প্রায় চার-পাঁচ ইঞ্চি উঁচু করে পরা। গলায় মোটা সোনার চেন। গোলগাল মুখে ভুমো নাক। চকচকে চঞ্চল চোখজোড়া একবার আমাকে একবার নিশাকে চেটে নিচ্ছে।

'বোসো, চন্দর—বোসো, বোসো। ওয়েলকাম, নিশা, ওয়েলকাম—বোসো, বোসো।'

আমি আর নিশা দুটো চেয়ারে বসে পড়লাম। ড্যাম্প ধরা ঘরের বোটকা গন্ধে লাইটার জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাতে বাধ্য হলাম।

নিশা অবাক চোখে নাগিনাসাহেব এবং ঘরটাকে দেখছিল। অবাক ও হতেই পারে। কারণ, ও নাগিনাসাহেবের নাম শুনেছে বহুবার, কিন্তু স্বচক্ষে তাঁকে একটিবারও দেখেনি। হয়তো ও এখন ভাবছে, এভাবে দল পালটে ও ঠিক করল কি না। যদিও এখন আর কিছু করার নেই।

চেয়ারে বসে টেবিলে থাবার মতো দুটো হাত রেখে সামনে ঝুঁকে পড়লেন নাগিনা 'চন্দর, তুমি বহুত টেনসান দিতে পারো—হাঁ। ইতনা টেনসান—সালা, ইতনা টেনসান! একটা ফোন করতে তোমার কী হয়!'

'তিনবার তো ফোন করেছি—।'

'তো ছ'বার করলে কী প্রবলেম হত! আমি তোমাদের সেফ্টির জন্যে ভেবে মরছি। আরে তোমার খবর নেই, নিশার খবর নেই...।'

আমি হাসলাম। নাগিনাসাহেব আমার সেফ্টি চাইছিলেন নিশার সেফ্টির জন্যে। কিন্তু নিশার এত দাম কীসের সেটাই এখনও বুঝতে পারছি না।

একটা রোগা দুর্বল লোক পরোটা আর চিকেন মশালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। বেশ কায়দা এবং কসরত করে নোংরা টেবিলটাকে পরিচ্ছন্ন করে খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে দিল। সাজানোর পর বোঝা গেল খাবারের ব্যবস্থা আমার আর নিশার জন্যে।

'ও. কে. বাবা, ও. কে.। নাও, এবার খেয়ে নাও।'

তারপর নিশার দিকে চোখ ছোট করে তাকালেন নাগিনা 'নিশা, খবর তো পাক্কা?'

'হ্যাঁ—কনফার্ম্ড।'

কীসের খবর? ওরা দুজনে কীসব কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে?

'ঠিক আছে, আগে খেয়ে নাও—চন্দর চলে যাক, তারপর কথা হবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমি আদার ব্যাপারি, আদা নিয়ে মাথা ঘামানোই ভালো। সুতরাং সিগারেটটা টেনে ছোট করতে লাগলাম।

একটু আগে দেখা রোগা লোকটি থাম্‌স আপ-এর একটা বড় বোতল টেবিলে

গিয়ে দিয়ে গেল—সঙ্গে দুটো গ্লাস। আমি দুটো গ্লাসেই থাম্‌স আপ ঢেলে দিলাম। খিদে খুব একটা পাচ্ছিল না। আবার এখন না খেলে রাতে আর খাওয়ার সময় হবে বলে মনে হয় না।

লক্ষ করলাম, নিশা কেমন যেন উসখুস করছে, বারবার চকিত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ভয়ের প্রচ্ছন্ন ছায়া কখন যেন একটা মুখোশ হয়ে ওর মুখে এঁটে বসেছে।

নিশার নীরব কাকুতি আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। ও চাইছিল না, ওকে এখানে রেখে আমি চলে যাই। অথচ ও এখানে থাকতেই এসেছিল।

আমি নিশাকে বললাম, 'নাও, খেয়ে নাও—।'

নিশা আমার চোখে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে! আলতো করে হাত বাড়াল প্লেটে রাখা পরোটার দিকে। ওর সরু-সরু আঙুল পরোটার টুকরো ছিঁড়ে নিতে লাগল।

আমি সিগারেটে পরপর বেশ কয়েকবার টান দিয়ে সিগারেটটাকে ছোট করে ফেললাম। তারপর টুকরোটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে রগড়ে দিলাম। থাম্‌স আপ-এর একটা গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিতে যাব, নাগিনাসাহেব চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। মাকড়সার মতো তরতরে পায়ে নিশার পিঠের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

কালো ব্লাউজের বৃত্তচাপের ওপরে নিশার ফরসা পিঠ দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে কয়েকপলক তাকিয়ে থেকে নাগিনাসাহেব মেয়েলি ঢঙে হাসলেন। কোমর থেকে নেমে যাওয়া পাজামাটাকে বাচ্চাছেলেদের স্টাইলে টেনে তুললেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'বিউটিফুল—সো বিউটিফুল।' নিশার পিঠে হাত রাখলেন নাগিনা। ওঁর আঙুলগুলো কাঁকড়ার পা হয়ে নিশার ফরসা নরম জমিতে সড়সড় করে ঘুরতে লাগল।

আমার বিরক্ত লাগছিল। বারবার নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম, নিশা নাগিনার সম্পত্তি। আমি একজন পোস্টম্যান মাত্র। কিন্তু তবুও ভেতরে-ভেতরে কেমন একটা রাগ হতে লাগল।

নাগিনা হেসে বললেন, 'মিরচান্দানির আপশোস রয়ে গেল। টেস্ট করার টাইম পেল না। বেচারি জানলই না নিশা খাট্টা, ইয়া মিঠা। কী, চন্দর, ঠিক বলছি?'

আশ্চর্য! এতক্ষণ ধরে নাগিনার এই ছোঁকছোঁক কাণ্ড চলছে অথচ নিশা নির্বিকার। মাথা ঝুঁকিয়ে পরোটা দিয়ে চিকেন মশালা খাচ্ছে। শুধু দেখলাম, ওর চোয়ালের হাড় শক্ত উঁচু হয়ে আছে।

আমি নাগিনার কথার কোনও জবাব না দিয়ে থাম্‌স আপ-এ চুমুক দিলাম—লম্বা চুমুক। লক্ষ করলাম, নিশা আড়চোখে আমার দিকে একবার দেখল।

আমি গ্লাসে আবার চুমুক দিলাম।

নাগিনাসাহেবের হাতের আঙুল এখন নিশার গলায়, থুতনিতে। নিশাকে লক্ষ করে আহ্লাদী গলায় বললেন, 'আরে বোল, তু খাট্টা, ইয়া মিঠা...?'

আমি থামস্ আপ ছেড়ে হঠাৎই উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, 'নাগিনাসাহেব, আমার রাত হয়ে যাচ্ছে—টাকাটা দিয়ে দিন।'

'ও, হাঁ, হাঁ, এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।'

নিশাকে সুড়সুড়ি দেওয়া ছেড়ে নাগিনা টেবিলের কাছে এলেন। টেবিলে পড়ে থাকা একটা মোবাইল ফোন তুলে নিয়ে পটাপট বোতাম টিপে ফোনে কথা বললেন।

'হ্যালো, পাপ্পি, চার পেটি লানা। হাঁ, চার পেটি।'

ফোনটা টেবিলে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন নাগিনা। ওঁর ময়লা দাঁত দেখা গেল। এ-দাঁত কুমারী দাঁত। কোনও টুথব্রাশ এখনও এর ধর্ম নষ্ট করতে পারেনি।

'চন্দর, একটু কিছু খেয়ে নিতে পারতে।'

'না, আমার দেরি হয়ে যাবে—।'

এমন সময় পাপ্পি এসে ঘরে ঢুকল। একপলক নিশার দিকে তাকাল—ভাদ্র মাসে কুকুর যেমন তাকায়। তারপর চারটে বান্ডিল এগিয়ে দিল নাগিনার দিকে 'চার পেটি, বস।'

নাগিনা টাকাটা নিয়ে আমাকে দিল।

'কী, খুশ তো?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। কুরিয়ার তার সার্ভিস চার্জ পেলে খুশি হবে না কেন! বান্ডিলগুলো কার্গো প্যান্টের পকেটে চালান করে দিলাম।

আমি যখন চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি তখন নিশা পেছন থেকে ডেকে উঠল, 'শুনুন—।'

আমি ঘুরে তাকালাম। দেখলাম, নিশার খাওয়া থেমে গেছে। ও অসহায় কিশোরীর চোখে তাকিয়ে আছে। কোথায় গেল ওর পোড়খাওয়া জীবনের আত্মবিশ্বাস, কোথায় গেল ওর স্মার্টনেস!

নিশা কয়েক সেকেন্ড ধরে কী যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু কোনও কথা বেরোল না। কোনও জন্ম-বোবা কিশোরী যেন প্রথম স্বর ফিরে পেয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে।

তারপর, অনেক কষ্টে, কয়েকটা শব্দ ছিটকে বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে 'জানেন, আমি কেন এত প্রেশাস? কী ইনফরমেশান আছে আমার কাছে?'

হাসলাম আমি 'জানি না, জানতে চাই না। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি স্রেফ কুরিয়ার। চলি—।'

আমি ঘরের দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

পেছন থেকে নিশার মরিয়া গলা শুনতে পেলাম 'জানেন, আমার কাছে ড্রাগের ইনফরমেশান আছে! সাড়ে চার কেজি ব্রাউন শুগার। বাবুরাম মালটা একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। আমি সেটার খবর জানি—আর কেউ জানে না—-নোবডি। তাই আমি এত প্রেশাস।'

আমার বুকের ভেতরে ঘন্টা বাজতে শুরু করল।

এসব কী বলছে নিশা! নিশার দাম তা হলে কোটি টাকারও বেশি!

আমার মুখে বোধহয় অবাক ভাব-টাব ফুটে উঠেছিল। কারণ, নাগিনাসাহেব হঠাৎই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছেন। বেঁকে-বেঁকে, দুলে-দুলে—অনেকটা চাঁদাবোড়া সাপের মতো।

আমি নিশার দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম।

পাঞ্জি আমার দিকে এক পা এগিয়ে এল।

নাগিনাসাহেব হাসতে-হাসতেই নিশার কাছে চলে গেলেন। ঝুঁকে পড়ে ওর মাথায় শব্দ করে চুমু খেয়ে বললেন, 'মাই সুইট ডল। দেখতে যেমন, কাজেও তেমন—তাই না, চন্দর?'

কেন জানি না, আমার মাথার ভেতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। দু-ঘণ্টা আগে টানা হুইস্কি কি এখন মাথায় ঝটকা মারছে?

নিশা চকিতে উঠে দাঁড়াল। ছুটে আসতে চাইল আমার দিকে।

নাগিনাসাহেবের বাঁ হাত ওর চুল লক্ষ করে ছোবল মারল। নির্ভুলভাবে খামচে ধরল ওর চুল। এবং এক হ্যাঁচকায় মেয়েটাকে টেনে নিল নিজের বুকে।

ওকে বাজেভাবে আদর করতে-করতে আমাকে লক্ষ করে নাগিনাসাহেব জড়ানো গলায় বললেন, 'চন্দর, তুমি কেটে পড়ো—জলদি। সুহাগরাতকা টেইম হো গিয়া, ভাই।'

আমার কাছে এসব নতুন কিছু নয়। নাগিনার গ্যাঙে কোনও মেয়ে থাকা মানেই গ্যাঙের মালিক ওর মালিক। হয়তো বাবুরামের গ্যাঙেও ব্যাপারটা তা-ই ছিল। কিন্তু নিশা এরকম ঝটপটাচ্ছে কেন—যেন বেড়ালে কবুতর ধরেছে!

নাগিনাসাহেব হাসছিলেন। ওঁর দেখাদেখি পাঞ্জিও হাসছিল। নাগিনাসাহেব পাঞ্জির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে হেসে ইশারা করলেন—যার অর্থ, একটু ধৈর্য ধরো, পরে তুমিও মধু খাবে।

কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী করা উচিত। একজন পোস্টম্যান এই সিচুয়েশানে কী করতে পারে—নির্বিবাদে চলে যাওয়া ছাড়া!

হঠাৎই নাগিনাসাহেব বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন 'কী হল, চন্দর!

বলছি না কেটে পড়ো! তুমি কাম খালাস করেছ, আমি নোট খালাস করেছি—ব্যস, লেনা-দেনা খতম।'

লেনা-দেনা খতম। সত্যি?

আমি গোড়া থেকে ব্যাপারটা ভাবতে চাইছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, নাগিনাসাহেব কেন আমাকে দিয়ে কুরিয়ারের কাজটা করিয়েছেন। নিশাকে বে-আঁচড় সাপ্লাই দেওয়া একটা পয়েন্ট। কিন্তু মেন পয়েন্ট হল, বাবুরাম যেন জানতে না পারে নিশা পালিয়ে কার গ্যাঙে গেছে—অন্তত পাঁচ-সাতটা দিন। নিশার সেফ্‌টির জন্যে মিরচান্দানি নিশ্চয়ই শত টরচারেও মুখ খোলেনি। শুধু নিশার মোবাইল নম্বরটা উগরে দিয়েছে। তারপর জান দিয়েছে।

নিশাকে নিশ্চয়ই বারণ করা ছিল, ও যেন ড্রাগের ব্যাপার-ট্যাপার কিছুতেই কাউকে না বলে—এমনকী আমাকেও না। তবে আমার ধাত নাগিনাসাহেব জানেন চুক্তির বাইরে আমি কাজ করি না। গদ্দারি আমার না-পসন্দ।

কিন্তু না-পসন্দ তো এই ব্যাপারটাও—চোখের সামনে যেটা এখন হচ্ছে, এবং তারপরে যেটা হবে!

কী হতে পারে তারপর?

নাগিনাসাহেব আজকালের মধ্যে নিশার কাছ থেকে ব্রাউন শুগারের ঠিকানাটা আদায় করে নেবেন। ওকে নিয়ে সপ্তাখানেক হ্যাংলার মতো সুহাগরাত মানাবেন। তারপর...তারপর ওকে...লেনা-দেনা খতম।

খতম!

আমার বুকের ভেতরে নিশার জন্যে একটু ভয় দেখা দিল। ভাবতে অবাক লাগল যে, ওর জন্যে আমি ভাবছি। আমি তো নিজের জন্যেও ঠিকমতো কখনও ভাবিনি!

নিশা কোনওরকমে নাগিনাসাহেবের খপ্পর ছাড়িয়ে ছিটকে এল আমার কাছে। আকুলভাবে ডুকরে উঠে বলল, 'এ আপনি আমায় কোথায় নিয়ে এলেন!'

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, 'তুমি যেখানে আসতে চেয়েছ—।'

নিশা কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'আগে তো বুঝিনি! আপনাকে তো তখনই বলেছিলাম, আমাকে ছেড়ে দিন—আই হ্যাভ চেঞ্জড মাই মাইন্ড! আপনি তো শোনেননি...।'

'তোমাকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম।'

'এখন বাঁচাতে পারলেন? এখানে আমি বাঁচব? য়ু আর রেসপনসিব্‌ল। আপনি তো এখানকার ব্যাপারটা সব জানতেন...কিন্তু আমাকে বলেননি...।'

'সরি, নিশা।' আমার চোখ মেঝের দিকে চলে গেল।

নিশা এখনও পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। ও ভাবছে, এখানে সবাই ওকে পালা করে ঠুকরে খাবে। এবং সেখানেই ব্যাপারটা শেষ।

মোটেই তা নয়। ওকে পুরোপুরি শেষ করে তবেই গল্পটা শেষ হবে।

আমি ওর পরের জীবনটা জানতে চেয়েছিলাম—সেটা এখন জেনে গেছি—নিশা জানার আগেই।

চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে গেল।

সুন্দর চোখের ঘৃণা যে এত তীব্র, এত ভয়ঙ্কর হতে পারে, আমার জানা ছিল না।

ও বলল, ' "সরি" ছাড়া আর কী বলবেন! আপনি তো পোস্টম্যান!'

পোস্টম্যান! আমি পোস্টম্যান! হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান। পোস্টম্যান থেকে একটু চেষ্টা করে ম্যান হওয়া যায় না? শুধু ম্যান?

আমার চোখ জ্বালা করতে লাগল। কানে বাজতে লাগল : 'য়ু আর রেসপনসিব্‌ল। য়ু আর রেসপনসিব্‌ল। য়ু আর...।'

নাগিনাসাহেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমাদের 'সিনেমা' দেখছিলেন আর মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। পাঞ্জি একবার বসের দিকে, আর-একবার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল।

নাগিনা বললেন, 'ইয়ে পোস্টম্যানকা কেয়া চক্কর হ্যায়, চন্দর?'

আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম, 'আপনি বুঝবেন না।'

সঙ্গে-সঙ্গে নাগিনাসাহেব বুনো শুয়োরের মতো খিঁচিয়ে উঠলেন 'আভি নিকাল সালা। তখন থেকে বকবক-বকবক করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। ফুট সালা, ফুট। পাঞ্জি, চন্দরকে ফোটা—নিকাল দে উসকো।'

কথা বলতে-বলতে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন নাগিনা। জোরালো এক ঝটকায় নিশাকে টেনে নিলেন নিজের কাছে। অসভ্যের মতো নির্লজ্জ চুমু খেলেন ওর গালে, কপালে, ঠোঁটে।

কী যে হল আমার! কার্গো প্যান্টের পকেট থেকে চারটে বাণ্ডিল বের করে ছুড়ে দিলাম নাগিনার দিকে 'নিশাকে ছেড়ে দিন। ওকে আমি ন্যাশনাল হাইওয়ে থারটি ফোরে আবার ছেড়ে আসব। দ্য ডিল ইজ অফ।'

নাগিনার নোংরা আদর থমকে গেল। চোখ বড়-বড় করে তাকালেন আমার দিকে 'আরে চন্দর, ইয়ে কেয়া! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ! রুপেয়া উঠাও অওর দফা হো যাও। পাঞ্জি!'

আমি নিশাকে লক্ষ করে বললাম, 'নিশা, ড্রাগের খবরটা এক্ষুনি ভুলে যাও। কিছুতেই যেন ঠোঁটে না আসে। ওটা তোমার হেল্‌থ ইনশিয়োরেন্স।'

নাগিনা হাসলেন। নিশাকে ছেড়ে দিয়ে চোখ আগুন করে পাঞ্জির দিকে তাকালেন, রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পাঞ্জি!'

পাঞ্জি আমাকে মেপে নেওয়ার সময় চাইছিল। ভাবছিল, হিসেব না কষেই টক্করের ঝুঁকি নেবে কি না।

আমি দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডার-পরিবারের দিকে তাকালাম। তারপর নীচের দিকে চোখ নামালাম। কাচের বাক্স দুটো সকালের মতোই চাদরে ঢাকা দেওয়া। শুধু ফোঁসফোঁসানি শোনা যাচ্ছে না। যমজ ভাইরা বোধহয় ঘুমিয়ে আছে।

পাঞ্জির হিসেব কষা তখনও শেষ হয়নি। ও জানে, নাগিনাসাহেবের এই ডেরায় ঢুকতে গেলে মেশিনপত্তর সব বাইরের ঘরে জমা করে দিতে হয়। সুতরাং, আমার কার্গো প্যান্টের পকেট যে এখন খালি সেটা এই দু-পাবলিকই জানে। তাই পাঞ্জি এতক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ের হিসেবটাই কষছিল।

কিন্তু মনে-মনে লড়াই করে ও বোধহয় হেরে গেল। কারণ, দেখলাম, ও জামার আঁচল তুলে কোমরের কাছ থেকে একটা নেপালা বের করে নিল। বাল্‌বের মলিন আলো নেপালার ইস্পাতে ঠিকরে গেল।

নিশা 'উঁক' শব্দ করে মুখে হাত চাপা দিল। চোখ বড়-বড় করল। কিন্তু বড় কোনও চিৎকার করতে পারল না।

আমার ঠান্ডা শান্ত মুখ দেখে পাঞ্জি একটু অবাক হল। মনে হয়, সবসময় মরার ছলছুতো খোঁজে এমন দুশমনের সঙ্গে ওর কখনও মোকাবিলা হয়নি। এই প্রথম হল।

পাঞ্জি আমার দিকে পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল। চিতাবাঘ যেমন হরিণ ধরতে এগোয়। নাগিনাসাহেব নিশাকে খামচে ধরে 'সিনেমা' দেখছিলেন। আর আমি চট করে কয়েক পা ফেলে কাচের বাক্সদুটোর কাছে পৌঁছে গেলাম, পকেট থেকে লাইটার বের করে ক্যালেন্ডারগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিলাম।

সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝলাম, এটা নাগিনাসাহেব এবং পাঞ্জির হিসেবের বাইরে ছিল।

নাগিনাসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আবে চন্দর, তু পাগল হ্যায় কেয়া? রুক যা—রুক!'

পাঞ্জি কুৎসিত গালাগাল দিয়ে নেপালা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। কিন্তু ততক্ষণে আমি বুটের জোরালো লাথিতে চাদরে ঢাকা কাচের বাক্সদুটো ভেঙে চৌচির করে দিয়েছি।

চাদর আর ভাঙা কাচের নীচ থেকে একটা চন্দ্রবোড়া বেরিয়ে এল। আর-একটা রইল চোখের আড়ালে। তবে শুরু হয়ে গেল ওপরের ফোঁসফোঁস শব্দ।

আমি শরীরটাকে কাত করে নিজেকে পাঞ্জির ঝাঁপ থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলাম। তাই পাঞ্জি টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে—চন্দ্রবোড়াটার খুব কাছাকাছি।

আমি ভেবেছিলাম, চন্দ্রবোড়াটা আমার হয়ে কাজ সেরে দেবে, কিন্তু সেটা হল না।

পাঞ্জিই নেপালা দিয়ে কাজ সেরে দিল। এক কোপে সাপটাকে দু-টুকরো করে দিল—তারপর আর-এক কোপে তিন টুকরো। মেঝে থেকে আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরোল। সাপের টুকরোগুলো জ্যান্ত সরীসৃপের মতো লকলক করতে লাগল, মোচড়াতে লাগল।

আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি।

ক্যালেন্ডার জ্বলছিল, আগুনের শিখা লম্বায় বড় হচ্ছিল, কাগজ-পোড়া ধোঁয়া পাক খেয়ে-খেয়ে উঠছিল ঘরের সিলিং-এর দিকে।

পাঞ্জি মেঝেতে পড়ে ছিল। ও সামলে নিয়ে ওঠার আগেই আমি ঝুঁকে পড়ে ওর জামায় জ্বলন্ত লাইটার ধরলাম।

মেঝের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে পাঞ্জির হাত থেকে নেপালা ছিটকে গিয়েছিল। ও সেটাকে আবার যখন বাগিয়ে ধরতে পারল ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ওর জামার খুঁটে আগুন ধরে গেছে।

নাগিনাসাহেব 'আগ! আগ!' বলে চিৎকার করছিলেন, নিশাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন, কিন্তু শেষের কাজটায় বাধা পড়ল।

নিশা বোধহয় পড়ে যাচ্ছিল বলে টাল সামলাতে চাইছিল। তাই নেহাতই প্রতিবর্তীক্রিয়ায় নাগিনাসাহেবের জামা খামচে ধরেছিল। নাগিনা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নিশাকে নোংরা ভাষায় খিস্তি করলেন। পাজামার পকেট থেকে একটা ছোট মেশিন বের করে নিলেন। কিন্তু নিশাকে গুলি করতে গিয়েও থমকে গেলেন। বোধহয় মনে পড়ে গেল নিশার দাম কোটি টাকারও বেশি। তাই ওকে নির্মম ধাক্কায় ছুড়ে ফেলে দিলেন।

পরের ঘটনাগুলো সিনেমার পরদায় স্লো-মোশনে দেখা ছবির মতো।

পাঞ্জি ছটফট করতে-করতে উঠে দাঁড়িয়ে টগবগ করে লাফাচ্ছিল আর ভাঙা গলায় চিৎকার করছিল। একইসঙ্গে গায়ে চাপড় মেরে আগুন নেভাতে চেষ্টা করছিল।

নাগিনাসাহেব পিস্তলটা ঘুরিয়ে তাক করলেন আমার দিকে। এবং খুব কাছ থেকে ট্রিগার টিপলেন।

গুলির শব্দ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ধাক্কা টের পেলাম। বুকের বাঁ-দিকে কাঁধ ঘেঁষে বোধহয় গুলিটা লেগেছে।

আমার শরীরটা পাক খেয়ে পড়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু কোনওরকমে টাল সামলে নিলাম। কয়েক পলকের জন্যে চোখে ঝাপসা দেখলাম।

পাঞ্জির জামায় আগুন লাগানোর পরই লাইটার ফেলে দিয়ে মেঝে থেকে বিচিত্র

অস্ত্রটা তুলে নিয়েছিলাম। নাগিনাসাহেব হয়তো সেটা খেয়াল করেননি। কিন্তু এখন করলেন।

অস্ত্রটা দেখে ওঁর চোখ পোলট্রির ডিমের মতো বড় হয়ে গেল। মুখটা হাঁ হয়ে গেল খাদানের মতো। বেদের বাচ্চা পলকে কেঁচোর বাচ্চা হয়ে গেল।

চন্দ্রবোড়া সাপের মাথার দিকের টুকরোটা আমি ছুরির মতো মুঠো করে ধরে আছি। সাপের শরীর দিয়ে তৈরি 'ছুরির হাতলের' নীচ দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছে। আর 'ছুরির ফলা' সাপের মাথাটা এদিক-ওদিক নড়বার চেষ্টা করছে, মুখটা বারবার হাঁ করে বাতাসে কামড় বসাচ্ছে।

আমি দু-পা ফেলে আমাদের মাঝের দূরত্বটা কমিয়ে নিলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় বাঁ হাতটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল, তবুও সেই বাঁহাতেই নাগিনাসাহেবের জামা খামচে ধরলাম। এবং আমার ডানহাতে ধরা চন্দ্রবোড়া সাপের মাথাটা চকিতে চেপে ধরলাম ওঁর গলায়।

চন্দ্রবোড়া তার কাজ করল। 'ছুরির' নোংরা বিষদাঁত গেঁথে গেল নোংরা লোকটার গলায়। নাগিনাসাহেব কেমন পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলেন। কিন্তু সে কয়েকটা মুহূর্ত—তারপরই খসে পড়লেন মেঝেতে। চন্দ্রবোড়ার টুকরোটা তখনও নাগিনার গলায় দাঁত বসিয়ে ঝুলছে।

আগুন ক্রমশ বাড়ছিল। ধোঁয়ায় গোটা ঘরটা আবছা হয়ে যাচ্ছিল। নিশা কেশে উঠল দু-তিনবার। আমারও কাশি পেল, দম আটকে যাচ্ছিল। শরীরটা দিশেহারা হয়ে টলে পড়তে চাইছিল।

নিশা কেঁদে উঠে আমাকে আঁকড়ে ধরল। ওর শাড়িতে গালে আমার রক্ত লেগে গেল। আমি আচমকা কাত হয়ে পড়ে গেলাম। নিশা আমাকে সামলাতে গিয়ে পারল না—ও নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

নাগিনাসাহেবের হাতের পিস্তলটা খসে পড়ে গিয়েছিল। আমি সেটা তুলে মুঠোয় চেপে ধরলাম। বিড়বিড় করে বলতে চাইলাম, হয় টপকাও, নইলে টপকে যাও।

ঠান্ডা মাথায় প্রথম গুলি করলাম পাঞ্জিকে। ও তখন আগুন নেভাতে পাগলের মতো গ্লাস থেকে, বোতল থেকে, থার্মস থেকে জল গায়ে ঢালছিল।

গুলিটা ওর মাথায় লাগল।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দরজা ঠেলে পরপর দুজন চ্যালা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল। ঢুকেই হালচাল দেখে থমকে গেল। আমি ওদের জীবনরেখা মুছে দিলাম।

তখনই খেয়াল করলাম, নিশা আমাকে আঁকড়ে ধরে ভীষণ কাঁদছে। এমন কী আমার নাম ধরেও ডাকছে। হায় মেয়ে!

ও আমাকে টেনে-হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করার চেষ্টা করতে লাগল। নোংরা ঘরটা তখন ধোঁয়া আর আগুনে একাকার। 'ফট' শব্দ করে একটা বাল্‌ব ফেটে গেল। বোধহয় ইলেকট্রিক তারে আগুন লেগেছে।

আমি চিৎ হয়ে শুয়ে নির্লিপ্তভাবে সবকিছু দেখছিলাম।

নিশা আমার মুখের ওপরে ঝুঁত্রকে পড়ে আমাকে কান্না-ভাঙা গলায় নাম ধরে ডাকতে লাগল।

একটা মড়া কখনও আর-একটা মড়ার ডাকে জেগে ওঠে! অনেকদিন আগেই তো আমরা দুজনে মরে গেছি! এই সহজ কথাটা নিশা কেন বুঝতে পারছে না!

আমি ওকে বলতে চাইলাম, 'নিশা দ্যাখো, আর আমি পোস্টম্যান নই। পোস্টম্যানের বাজে চাকরিটা আমি ছেড়ে দিয়েছি। এবার তোমার গল্পটা আমাকে বলো। সারারাত ধরে আমি তোমার গল্প শুনব। তারপর আমার সমস্ত গল্প শোনাব তোমাকে...।'

আমার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কোনও আওয়াজ বেরোল না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও নিশার সঙ্গে আজ আমার রাত জাগতে ইচ্ছে করছিল। যতই চোখে ঘুম নেমে আসুক, আজকের রাতটা ওর সঙ্গে আমি জাগতে চাই।

মোনালিসার শেষ রাত

এক সদর স্ট্রিট

যদি আপনাকে আকস্মিকভাবে কেতাবি ঢঙে প্রশ্ন করা হয়, 'আর্ত চিৎকার ক' প্রকার ও কী-কী?' আপনি হয়তো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকে একটু হেসে জবাব দেবেন, 'মোটামুটিভাবে দুরকম। ভয়ার্ত চিৎকার ও কামার্ত চিৎকার।' মোটে দুরকম কেন? কারণ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত কিংবা শীতার্ত ব্যক্তি কখনও চিৎকার করে না।

সুতরাং এইমাত্র যে-চিৎকারটা আমার কানে এসেছে, সেটা হয় ভয়ার্ত কিংবা কামার্ত কোনও মহিলার। এবং আমার উনত্রিশ বছর বয়েসের বিদ্যা-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার সঙ্গে নারীচরিত্র যোগ করলে বলা যেতে পারে, এই মহিলা ভয়ার্ত। বিপদগ্রস্ত। প্রচণ্ডভাবে সাহায্যপ্রার্থিনী।

সন্ধে সাতটায় সদর স্ট্রিটের জনহীনতা 'হিন্দুস্তান ইয়ার বুক' -এ জায়গা পাওয়ার মতো। আর রাত দশটা বাজলে 'গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড্‌স'-এর ডাক পড়বে। এই মুহূর্তে সে-ডাক পড়েছে। কারণ, আমার হাতঘড়িতে এখন দশটা পাঁচ।

শরীরে বীররস উজ্জীবিত হল এবং আমি চৌরঙ্গী রোড ছেড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম সদর স্ট্রিটের অন্ধকার হাঁ-এর মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গাড়িতে আমরা মাত্র দুজন—আমি ও আমার ০.৩৮ পুলিশ স্পেশাল। যদিও আমি পুলিশ নই।

গাড়ির হেডলাইটের আলোয় অসহায় মেয়েটি ও ধস্তাধস্তিরত দুটো লোক সরাসরি প্রকাশিত হয়ে পড়ল, এবং লোক দুজন কী করবে ঠিক করে ওঠার আগেই আমি বিরাট ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে ওদের শরীর ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, নেমে পড়েছি গাড়ি থেকে—আমরা দুজনেই। তারপর ওদের মুখোমুখি হয়েছি।

মেয়েটি টাল সামলাতে না পেরে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল, এখন উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়চোপড় গোছগাছ করে নিচ্ছে। হেডলাইটের বৃত্তের বাইরে থাকায় ওকে ঠিক ভালো করে দেখে উঠতে পারলাম না। তবে সাময়িকভাবে হতচকিত হয়ে পড়া লোকদুটো চোখ কুঁচকে আমাকে দেখতে চেষ্টা করছে। একটু বেপরোয়া ভাব। দুজনের মধ্যে একজনের মুখে বসন্তের দাগ নিবিড় চাষ করেছে। সম্ভবত এর নাম বসন্ত-বাহার। আর দ্বিতীয়জনের মুখের চেহারা অ্যালসেশিয়ান ও বুলডগের মাঝামাঝি। এবং নাম হয়তো জিমি।

বসন্ত ও জিমির কাছাকাছি গিয়ে আমি শান্তস্বরে জানতে চাইলাম, 'এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোনও দরকার আছে?'

আড়চোখে লক্ষ করেছি, মেয়েটি ইতিমধ্যে আমার পেছনে, গাড়ির দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন হঠাৎই গাড়িতে উঠে চম্পট দেবে।

গাড়ির হেডলাইটের জন্যে আমার মুখে হয়তো আবছাআঁধার তৈরি হয়েছিল। কারণ, আমার গলা শুনেই বসন্ত-বাহার চমকে উঠল। জিমির দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'মাফ কিজিয়েগা, এস-আই সাব, ভুল হয়ে গেছে।'

'এস-আই' শব্দটা শুনে জিমির শরীর তড়িৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠল। চকিতে কপালে হাত ঠেকিয়ে বসন্তকে ফেলে রেখেই দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের দিকে। বসন্ত আমার হাতের ০.৩৮ পুলিশ স্পেশালের দিকে নিথর চোখে তাকিয়ে রইল।

কয়েকটা শঙ্কাশিহর মুহূর্ত পার হয়ে যায়। আমি সহজ স্বাভাবিক স্বরে বললাম, 'চলো—মাফ কিয়া।'

লক্ষ করলাম, এই প্রাক-বসন্তের হাওয়াতেও বসন্তের মুখে ঘাম ফুটে উঠেছে। ও প্রভুভক্ত কুকুরের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে ঘন-ঘন সেলাম জানাল আমাকে। তারপর মিউজিয়ামের ফুটপাথ ধরে অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে গেল।

আমি হাসলাম মনে-মনে। পুলিশের চাকরি ছেড়েছি প্রায় পাঁচমাস, কিন্তু আমার 'সুনাম' এতটুকু কমেনি। এই এলাকার লোকেরা এখনও জানে এস-আই সম্রাট সেন হাসতে-হাসতে ট্রিগারে চাপ দেয়। এবং তার আগে হিন্দি ছবির মতো কখনও ভয় দেখায় না, শাসায় না, রিভলভার উঁচিয়ে ধমক দেয় না। এই কিংবদন্তির জন্ম হয়েছে বছরদুয়েক আগে এমনই এক অন্ধকার রাতে......তখন আমি পার্ক স্ট্রিট থানার সত্যিকারের এস-আই....।

মার্কুইস স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে থানায় ফিরছিলাম। কারণ, লিন্ডসে স্ট্রিটে জিপটা হঠাৎ বিগড়ে গিয়েছিল। 'যমুনা' সিনেমা হলের কাছাকাছি আসতেই দুটো কালো ছায়া বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়াল। একজনের ডানহাতে একটা মোটা লোহার রড, দ্বিতীয়জন জামার তলায় হাতটা মুঠো করে রেখেছে—হাতে কী আছে কে জানে। আমি 'কী চাই?' জাতীয় কিছু একটা প্রশ্ন করে ওঠার আগেই লোহার রড দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠেছে, 'সালা, রাজুকে সাজা লাগিয়েছিস—!'

রাজু ওরফে গোলাম হোসেন দিন-সাতেক আগে সাজা হয়ে যাওয়া এক স্মাগলার। ওর দেওয়া ঘুষের টাকা অস্বীকার করে আমিই ওকে হাজতে এনে পুরেছি। এরকমটা নাকি এই এলাকার আগে কখনও হয়নি। গোলাম হোসেন বারবারই

বলেছিল, 'সাব, আপনি লাইনে নয়া আছেন, ভীষণ ভুল করলেন কিন্তু—।'

এখন বুঝতে পারছি রাজুর সেই কথার ইঙ্গিত।

আন্তরিক সিদ্ধান্ত নিতে যেটুকু সময় লেগেছে। তারপর আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে আমি প্রথম গুলিটা করেছি লোহার রডের ডানহাতে, এবং দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়জনের পায়ে। যন্ত্রণার চেয়ে বিস্ময় ওদের তখন বোবা করে দিয়েছে। রক্ত-ঝরা পা ও হাতের দিকে তাকিয়ে ওরা তখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যে, আমি সত্যিই গুলি চালিয়েছি—এতটুকু জানান না দিয়ে। প্রচণ্ড শব্দে আশে-পাশে দু-চারজন করে লোকের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। ওরা দুজন লুটিয়ে পড়েছে রাস্তায়। ছটফট করছে। লোহার রডটা আর একটা রামপুরিয়া পাশাপাশি পড়ে আছে পথের ওপর। নিষ্ক্রিয়, মৃত অবস্থায়। এবং সেই আমার সুনামের শুরু। তারপর থেকে ধীরে-ধীরে সবাই—নিচু মহলের সবাই—জেনে গেছে, 'এস-আই সেন বহুৎ বুরা আদমি। বদরাগী। বিনা নোটিশে গুলি চালায়।' প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমি খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। এবং একই সঙ্গে কল্পনাবিলাসী। প্রতিপক্ষ আমাকে ভয় পায় কেন জানি না। হয়তো আমার অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্য। যখন ওরা ভাবে আমি আক্রমণ করব, তখন আমি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিই। আর যখন ওরা বন্ধুত্বের কালো হাত বাড়িয়ে দেয়, আমি রগের ওপরে সপাটে বসিয়ে দিই পুলিশ স্পেশালের ভারী বাঁট। ওরা যেমন অবাক হয়, তেমন আমিও হই। কী করা উচিত, বা করব, এসব চিন্তা-ভাবনা না করে কাজ করে ফেলি আমি। সেইজন্যেই অনেকের কাছে আমি বোকা। যেমন এই মুহূর্তে বোকার মতো একটি অজানা-অচেনা যুবতীর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

সুতরাং, এই বদ অভ্যেসের জন্যে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকবারই আমাকে বড়সাহেবের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত স্বস্তির জন্যে পুলিশের চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে। তখনই আমি এ-বি-সি প্রোটেকশান নামের সিকিওরিটি কোম্পানিতে যোগ দিই।

এ-বি-সি প্রোটেকশান বিদেশি ঠাট-ঠমকে তৈরি, বেশিরভাগ কর্মচারীই বাঙালি। কোম্পানির কাজ বড়লোক মক্কেলদের দামি জিনিসপত্র নিরাপদে আগলে রাখা—প্রধানত। এ ছাড়া, সাধারণ দোকানপাটও আমরা পাহারা দিয়ে থাকি। পার্ক স্ট্রিট ও ক্যামাক স্ট্রিট মিলিয়ে প্রায় বাইশটা দোকান আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে। আর প্রয়োজন হলে মানুষজনকেও বিপদে-আপদে রক্ষা করে থাকি— তবে অবশ্যই উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে—আইনসম্মত ব্যবস্থা নিয়ে।

এই পাঁচমাস এ-বি-সি-তে থেকে—আমরা সংক্ষেপে কোম্পানিকে ওই নামে ডাকি—আমার অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার বদ অভ্যেস প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে

গেছে। এমনকী পারিশ্রমিকের প্রলোভন না থাকলেও। যেমন এখন।

দুঃসাহসে এগিয়ে আসা নৃশংস দুটো শয়তানকে চোখের পলকে সাধু বনে গিয়ে দু-পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে পালাতে দেখে সাদার ওপরে সবুজ বুটির কাজ করা শিফন শাড়ি পরিহিতা বিপদগ্রস্তা তরুণী যার-পর-নাই বিস্মিত ও আশঙ্কিত। বিস্ময়ের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু আশঙ্কার কারণ, আমি এখন ওর দিকে তাকিয়ে সরল আন্তরিকভাবে হাসছি। হেডলাইটের আলো আমার চোয়াড়ে গাল, পুরু গোঁফ ও আপাতদৃষ্টিতে অপাপবিদ্ধ চোখ-মুখ ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু নায়িকা এখনও আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে। রহস্যময়ী।

ওর দিকে কয়েক পা এগোতেই আমার খেয়াল হল, বাঁ-হাতের মুঠোয় ধরে থাকা বিশ্রী রিভলবারটার কথা। চকিতে ওটাকে শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর ছোট্ট করে বললাম, 'আপনার লাগেনি তো?'

'আপনি কি পুলিশের লোক?'

পালটা সন্দিহান প্রশ্ন ছুটে এল আমার দিকে। তবে মানতেই হয়, মেয়েটির কণ্ঠস্বর এখন অনেক বেশি মোলায়েম। ছন্দময়।

উত্তর দেওয়ার আগে চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখি, সামান্য দূর থেকে দুজন রিকশাওয়ালা ও জনৈক ফুটপাথবাসী রীতিমতো কৌতূহলী চোখে আমাদের দেখছে। সুতরাং, যেহেতু মেয়েটির কাছ থেকে দ্বিতীয় কোনও আর্ত চিৎকার আমি শুনতে চাই না, জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, পুলিশের লোক। এস-আই—পার্ক স্ট্রিট থানা!' মুখে 'অশ্বত্থামা হত' টুকু বলে মনে-মনে উচ্চারণ করলাম, 'পাঁচমাস আগে ছিলাম।'

গাড়ির দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আসুন, উঠে বসুন গাড়িতে—।' সামনের দরজাটা খোলাই ছিল, ইশারায় ওকে নির্দেশ করলাম।

ও একবার তাকাল আমার মুখে। সন্দেহের ছায়াটা কেটে এসেছে কি না ঠিক বুঝতে পারলাম না। তারপর 'যা-হয়-হবে' গোছের একটা মুখভাব করে উঠে বসল গাড়িতে। আমি নিজের আসনে স্টিয়ারিং ধরে বসলাম। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম চৌরঙ্গী রোডের দিকে।

মেয়েটি কোনও স্থাপত্য-শিল্পের মতো গাড়ির সিটে স্থিতু হয়ে বসলেও ওর চোখ কাঠবেড়ালির মতো এদিক-ওদিক ঘুরছে। রোশনাই আঁধার রাস্তায় কাউকে খুঁজতে চাইছে। কিন্তু কেন? গাড়ি চলতে শুরু করতেই আমি প্রশ্নটা করলাম, 'কাউকে খুঁজছেন?'

ও ভীষণভাবে চমকে উঠল। ঠোঁট চিরে অর্ধস্ফুট একটা শব্দও বেরিয়ে এল। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'উঁহ, না তো!'

ওর কথা শেষ হতে-না-হতে একটা মোটামুটি অবাক কাণ্ড ঘটল। সদর স্ট্রিটের

অন্ধকার পেট চিরে তীব্র গতিতে একটা গাড়ি ছুটে এল। হেডলাইট নতুন ব্যাটারিতে দাউদাউ করে জ্বলছে। হাওয়ায় সোঁ-সোঁ শব্দ তুলে আমার ছাইরঙা মরিস মাইনরকে পাশ কাটিয়ে পলকে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। মেয়েটি মুহূর্তে যেন সিঁটিয়ে গেল। অভিব্যক্তিতে এখন স্বস্তি ও ভয় যমজ ভাইয়ের মতো গলাগলি করে রয়েছে। স্বস্তির কারণ, হয়তো এই সেই হারানিধি—যাকে ওর চোখ লুকিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং ভয়, হারানিধিকে আমি দেখে ফেলেছি বলে। আমি কিন্তু ওকে কোনও প্রশ্ন করলাম না।

যে-গাড়িটা আমাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল, ওই অল্প সময়েই আমি তার কতকগুলো তথ্য মনে-মনে টুকে নিয়েছি। এক, গাড়িটা সবুজ বা নীল, ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। দুই, অ্যাম্বাসাডার। তিন, চালাচ্ছেন জনৈক পুরুষ। চার, গাড়িটা চৌরঙ্গীতে পড়ে উত্তরমুখী হল। পাঁচ, লালরঙা টেল-লাইটের একটা ভাঙা। এবং শেষ তথ্য, গাড়ির নম্বরটা আমি দেখে উঠতে পারিনি।

প্রতিবর্তীক্রিয়ার বশবর্তী হয়ে আমি ব্রেক কষে মিউজিয়ামের গা ঘেঁষে আমার মরিস দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, এখন আবার চালু করলাম। হালকা গলায় প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম বাতাসে, 'কোনদিকে যাব? ডানদিক, না বাঁ-দিক?

ছোট্ট করে উত্তর এল, 'বাঁ-দিক। আমার বাড়ি মিডলটন রো-তে।'

উত্তর শুনে এটুকু বোঝা যায়, আমি অনামিকার আস্থা অর্জন করেছি। কারণ, ও ধরেই নিয়েছে আমি ওকে বাড়ি পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেব। সত্যিই তাই দেব। ও না বললেও দিতাম।

বড়রাস্তায় কিছুক্ষণ গাড়ি চালাতেই সার বেঁধে পিছলে যাওয়া বিক্ষিপ্ত আলোয় ওকে দেখতে চেষ্টা করলাম। মুখের আদলটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লম্বাটে মুখ। নাকটা টিকোলো, তার ডগায় ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমেছে। গায়ের রং ফরসা এবং শাড়িটা এককথায় অসামান্য মানিয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাস যে স্বাভাবিকের চেয়ে এখনও সামান্য দ্রুততর, তা শাড়ি-ব্লাউজের অলস কাঁপুনি দেখে আঁচ করা যায়।

পার্ক স্ট্রিটে বাঁক নিতেই আলোর পরিমাণ ও সংখ্যা, দুই-ই বেড়ে গেল। অনামিকা আরও প্রকাশিত হল আমার চোখে। এবার বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন করলাম, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'মোনালিসা! মোনালিসা চৌধুরী।'

দা ভিঞ্চির মানসকন্যার চোখ জানলা দিয়ে অপস্রিয়মাণ পার্ক হোটেলের দিকে নিবদ্ধ। আমার আশা নিহত হল। ও মুখ ফিরিয়ে তাকাল না আমার দিকে। কিন্তু কণ্ঠস্বর উদাহরণবিহীন। সেতার অথবা তানপুরায় এই সুরেলা সঙ্গীত ধরা পড়ে না।

'অত রাতে সদর স্ট্রিট ধরে আসছিলেন?'

অন্য সময় অন্য কাউকে এ-জাতীয় প্রশ্ন করলে 'নিজের চরকায় তেল দিন' জাতীয় উত্তর শোনার জন্য কানকে আগে থাকতেই তৈরি করে রাখতাম, কিন্তু এখন স্থান-কাল-পাত্রী আলাদা। আর আমার পরিচয় এস-আই। সুতরাং উত্তর পেলাম।

মোনালিসা একটু ইতস্তত করে নিচু গলায় বলল, 'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ভালো লাগছিল না, তাই শেষ হওয়ার আগেই উঠে এসেছি।'

মিষ্টি স্বরে আমার নেশা ধরে যায়। কাণ্ডজ্ঞানহীনতা জাঁকিয়ে বসে আমার অভ্যন্তরে। তার ওপর রাতের দুরন্ত হাওয়ায় কারও এলোমেলো চুল, সুরভির সুবাস আমাকে উদভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু বলতে ইচ্ছে করে, 'চাঁদ-তারা, তোমরা সাক্ষী থাকো। দ্যাখো, কী দুর্লভ রাত উপহার পেয়েছে সম্রাট সেন।' আর একইসঙ্গে অবাধ্য কল্পনা নির্লজ্জভাবে তার দৌড় শুরু করে দিয়েছে আমার মনে। হাজার চেষ্টাতেও তার রথের কেশর-ফোলানো ঘোড়াগুলোকে আমি রুখতে পারছি না।

যদি এমন হত, মোনালিসা আমার অনেক চেনা, ওকে নিয়ে আমি নৈশ কলকাতা ভ্রমণে বেরিয়েছি, ও আমাকে...।

'ডানদিকে।' হালকা অথচ সংক্ষিপ্ত কথাটা আমাকে বাস্তবে নিয়ে এল। যেন হঠাৎই আছড়ে পড়েছি বরফ-জলে। অতএব সম্রাট সেন সচেতন হল। এবং গাড়ি ঘোরালাম নির্দেশমতো।

মিডলটন রো-তে এসে আলো সংক্ষিপ্ত ও আঁধার ঘন হল।

মোনালিসা চুপচাপ। অথচ আমার কত কিছুই না বলতে ইচ্ছে করছে! হয়তো মেয়েদের প্রতি আমার এই সর্বজনীন মনোভাব জানাজানি হওয়ার ফলেই অফিসের বন্ধুরা বলে, 'মেয়ে দেখলেই সম্রাট হারেম তৈরির স্বপ্ন দেখে।' ওদের দোষ নেই। আমাকে ওরা বোঝে না।

মোনালিসার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ আবার শোনা যেতেই রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আমি।

ও নামল। আমিও। এতক্ষণে ও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ওকে এখন অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নিখুঁত ভুরু, টানা চোখ, দু-চোখের মাঝে কালো টিপ যেন সৌন্দর্য-সৃষ্টির গোপন রহস্যের শেষ চাবিকাঠি। আমার নিষ্পাপ মুগ্ধ চাউনিতে বিব্রত বোধ করল মোনালিসা। চোখ সরিয়ে রাস্তার দু-পাশে দেখল। বলল, 'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর।' তারপর মাথা তুলে সামনের বাড়িটার চারতলার একটা ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল, 'গুড নাইট।'

আমি হঠাৎই যেন চমকে উঠলাম। ও চলে যাচ্ছে। সরে দাঁড়াচ্ছে আমার নিঃসঙ্গ জীবন থেকে। যেমন অতর্কিতে এসেছে, তেমনি অতর্কিতে বিদায় নিচ্ছে। সুতরাং খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইলাম লজ্জাহীনভাবে। বললাম, 'যদি আপনার আপত্তি

না থাকে, তাহলে আপনাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাই।'

ও ইতস্তত করছে। আরও বললাম, 'নইলে স্বস্তি পাব না।'

ছোট্ট করে হাসল। একরাশ মণি-মুক্তো ঝরে পড়ল অবহেলায়। ছড়িয়ে গেল ছত্রখান হয়ে। আর আমি লোভী জহুরির মতো সেগুলো একে-একে কুড়িয়ে নিতে লাগলাম। সঞ্চয় করে নিলাম নিটোল অনুপম আকাঙ্ক্ষায়।

মোনালিসা বলল, 'বেশ, চলুন।'

বাড়িটা বাইরে থেকে সেকেলে মনে হয়। কারণ, সত্যিই সেকেলে। বিশাল কাঠের দরজা। চওড়া ধাপের সিঁড়ি। সিঁড়ির একপাশে আট-দশটা ডাকবাক্স। আলোর পরিমাণ মোটামুটি। আমার সামনে হাইহিলের খটখট সতর্কবাণী, এবং তার পেছনেই সন্ত্রস্ত ভিতু পায়ে আমি অনুসারী। তখনই প্রমাণ পেলাম, বাড়ির ভেতরটা বিবর্তনের নিয়মে যথেষ্ট আধুনিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

একতলা, দোতলা করে একে-একে সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে আমরা এসে থেমেছি চারতলায়। একটাই ফ্ল্যাট এবং তার হালকা নীল দরজা বন্ধ। দরজার পাশেই চারটে ছোট-ছোট টবে শুকনো গাছ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মোনালিসা দরজার কাছে থমকাল। এখানে আলো অনেক বেশি উজ্জ্বল। ফলে দা ভিন্সির মানসকন্যাও। ওকে ভীষণ ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। আর তখনই ও হাসল। বলল, 'এবার নিশ্চিন্ত আর খুশি তো?'

হাসলাম আমিও। কারণ, সংক্রামক ব্যাধি আমার খুব প্রিয়। বললাম, 'খুশি। তবে রাত-বিরেতে ওভাবে একা বেরোবেন না। কারণ, রোজ তো আর পার্ক স্ট্রিট থানার এস-আই, এই সম্রাট সেন হাজির থাকতে পারবে না!'

ছোট্ট কালো একটা ব্যাগ, যেটা এতক্ষণ নজরে পড়েনি, খুলে একটা চাবি বের করল ও। মুখ তুলে তাকাল, 'আগে থেকে খবর দিলে হাজির থাকতে পারবেন নিশ্চয়ই?'

অপ্রত্যাশিত। অথচ আকাঙ্ক্ষিত। বললাম, 'বাই অল মিনস।'

লক্ষ করলাম, সদর স্ট্রিটের ঘটনায় কোনও যুবতী মেয়ের যতটা বিচলিত হওয়া উচিত, ততটা বিচলিত ও হয়নি। কারণ জানি না। নিশ্চল দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওকে। যেন কোনও রুপোলি পরদায় ছবি দেখছি।

ও চাবি ঘুরিয়ে লক খুলল। তারপর দরজার নব ঘুরিয়ে চাপ দিল। এবং আশ্চর্য ঘটনাটা লক্ষ করলাম তখনই।

দরজা খুলল না।

এই ঘটনায় আমার অবাক হওয়ার কথা নয়। মাথায় সিঁদুরের রেখা না থাকা মানেই এই নয় যে, মোনালিসা চৌধুরী কুমারী, অবিবাহিতা, স্বজনবিহীন এবং একা।

আমি আসলে অবাক হয়েছি মোনালিসার অভিব্যক্তি দেখে। ও স্পষ্টই আশা করেছিল দরজা খুলবে এবং সেটা না খোলায় বেশ অবাক হয়েছে।

আমি সাহায্যের ভঙ্গিতে সামনে এক পা এগোতেই দরজায় পিঠ দিয়ে বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মোনালিসা। যেন আমি ওর কোনও গোপন রহস্য আবিষ্কার করে ফেলব।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। তখনই ও ভাবলেশহীন মুখে বলল, 'গুড নাইট, ইনস্পেক্টর।'

স্পষ্ট বিদায়ের ইঙ্গিত। অথচ রহস্যভেদের দুরন্ত ইচ্ছে আমার মনে ছটফট করছে। তবু হাসলাম—জোর করে। বিদায় জানিয়ে নামতে শুরু করলাম সিঁড়ি বেয়ে। তিনতলায় সিঁড়িতে বাঁক নিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। আলো-আঁধারিতে আত্মগোপন করে কান পাতলাম।

শুনতে পেলাম, দরজায় নক করার শব্দ। মোনালিসা।

একটু পরে দরজা খোলার শব্দ। ঘরে কেউ ছিল।

'কী ব্যাপার, বাবি, তুমি?' মোনালিসা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

উত্তরে একটা গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'নিশ্চয়ই কারণ আছে, তাই।'

এই স্বরে কঠোর আদেশ এবং তা পালিত-দেখতে-বরাবর-অভ্যস্ত সুর রাজত্ব করছে। কে এই আদেশকারী?

একটু পরে ভারী দরজা সশব্দে বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। খুব সাবধানে। দরজার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে আড়ি পাতলাম। অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি ঘরের কথাবার্তা। প্রথমে শুনলাম লোকটির কণ্ঠস্বর, 'সদর স্ট্রিটে কী ঝামেলা হয়েছিল?'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মোনালিসার অস্ফুট উত্তর 'দুটো বাজে লোকের খপ্পরে পড়েছিলাম—।'

'ও। সেইজন্যেই আমি ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম আবার'। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর 'যে তোমায় বাঁচাল, সেই দেবদূতের পরিচয়টা জানতে পারি?' ব্যঙ্গের তীব্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তীক্ষ্ণ হল ভারী কণ্ঠস্বর।

'বাবি, তোমার এসব ইয়ারকি আমার ভালো লাগে না—।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মোনালিসা, কিন্তু তার আগেই অঘটনটা ঘটল। হঠাৎই শুনতে পেলাম সিঁড়ি বেয়ে একটা চঞ্চল পায়ের শব্দ উঠে আসছে চারতলায়। চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই আমার হাত লেগে গেল ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজায়। শব্দ হল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এবং ঘরের ভেতর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল তক্ষুনি।

আমি সটান ছুট লাগালাম সিঁড়ির দিকে। ঝড়ের বেগে নামতে শুরু করলাম। কারণ, পরের দরজায় আড়িপাতার অপরাধে আমি ধরা পড়তে চাই না।

কিন্তু তিনতলার সিঁড়ির দিকে বাঁক নিতেই ধাক্কা লাগল আগন্তুকের সঙ্গে। লোকটার চেহারা ছিপছিপে। চোখে ছিল হাই পাওয়ারের চশমা। ছিল, কারণ এখন সেটা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে সিঁড়ির ধাপে। আর লোকটা দেওয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। একটা অর্ধস্ফুট গোঙানি ছাড়া আর কোনও শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসেনি। তার দেওয়াল হাতড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝলাম, চশমা তার অন্ধের যষ্ঠি।

আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম ওই একটা মুহূর্ত। তারপরেই অসমাপ্ত ঊর্ধ্বশ্বাস-দৌড় আবার শুরু করেছি।

দোতলায় পৌঁছে শুনলাম, ক্ষীণজীবী লোকটার চিৎকার, 'চোর! চোর!'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাসি পেল আমার। একটু আগের দেবদূত এখন চোর। আর দেরি না করে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম। উঁকি মেরে একবার দেখলাম চারতলার জানলার দিকে। ঘরে আলো এখনও জ্বলছে।

গাড়ি ঘুরিয়ে পার্ক স্ট্রিটে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে মনে হল, একটা সবুজ অ্যাম্বাসাডারকে মোনালিসার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু তখন আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই। এখন আমাকে রাতের চক্কর শুরু করতে হবে। অল বার্গলারি অ্যান্ড ক্রাইম প্রোটেকশান—অর্থাৎ, এ-বি-সি আমাকে মাইনে দেয় এই কাজের জন্যেই। মোনালিসা চৌধুরীকে আমার উত্তাল প্রেমিকা কল্পনা করে স্বপ্নবিলাসে সময় কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়।

নির্জন রাস্তায় ছুটে চলার সময় কয়েকটা স্বাভাবিক এবং নিরীহ প্রশ্ন বিঁধে চলল আমার মনে। কে এই বাবি নামের লোকটি? বন্ধ ফ্ল্যাটে সে এসে ঢুকল কেমন করে? তার কাছে কি ডুপ্লিকেট চাবি ছিল? সদর স্ট্রিটে সবুজ অথবা নীল অ্যাম্বাসাডারটা চালাচ্ছিল কে? বাবি? তার সঙ্গে মোনালিসার সম্পর্ক কী? আর সবশেষে, চারতলায় উঠে-আসা যে-লোকটির সঙ্গে আমি ধাক্কা খেলাম সে কে? বাড়িটার চারতলায় একটিই মাত্র ফ্ল্যাট। মোনালিসা চৌধুরীর। তাহলে ওই রোগা লোকটিও কি মোনালিসার ফ্ল্যাটেই যাচ্ছিল?

জানি, কোনও সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষের মাথায় এরকম উদ্ভট প্রশ্নের মিছিল জন্ম নেয় না। কিন্তু আমার মস্তিষ্ক সুস্থ নয়। কারণ, আমি প্রাক্তন পুলিশের লোক, আমি এ-বি-সি প্রোটেকশানের নাইট ওয়াচম্যান এবং আমি মোনালিসাকে বোধহয় ভালোবেসে ফেলেছি। যদিও ওর মতো সুন্দরীকে মুহূর্তে ভালোবেসে ফেলাটা অস্বাভাবিক নয়। আর সবশেষে, মনে পড়ছে জুনির কথা। ও বলত, 'সম্রাট, মেয়ে

দেখলেই কি তোমার ভালোবাসতে ইচ্ছে করে? তাহলে আমাকে শুধু-শুধু—।'

ওকে আমি বলতে পারিনি, চিরটাকাল আমি একতরফাই ভালোবেসে গেছি। কেউ আমাকে প্রতিদান দেয়নি। সেই প্রতি-ভালোবাসা আমি চাইও না। আমার ভালোবাসা স্বার্থপর নয়। হয়তো সেই কারণেই আমি অসুস্থ মস্তিষ্ক। সেই কারণেই, ও যখন আমাকে ছেড়ে চলে যায়, আমি বুক ভাসিয়ে কেঁদেছি। বলতে চেয়েছি, অশ্রু, তুমি মহান।

দুই মিশন রো

এ-বি-সি প্রোটেকশান।

'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর'-এর ঐতিহ্যে কোম্পানির সাইনবোর্ডের সিকিভাগ জুড়ে মন্তব্য লেখা রয়েছে, 'প্রোটেকশান ইজ বেটার দ্যান শিওর।' এই শ্লেষধর্মী ক্যাপশানের আবিষ্কর্তা আমাদের কোম্পানির খোদ মালিক কর্নেল বটব্যাল। আমাদের কাছে সংক্ষেপে 'সিবি'। এই আদরের ডাকের উত্তরে উনি প্রায়ই ঠাট্টা করে বলেন, 'সেন, যদি আমার নাম বীরেন চক্রবর্তী হত, তা হলে তোমাদের সংক্ষিপ্ত নাম আমি অ্যাকসেপ্ট করতাম না। ইউ নো দ্য রিজন।'

উত্তরে হাসাহাসি। সিবি কথায়-কথায় খুব হাসেন। বোঝা যায়, ওঁর জীবনে দুঃখের স্মৃতির আকাল চলছে।

কাচের দরজা খুলে প্রথম মুখোমুখি হলাম সেই হাসিখুশি মানুষটার। আমাকে দেখেই জানতে চাইলেন, 'ও-কে?'

আমি সহজ হালকা গলায় জবাব দিলাম, 'এভরিথিং ও-কে।'

এই প্রশ্ন সিবির একেবারে নিয়মমাফিক হয়ে গেছে। কোম্পানির যারাই রাতের দলে থাকে, তারা সকালে অফিস আসামাত্রই সিবির এই আন্তরিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। সিবি পায়চারি করতে-করতে রিসেপশানিস্ট নমিতা বাসুকে ডিক্টেশান দিচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপচারি শেষ হতেই অসমাপ্ত কাজে মনোযোগ দিলেন। লক্ষ করলাম, নমিতা একটা নতুন শাড়ি পরে এসেছে—হয়তো এবারে পুজোয় কেনা।

আমাদের অফিসটা রাস্তার ওপর, একতলায়। সামনের ঘরটা বিশাল। তবে শুধুই প্রস্থে, গভীরতায় নয়। এই ঘরেই বসি দশজন চারজন অপারেশান্‌স ডিপার্টমেন্টের। ছ'জন ইনভেস্টিগেশান্‌স। একজন অপারেশান ম্যানেজার ও বাকি দুজন স্টেনো টাইপিস্ট। রিসেপশানের নমিতা বাসুকে আমি হিসেবের বাইরে রেখেছি। ওর

কর্মদক্ষতা অমানুষিক পর্যায়ে পড়ে, তাই।

ডানদিকের দরজা দিয়ে সামনের ঘর ডিঙিয়ে গেলেই মাঝারি মাপের তিনটে ঘর। একটা রেকর্ড্‌স অ্যান্ড রেফারেন্স সেকশান। দ্বিতীয়টা আর্মস সেকশান। তৃতীয়টা ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অর্থাৎ, সিবির ঘর। কোম্পানির যাবতীয় হিসেবপত্রের কাজ হয় আর-আর সেকশানেই। তা ছাড়া, আর্মস সেকশানের দায়-দায়িত্ব যখন তখন নিজের কাঁধে তুলে নেন সিবি স্বয়ং। তাঁর মতে, অস্ত্রশস্ত্র ছেলেখেলার জিনিস নয়। কথাটা সত্যি।

আর্মস সেকশানে সরাসরি গেলাম রিভলভারটা জমা দিতে। সেকশান প্রহরী রামকৃপাল খাতাপত্র খুলে বসেছিল, আমাকে দেখেই হাত কপালে তুলল। আমি সবিনয়ে অভিবাদন গ্রহণ করে ০.৩৮ স্পেশালটা ওর হাতে দিলাম। ও চেম্বার খুলে প্রথমে পরীক্ষা করল সব ক'টা গুলিই ঠিকঠাক আছে কি না। তারপর জিগ্যেস করল, 'সেনসাব, কাল তা হলে কোনও ঝুটঝামেলা হয়নি?'

'না।' বলে কিছুক্ষণ থামলাম। মনে পড়ল মোনালিসার কথা। অতএব যোগ করলাম, 'তেমন কিছু নয়।'

তারপর ফিরে এলাম বাইরের ঘরে। নিজের সিটে। লক্ষ করলাম, রামকৃপাল খাতায় মন্তব্য লিখে রাখছে রিভলভারটা সম্পর্কে। নিশ্চয়ই লিখছে, রিটার্নড্‌ আনইউজ্‌ড। আর্মসের ব্যাপারে সিবির কড়াকড়ি ভীষণ সাংঘাতিক। রোজ রাতে খাতায় সই করে প্রত্যেককে আর্মস ইস্যু করতে হয়। আর রিভলভার ব্যবহার করলে তার জবাবদিহি করতে হয় বিশদ রিপোর্ট খাতায় জুড়ে দিয়ে।

ঘড়িতে এখন সাড়ে দশটা। অর্থাৎ, অফিস খোলার পর আধঘণ্টা কেটে গেছে। কিন্তু এখনও সবাই এসে পৌঁছয়নি। একমাত্র আমার পাশের চেয়ারে ঝিম মেরে বসে আছেন ষাট-পেরোনো যুবক সত্যনাথ চক্রবর্তী। কলকাতা পুলিশ থেকে অবসর নেওয়ার পর এ-বি-সি-তে যোগদান করেছেন। বর্তমানে এ-বি-সি-র ইনভেস্টিগেশানের লোক। খুন-চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির কেস ঘেঁটে-ঘেঁটে বিশারদ হয়ে পড়েছেন। মোটা। রং কালো কুচকুচে। মাথায় অর্ধেক টাক, বাকি অর্ধেক তেলচিটে চুল। ঠোঁট পানের রসে করমচা। আমাকে দেখে বললেন, 'ভায়া, সকাল সকাল তোমার একটা ফোন এসেছিল।' তারপর চোখ ঠেরে 'হয়তো জুনিদেবী হতে পারেন—।'

অবাক হলাম। কে ফোন করবে আমাকে? জুনির ফোন করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আর জুনির সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা অফিসে কেউ জানে না। কাউকে বলি না। বলতে ভীষণ কষ্ট হয়। তবে কি.....তবে কি মোনালিসা চৌধুরী? ও এই ফোন নম্বর জানবে কোত্থেকে? ও জানে, আমি পার্ক স্ট্রিট থানার এস-আই। কিন্তু...।

সামনে এসে দাঁড়াল নমিতা বাসু। সিবির ডিক্টেশান শেষ হয়েছে। তিনি আবার নিজের ঘরে ফিরে গেছেন। সিবি সাধারণত স্টেনোদের নিজের ঘরেই ডেকে পাঠান, তবে নমিতার কথা আলাদা। সিবি কখনও রিসেপশানিস্টদের আসন ছাড়ার পক্ষপাতী নন। তাই নিজেই উঠে আসেন।

আবহাওয়া যে সুরভিত তার প্রমাণ নাসারন্ধ্র পেয়েছে এবং নীরব অভিনন্দন জানিয়েছে নমিতাকে। বাইরের প্রাকৃতিক ও ঘরের কৃত্রিম আলোয় ওর গাঢ় নীল শাড়ি চকচক করছে। চোখ ছোট কিন্তু গভীর। অনেক বড় সাঁতারু অনায়াসে মগ্ন হতে পারে। হতে পারে শ্বাসরুদ্ধ, নিরুপায়। ভুরুর ওপর কাটা দাগ হয়তো কামদেবের তিরের আঘাতে জন্ম নেওয়া অভিজ্ঞান। নমিতাকে দেখলে আমি ইন্দ্রিয়াধীন হয়ে পড়ি। ও নিজেও সেটা জানে। বলে, 'আপনার নজর দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে নিয়ে ইলোপ করবেন।'

আমি ততক্ষণে শুধু ইলোপ নয়, অনেক কিছুর বিলোপ পর্যন্ত ভেবে ফেলেছি। ওকে দেখলে দ্রুত ও উদ্দাম জীবন বড় বেশি স্বাভাবিক মনে হয়। আর ভীষণভাবে মনে পড়ে যায় জুনির কথা।

'মিস্টার সেন, সকালে আপনার একটা ফোন এসেছিল।' নমিতা বলল।

'আগেই বলেছি, মা।' সত্যনাথ বিশাল হাঁ করে হাই তুলে বললেন। ওঁর আলজিভ আছে প্রমাণ পেলাম।

'না, মিসেস সেন নন। ওঁর গলা আমি চিনি।'

সত্যদা চমকে উঠলেন। চোখ যথাসম্ভব বড় করলেন। আমি সজাগ হলাম।

নমিতা আরও যোগ করল, 'ভদ্রমহিলা কিন্তু নাম বলেননি। বলেছেন, পরে ফোন করবেন।' নমিতা বিদায় নিল। এগিয়ে গেল নিজের আসনের দিকে।

ঘড়িতে প্রায় এগারোটা। এ-বি-সি-র নতুন এক কর্মব্যস্ত দিন শুরু হয়ে গেল। কারণ, একে-একে বাকিরা অফিসে এসে ঢুকছে। অবিনাশ দত্ত, বিলাস পাকড়াশি, মনমোহন বোস, অমিত দত্ত এবং নৃপতি বোস। টাইপিস্ট দুজন দক্ষিণ ভারতীয়। সকলে প্রকৃত কর্মযোগী।

বেশ চিন্তিতভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলাম। ভাবতে লাগলাম স্বপ্নে দেখা মেয়েটির কথা...ওর চোখ-নাক-ঠোঁট....সত্যিকারের শিল্পীরা এর কদর বুঝবে দা ভিঞ্চি বুঝেছিলেন। মোনালিসার প্রতিটি দুঃখ, প্রতিটি কষ্ট, আমি কল্পনা করতে শুরু করলাম। ভাবতে চাইলাম, আমার যন্ত্রণাগুলো ওর পরিপূরক হবে। ও আমার কল্প-মানসী। এমনসময় হরিচরণ, অফিসের বেয়ারা, এসে আমাকে পৃথিবীতে নামাল। ফাসফেঁসে গলায় বলল, 'সিবিসাহেব ডাকছেন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। রাতে কিছু ঘটুক আর না-ই ঘটুক, একটা রিপোর্ট

দাখিল করাটা অফিসের নিয়ম। সেটা নিয়ে সিবির সঙ্গে কথা বলাটাও নিয়মের মধ্যেই পড়ে। এখনও দুটোর কোনোটাই সারা হয়নি। তাই সিবির তলব।

ঘরে ঢুকতেই সিবি বসতে বললেন মুখোমুখি চেয়ারে। তারপর একটা চুরুট ধরালেন দুবারের চেষ্টায়। ধোঁয়া ছেড়ে গতানুগতিক মেজাজি স্বরে বললেন, 'টেল মি অ্যাবাউট ইওর মিশন।'

হয়তো এই কারণেই মিশন রো-তে আমাদের অফিস ভাড়া নিয়েছিলেন সিবি। যাতে সবসময় একটা সাবধানবাণী আপ্তবাক্যের মতো মনের ভেতর ক্রমাগত বেজে চলে, 'মিশন ফার্স্ট, মিশন লাস্ট'। আমি সেই বাজনা শুনে-শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সুতরাং সিবির মোটা ভুরুর নীচে সরাসরি তাকিয়ে বললাম, 'সবকিছু ওঁ শান্তি।' হাসলাম।

'তোমার এলাকায় তাই থাকা উচিত। কারণ, ওখানকার দাগীরা এস-আই সেনকে এত শিগগির ভুলতে পারে না।' সিবি চুরুটের আমেজ উপভোগ করে হাসলেন। বললেন, 'সেন, তুমি কিন্তু নিজেকে ঠিকমতো লুকোতে পারছ না। চিন্তিত দেখাচ্ছে। আর, একদম মানাচ্ছে না।'

আমি অপ্রতিভভাবে হাসলাম 'তেমন কিছু নয়। ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'সরি। ক্ষমা করো।' কপট ক্ষমা চাওয়ার সুরে সিবি বললেন, 'যাও, কাজে বোসো। হাসিখুশি থাকো। তোমাকে মনমরা দেখলে আমার ভালো লাগে না। তুমি এ-অফিসে সবার ছোট, আমার ছেলের মতো।' এক অজানা ব্যথায় সিবির চোখ চকচক করে উঠল।

আমি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই নমিতা ইশারায় ডাকল আমাকে। টেলিফোন! দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেলাম।

নমিতা ওর স্টাইলে হেসে রিসিভার তুলে দিল আমার হাতে। চাপা স্বরে বলল, 'বেস্ট অফ লাক!' তারপর সরে গেল।

'হ্যালো—।'

'সম্রাট সেন আছেন?'

মোনালিসা। মোনালিসা। মোনালিসা।

'বলছি।'

'ইনস্পেক্টর বলার প্রয়োজন আছে?' সুরেলা হলেও গলায় ব্যঙ্গের খোঁচাটুকু প্রচ্ছন্ন থাকেনি।

'সুযোগ দিলে অধম সবকিছু বুঝিয়ে বলতে পারে।' অনুনয়ের সুরে বলে উঠলাম, 'তা ছাড়া, অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চাইছি আমি। যদি....।'

'তার আর দরকার নেই। ভীষণ বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করেছিলাম পার্ক স্ট্রিট থানায়। ওঁরাই বললেন, আপনি পুলিশের চাকরি ছেড়ে এ-বি-সি প্রোটেকশানে জয়েন করেছেন। সেটা সত্যি কিনা যাচাই করতেই ফোন করেছিলাম। আচ্ছা, নমস্কার।'

'শুনুন—' ব্যস্ত সুরে বলে উঠলাম আমি 'কী বিপদে পড়ে আমাকে—।'

'তার তো আর দরকার নেই।' নির্লিপ্ত সুরে ও বলল, 'আপনি পুলিশের লোক হলে হয়তো কিছু একটা করতে পারতেন—' ক-র-র-র....ও টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

কথা বলতে-বলতে আমি হয়তো সামান্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, অলসভাবে রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় লক্ষ করলাম, অবিনাশ দত্ত, সত্যদা, বিলাস পাকড়াশি, মনমোহন বোস—প্রত্যেকেই আমাকে অবাক চোখে দেখছে। বাকিরা দেখছে না, কারণ, তারা ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যস্ত। অবিনাশ দত্ত আর বিলাস পাকড়াশি অপারেশানের লোক। মধ্য কলকাতা ও উত্তর কলকাতায় সাধারণত কাজ করে থাকে। আর মনমোহন বোস আমাদের 'ম্যানেজার-অপারেশান্স।'

আমার কান লাল হয়ে উঠল। একইসঙ্গে লু বইছে সাহারার। লজ্জা আর অপমান। সহকর্মীদের চোখ চকচক করছে কৌতূহলে। কিন্তু সত্যদাকে সামান্য বিব্রত মনে হল। উনি অস্বস্তির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। নমিতা বাসু অন্যসময় হলে হয়তো কোনও ইয়ারকি করত, আমার মুখের অবস্থা দেখেই বোধহয় চুপ করে গেল। আমি নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলাম।

ভীষণ বিপদে পড়েছে মোনালিসা। কী বিপদ? গতকাল সদর স্ট্রিটের বিপদ থেকে ঘটনাচক্রে আমি ওকে বাঁচাতে পেরেছি। তারপর ঘরের সেই রহস্যময় লোকটির সঙ্গে মোনালিসার দেখা। বাবি। বাবি কি হাজির ছিল সদর স্ট্রিটে? ওর কথা শুনে এটা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন হাজির ছিল ও? ও কি জানত, মোনালিসা আক্রান্ত হবে?

'ভায়া, কী ব্যাপার?' নিচু অপরাধী গলায় সত্যনাথ জানতে চাইলেন।

অফিসে অন্যান্যরা আড়ালে তাঁকে সত্যনাশ চক্রবর্তী বলে রসিকতা করলেও, ভদ্রলোক প্রয়োজনে সহানুভূতিশীল ও বুদ্ধিমান। সুতরাং সত্যদাকে বললাম, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। পরে আপনাকে সব বলব।'

অনেক চেষ্টা করে রিপোর্ট লেখায় মন দিলাম। স্বভাবের দোষে আমি হয়তো পরার্থে মন-প্রাণ সঁপে দেওয়ার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। ঠিক করলাম, আজ রাতে ডিউটির সময় একবার যাব মোনালিসার ফ্ল্যাটে। শুধু দূর থেকে ওকে

একবার দেখব। দেখব ও নিখাদ-নিটোল আছে। কোনও চিত্রচোর মোনালিসার দুর্লভ ছবিতে কোনও আঁচড় কাটেনি। যদি কাটে, আমি তাকে কেটে ফেলব। আঁশবটি দিয়ে।

তিন মিডলটন রো

অপরের কান্না শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। জমাট অশ্রু যার জীবনের ভিত, সে নিজের কান্না শুনে-শুনেই অভ্যস্ত হয়, বড় হয়। আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে সরে এসেছি বহুদিন। তারপর আমাকে অতি যত্নে বৃন্তচ্যুত করে আলতো দুই করতলে স্থান দিয়েছিল জুনি মিশ্র। পরিচয় ঘন হওয়ার পর একদিন ও বলেছিল, 'আপনি পুলিশে চাকরি করেন কী করে? এরকম দিশেহারা মন নিয়ে?'

উত্তরে বলেছি, 'জানো, সবাই আমাকে যমের মতো ভয় পায়। কারণ, ভালোমন্দ বিচার করে হিসেব-নিকেশ করে কখনও কোনও কাজ আমি করিনি। আজও করি না। তাই চোর-ডাকাত-বদমাশরা আমাকে বুঝতে পারে না। মেয়েরাও না...।'

'সত্যি?' জুনি হাসলে ওকে দারুণ লাগে।

'হ্যাঁ। যখন আমার গুলি চালানোর কথা, তখন আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকি। যখন শান্ত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার কথা, তখন রিভলভার নিয়ে যা-নয়-তাই করে বসি। অসময়ে হাসি। আমার কান্নাও অসময়ের। হয়তো ভালোবাসাও তাই।'

জুনি পরে বলেছিল, সেই মুহূর্তেই নাকি ও প্রথম আমাকে ভালোবাসতে শুরু করে। আমার বেহিসেবি চরিত্র ওর জীবনের সমস্ত হিসেব গরমিল করে দিয়েছিল তখন থেকেই। আর আমি এক দিশেহারা ক্লান্ত সিন্ধুসারস, আশ্রয় নিয়েছিলাম থইথই সমুদ্রের এক তন্বী জাহাজের বুকে, জুনির উষ্ণ বুকে।

এত কথা মনে পড়ার কারণ হয়তো দরজার ওপিঠ থেকে ভেসে আসা মোনালিসা চৌধুরীর কান্না, যা আমি এই মুহূর্তে, এখানে দাঁড়িয়ে, শুনতে পাচ্ছি।

রাত এখন সাড়ে ন-টা। আজ একটু আগেই বেরিয়েছি। অস্থির মনকে সংযত করে রেখেছি আপ্রাণ চেষ্টায়। সকালে সব কথা শুনে সত্যনাথ বলেছেন, 'অত ভাবনার কী আছে? সরাসরি গিয়ে জেনেই নাও না বিপদটা কীসের! তবে উটকো ঝামেলায় নাক গলানো....।' সুতরাং আমি সরাসরি পথই বেছে নিয়েছি। সিবি জানতে পারলে ব্যাপারটা কীভাবে নেবেন জানি না।

আমাকে না জানান দিয়েই আমার হাত দরজায় ধাক্কা দিয়েছে। কান্না রুদ্ধ হয়েছে

তৎক্ষণাৎ। আবার টোকা দিয়েছি দরজায়। ভাবতে অবাক লাগছে, প্রায় অচেনা একটি যুবতীর ফ্ল্যাটের দরজায় এই রাতে আমি লজ্জাহীনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কর্কশ আলো আমাকে ভাঁজ-খোলা নতুন শাড়ির মতো উন্মোচিত করে দিয়েছে।

দরজা খুলল মোনালিসা নিজেই। জনহীন ফ্ল্যাটে ও একা। পরনের কচি কলাপাতা শাড়িটা পরম যত্ন ও আদরে জড়িয়ে রয়েছে ওর অলৌকিক শরীরটা। ফরসা মুখ এখন থমথমে। চোখ সামান্য রক্তাভ। সব মিলিয়ে এক অস্বস্তিকর মুহূর্ত।

আমার মনে প্রশ্নের বাণ ফুঁসে উঠছে ক্রুদ্ধ অজগরের মতো। আমার প্রিয়তমা ছবির চোখে কে যেন এঁকে দিয়েছে অশ্রুর রেখা।

'আপনি?' কান্না-ভেজা চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলতে চাইল ও। তারপর সামান্য নির্লিপ্ত সুরে, 'কী চাই?'

ওকে অবাক করে দিয়ে আমি দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ঘরের ভেতরে। ও সন্ত্রস্ত হয়ে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। ওর চোখে অনিমেষ দৃষ্টি রেখে বললাম, 'কীসের বিপদ? কে তোমাকে বিপদে ফেলেছে?'

ও হঠাৎই অস্বস্তিতে ·পড়ল। চোখ নামাল। যেন সত্যের পুনরাবৃত্তি করছে এইরকম সুরে বলল, 'আপনাকে ফোন করে ভুল করেছিলাম।'

আমি ওর ভুল ভাঙাতে খুলে বললাম, কেন মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম গতকাল। কেন আমি পুলিশের চাকরি ছেড়েছি। সব। আমার অপরাধবোধের একান্ত সুর হয়তো ওর মনে দাগ কাটল। নিরুত্তাপ গলায় ও বসতে বলল আমাকে। ঘরের নরম সোফায় বসলাম। চোখ এখনও প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে দাঁড়িয়ে থাকা মোনালিসার দিকে। ঘরের সঙ্গে ওকে ভীষণ মানিয়ে গেছে।

ঘরের মেঝেতে নতুন কার্পেট, টেবিল, সোফা, টিভি, ফুলদানি—সবই রুচিশীল। হালকা সবুজ দেওয়ালে তিনটে ছবি টাঙানো রয়েছে। তার মধ্যে একটা মোনালিসার মুখের ক্লোজ-আপ। উদাসীন চুলের গুচ্ছ ওর চোখের পাতায় ছড়িয়ে ফেলেছে।

দরজা-জানলার ঘন নীল ও সাদা ফুলকাটা পরদার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হলাম। ও তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। যেন মনে-মনে আমাকে আঁচ করতে চাইছে। আমরা দুজনেই কোনও নির্বাক চলচ্চিত্রের কুশীলব।

হঠাৎই ও বলে উঠল, 'মিস্টার সেন, শুধু-শুধু আমার জীবনে জড়িয়ে পড়তে চাইছেন। আমার মনে কোনও আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। তবে কাল রাতে আমাকে যে-বিপদ থেকে আপনি বাঁচালেন, তাতে মনে নতুন করে আশা জেগে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, যে-সাপের কুণ্ডলী পাকানো শরীরের চাপে আমার দম আটকে আসছে, আপনি হয়তো—।'

দরজায় নক করার শব্দ হল।

আমি চকিতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মোনালিসার দু-চোখে আতঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়ল ডানা মেলে। ও ঠোঁটে আঙুল তুলে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত দিল আমাকে। কে এসেছে? বাবি? সে কি ওর স্বামী?

'মুন্নি! মুন্নি!' দরজার ওপার থেকে জড়ানো স্বর শোনা গেল। কেউ অধৈর্য হয়ে ডাকছে। নামটা কি মোনালিসারই আদরের ডাকনাম?

তাড়াতাড়ি সাড়া দিল মোনালিসা, 'খুলছি। এক মিনিট।'

বুঝলাম, সাড়া না দিলে বিপদ হত। আগন্তুক ভাবত, মোনালিসা ফ্ল্যাটে নেই এবং তখন হয়তো সে নিজের চাবিটা ব্যবহার করত দরজা খুলতে। গতকাল বাবি যেমন করেছিল।

পলকে আমার কাছে এসে গেল ও। আমার হাত চেপে ধরল। এবার আমি জাহান্নামে যেতেও রাজি। চাপা ফিসফিসে স্বরে ও বলল, 'আসুন, শিগগির আসুন আমার সঙ্গে—।'

প্রতিবাদহীনভাবে অনুসরণ করলাম ওকে। বসবার ঘর পেরিয়ে শোওয়ার ঘর। ঘরটা অন্ধকার। আমাকে কিন্তু অভ্যস্ত পায়ে টেনে নিয়ে চলল মোনালিসা। ইতিমধ্যে দরজার টোকা পালটে গেছে ধাক্কায়। জড়ানো স্বরের চিৎকারও শোনা গেছে বারদুয়েক। শোওয়ার ঘর থেকেই 'যাচ্ছি—' বলে উত্তর ছুড়ে দিয়েছে মোনালিসা। তারপর আমরা ঢুকে পড়েছি বিশাল এক বাথরুমের মধ্যে। একটা দরজা খুলে গেল। চাঁদের আলো এসে পড়ল তৎক্ষণাৎ এবং দেখতে পেলাম ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। কুণ্ডলী পাকিয়ে নীচে নেমে গেছে।

'শিগগির চলে যান, এক্ষুনি!' ও চাপা উৎকণ্ঠায় বলে উঠল।

আমি অনড় দাঁড়িয়ে রইলাম। বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। প্লিজ।'

ও তাকাল আমার চোখে। এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। চাঁদের আলোয় ওকে দেখলাম। ওর হাত এখনও ধরে আছে আমার হাত। ও বলল, 'কাল এগারোটায় বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের সামনে দেখা করবেন। সব বলব—।'

'আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই, মোনালিসা। বিশ্বাস করো।'

এই প্রথম ওর নাম উচ্চারণ করলাম—ওর সামনে দাঁড়িয়ে। মাথার ভেতরে ভূমিকম্প। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব ভুলে গেলাম। আমার দু-হাত অবাধ্য হল। নিমেষে কাছে টেনে নিল ওকে। আমার ঠোঁট মিশে গেল ওর কথা-বলা ঠোঁটে। ছায়া-ছায়া আঁধারে আমরা কোন এক অজ্ঞাত সূত্রে বাঁধা পড়লাম। সেই মুহূর্তেই কানে এল চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খোলার শব্দ।

ও ছিটকে গেল আমার বাঁধন থেকে। আমাকে আলতো করে ঠেলে দিল সিঁড়ির দিকে। তারপর খিড়কি দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমি তারই মধ্যে ওকে কথা দিলাম, এগারোটায় আসব। তারপর ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। ভূমিকম্পে ছত্রখান আমার মস্তিষ্ক আবার ধীরে-ধীরে ফিরে আসছে চেতনার জগতে।

নিজের ঠোঁটে বারতিনেক আঙুল বুলিয়ে নিলাম। আমার এই মুহূর্তের অস্তিত্ব বাস্তব কিনা যাচাই করতে স্পর্শ করলাম নিজের নাক-মুখ-চোখ। মোনালিসা, তুমি আমায় গুণ করলে? আমি যে সুখ পেতে অভ্যস্ত নই। জুনি একদিন খুব কঠিন গলায় কান্না চেপে আমাকে বলেছিল, 'তুমি কোনওদিন সুখী হতে পারবে না, সম্রাট। কারণ, তোমার শিরায়-শিরায় অ-সুখ। তোমার ভালোবাসা অবাস্তব। সে মাটিতে পা ফেলে না, তাই তার প্রতিদান দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়—শত চেষ্টা করলেও।' মোনালিসা, যদি কখনও ও আমাকে ভালোবাসে, কি একই কথা বলবে?

ঘোরানো সিঁড়ি একসময় শেষ হল। অন্ধকার সরু কাঁচা গলি। দু-পাশের দেওয়ালে শুধু লোহার পাইপ। আর ইতস্তত কিছু আবর্জনা। সাবধানে পা ফেলে ফুটপাথে বেরিয়ে এলাম। জানি না, মোনালিসার ঘরে এখন কী নাটক শুরু হয়েছে। ও কি ধরা পড়ে গেছে সেই আগন্তুকের কাছে? মুখ তুলে চেষ্টা করলাম ওর ফ্ল্যাটের দিকে দেখতে। হ্যাঁ, আলো জ্বলছে। শোওয়ার ঘরেও। মনের মধ্যে একটা কাঁটা কোনও এক অজানা কারণে খচ্ করে উঠল। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথাটা অনুভব করলাম তলপেটে। কারণ, ভারী বুটের একটা লাথি সেখানে এসে আছড়ে পড়েছে। আমি ওপর দিক থেকে চোখ পুরোপুরি নামানোর আগেই দ্বিতীয় লাথিটা বুকে এসে পড়ল খুব সহজে। কারণ, প্রথম আঘাতের পর আমি ঝুঁকে পড়েছিলাম সামনের দিকে।

অন্তর্দৃশ্য

'বাবি, তুমি?' মোনালিসা বলে উঠল।

শোওয়ার ঘর পেরিয়ে বসবার ঘরে এসে পৌঁছতেই আগন্তুকের মুখোমুখি হয়েছে ও।

'হ্যাঁ, আমি।' বাবি দুটো সরল চোখ মেলে ধরে আছে মোনালিসার শরীরের ওপর। ধীরে-ধীরে সেই দৃষ্টি সন্দেহকুটিল হল। লাল-কালো চেক-কাটা টেরিকটনের কোট খুলে রাখল সোফার ওপর। স্খলিত পায়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে জড়ানো গলায় বলল, 'দরজা খুলতে দেরি হল কেন?'

উদ্ধত ছত্রপতির সুর বাবির গলায়। ঘরের প্রতিটি জিনিস সে দেখতে লাগল

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। যেন আন্দাজ করতে চাইছে, ঘরে কেউ এসেছিল কি না। আর এসে থাকলে সে কে। তার ভুরুর ভাঁজ ঘন হল।

পায়ে-পায়ে মোনালিসার পাশ কাটিয়ে শোওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে। ঘরের আলো জ্বেলে দিল। তারপর বসল নরম বিছানায়। পোশাক খুলতে শুরু করল বিনা ভূমিকায়। যেন এসব অত্যন্ত স্বাভাবিক—প্রাত্যহিক কর্মসূচির মধ্যেই পড়ে। একে-একে জুতো, প্যান্ট, গেঞ্জি সবই আশ্রয় পেল কার্পেটের ওপর।

মোনালিসা ফিরে তাকিয়ে বাবিকে দেখছে। ভারী গলার বাবি জিগ্যেস করল, 'কে এসেছিল?'

'কেউ না।'

বিশ্রীভাবে হাসল বাবি। বলল, 'যেই আসুক, আমার আসা-যাওয়া তাতে আটকাবে না।' একটু থেমে প্রেমজর্জর গলায় যোগ করল, 'আমি তোমাকে দারুণ ভালোবাসি, মুন্নি।'

'থুঃ থুঃ।' শব্দ করে মেঝেতে থুথু ছিটিয়ে দিল মোনালিসা।

আহত কোণঠাসা বাঘিনীর অভিব্যক্তিতে ঘৃণার সূক্ষ্ম রেখা জন্ম নিল পলকে। বাবি বিচিত্র নিরাবরণ বেশে নেমে এল বিছানা থেকে।

মোনালিসা নিথর, নিস্পন্দ।

এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল বাবি। মুখে মদের জমাট গন্ধ। বলল, 'চলো, ডার্লিং।' তারপরই সর্বশক্তিতে জাপটে ধরল যুবতীকে। অবাধ্য হাত ও ঠোঁট ওর শরীরের যত্রতত্র চলাফেরা করতে লাগল 'মুন্নি, সোনামণি আমার...উম্ ম্...।'

মোনালিসার গায়ে যেন হাজার শুঁয়োপোকা চলে বেড়াচ্ছে। ওর গায়ে কাঁটা দিল। বিবশ হয়ে ও নিজেকে ঢেলে দিল বাবির ওপর। কচি কলাপাতা শাড়ি ও তার প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ অদৃশ্য হল মোনালিসার শরীর থেকে। বাবি তখন দিশেহারা। কোথা থেকে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। গলার স্বর আরও ভারী, আরও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মোনালিসাকে টানতে-টানতে ও নিয়ে গেল বিছানার দিকে। আছড়ে পড়ল নরম গদিতে। হঠাৎই কী মনে পড়ায় বিছানা ছেড়ে নেমে এল বাবি। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল বসবার ঘরে। রেখে যাওয়া কোটের পকেট হাতড়ে বের করল একটা ঝলমলে পাথর-বসানো জড়োয়া নেকলেস। তারপর হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিল বসবার ঘরের আলো এবং রওনা হল বিছানায় ফেলে আসা অব্যবহৃত স্থাপত্য-শিল্পের দিকে।

কিন্তু মোনালিসা ভাবতে চেষ্টা করছিল সম্রাট সেনের কথা। গত রাতের কথা। আজ রাতের কথা।

নিজের অতীত সম্পর্কে খুব দুঃখী নয় ও। কারণ, সেই বিষণ্ণ অতীত ও ভয়ঙ্কর

বর্তমানের জন্য ও নিজে দায়ী নয়। হঠাৎই ওর চিন্তায় বাধা পড়ল। একটা ঝলমলে নেকলেস ছিটকে এসে পড়েছে ওর বুকের ওপর। শীতল ধাতব স্পর্শে মোনালিসা কুঁকড়ে গেল। পরক্ষণেই নেকলেসকে অনুসরণ করে একইভাবে ওর শরীরে স্থাপিত হল বাবি। মোনালিসার বুক ও নেকলেস একইসঙ্গে স্পর্শে অনুভব করে বলল, 'তোমার জন্যে, মুন্নি। বিশ হাজার।'

মোনালিসা চুপ করে রইল। শুধু নেকলেস কেন, ওর এই আধুনিক আবাসের প্রতিটি বিত্ত, প্রতিটি বৈভবের জন্য ও বাবির কাছে ঋণী। সেই ঋণের শোধ বাবি চায় এইভাবে। প্রতি রাতে।

'গতকালের দেবদূতের কী খবর, বলো।' মজার সুরে বলল বাবি। নেকলেসটা তার নড়াচড়ায় পড়ে গেল মোনালিসার শরীর বেয়ে বিছানায়। বাবি নিজের শরীর প্রয়োজনমতো গুছিয়ে নিল। একসময় সন্তুষ্ট হল। মোনালিসাকে আপ্রাণে আঁকড়ে ধরে বলল, 'আমি দেবদূত নই, মুন্নি, শুধুই মানুষ। তবে শক্তিতে হাজার দেবদূতের চেয়ে কম নই। দ্যাখো, আই অ্যাম গোয়িং টু প্রুভ ইট। রাইট? ফিল ইট?'

মোনালিসার শরীর অনুনাদী হল বাবির ছন্দে। সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটছে এখন। মনকে নির্বিকার রাখতে পারলেও শরীর নির্বিকার থাকছে না। বরং প্রচণ্ড বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠতে চাইছে এই বিশেষ মুহূর্তে। মোনালিসার মনের শাসনের অবাধ্য হল শরীর। সেই অবাধ্যতা অনুভব করে আরও উদ্দাম, আরও বেসামাল, আরও খুশি হয়ে উঠল বাবি। অস্ফুটে পাগলের মতো বলতে লাগল, 'মুন্নি! মুন্নি! আই মেড ইট! আই মেড ইট হ্যাপেন!'

অবশেষে বাবি ও মোনলিসা শান্ত হল।

মোনালিসার চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে অঝোরে। সম্রাট সেনের দুর্লভ ছবি কাঁদছে। কেউ তাতে আঁচড় কেটেছে নিষ্ঠুরভাবে। এসো, দেখে যাও তোমরা।

কে এই নিষ্ঠুর আঘাতকারী, আমি জানি না। তার উদ্দেশ্যও আমার কাছে অস্পষ্ট। ভালো করে কিছু ঠাহর করার আগেই আমি ছিটকে পড়েছি ফুটপাথে। আক্রমণকারীর ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক যে, শারীরিক দিক থেকে আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। তাই সে কয়েক পলক সময় দিল আমাকে। ততক্ষণে আমার হাত খুঁজে পেয়েছে শোল্ডার আর্মি হোলস্টারের ০.৩৮ স্পেশালটা এবং সরাসরি গুলি করেছি দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে-থাকা ছায়াটাকে লক্ষ করে। পরপর তিনবার। প্রতিপক্ষকে চমকে দিয়ে।

লক্ষ্যভেদ হল কি না জানি না, তবে ভীষণ অবাক হয়েছে সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাতেই নজরে পড়ল তার চলায় কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। আমার মাথার ভেতর রক্তের ঢেউ বলগাহীন ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। তলপেটে ও বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। অনুভব করলাম গুলির শব্দে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা ছুটে আসছে এদিকেই। আর চিৎ হয়ে শোওয়া অবস্থায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মোনালিসার ফ্ল্যাট। শুধু শোওয়ার ঘরে আলো জ্বলছে। আমি হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগলাম। রিভলভার ডানহাতের মুঠোয় শিথিল। আকাশে ম্লান চাঁদের আলো যেন সমবেদনা জানাচ্ছে আমাকে।

পায়ের শব্দগুলো আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। একসময় মোনালিসার ঘরের আলো নিভে গেল। চাঁদও ঢেকে গেল মেঘের আড়ালে।

চার ক্যাথিড্রাল রোড

ঘড়িতে এগারোটা এখনও বাজেনি। আমি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। কোনও প্রেমিকের জীবনে এই অপেক্ষার সময়টুকুর মহার্ঘতা এককথায় ঐশ্বরিক। অন্তত আমার কাছে। এই অপেক্ষার সময় যদি না ফুরোয় তা হলে কেমন হয়? মোনালিসার মনে আছে তো আমার কথা? ও আসবে, এই প্রত্যাশাটুকু আমার শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়েছে। ভুলে গেছি কালচে নীলরঙের দুটো বীভৎস কালশিটের কথা।

আজ সকালে যখন আর্মস সেকশানে রিভলভারটা রামকৃপালকে ফেরত দিই তখন সে অবাক হয়েছিল। কারণ, চেম্বার খুলে ও গন্ধ শুঁকে গতরাতের গুলিবৃষ্টির প্রমাণ সে পেয়েছে। আমি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখে সই করে দিয়েছি ওর রেকর্ডের খাতায়। তারপর বিস্তারিত বিবৃতি লিখে দেখা করেছি সিবির সঙ্গে।

আমি যে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছি, সেটা সিবির নজর এড়ায়নি। তাঁর সহাস্য মুখে চিন্তার ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। বললেন, 'সেন, কী ব্যাপার?'

আমি চুপচাপ টাইপ করা রিপোর্টটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। বললাম, 'গতকাল তিন রাউন্ড গুলি আমাকে ছুড়তে হয়েছে—আত্মরক্ষার জন্যে।'

'তিন—রাউন্ড!' সিবি চোখ কপালে তুললেন, 'তা হলে বলো তোমাকে এক রেজিমেন্ট আর্মি অ্যাটাক করেছিল!'

'না, মাত্র একজনই।' বিব্রতভাবে বললাম, 'আসলে আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। লোকটাকে আমি খুন করে ফেলতে চেয়েছিলাম।'

সিবি চিন্তিত হলেন। কপালে ভাঁজ ফেললেন। ভুরুজোড়ার মাঝের দূরত্ব অনেকটা কমে গেল। বললেন, 'সেন, এটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে। তুমি ভালো করেই জানো, পুলিশের চাকরি তোমাকে কেন ছাড়তে হয়েছে। এখন এই ফায়ারিং নিয়ে পুলিশি তদন্ত হবে। আমাকেই তার জবাবদিহি করতে হবে।' গলার সুর পালটে এবার নিয়ে এলেন স্নেহের ছোঁয়া 'আসলে কী জানো, এ-ধরনের প্রোটেকশান কোম্পানির বিপদ অনেক। পুলিশ এদের ভালো চোখে দ্যাখে না। অনেক দিক বাঁচিয়ে তারপর আমাদের চলতে হয়।'

আমি চুপ করে রইলাম।

অবশেষে আমি বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'তোমার রিপোর্টে আমি অ্যাটাকারের সংখ্যা চার-পাঁচজন করে দিচ্ছি। আর বলে দিচ্ছি, তারা প্রত্যেকেই আর্মড ছিল।'

আমি বেরিয়ে আসছি, সিবি পিছু ডাকলেন, 'সেন—!'

থমকে দাঁড়ালাম।

'যদিও তোমার পারসোনাল ব্যাপার, তবু বলছি।' সামান্য ইতস্তত ভাব। তারপর হেসে 'মেয়েদের ঝামেলায় নিজেকে বেশি জড়িয়ো না। এ-কথা বলছে, জ্ঞানবৃদ্ধ কর্নেল বটব্যাল। জীবন-যুদ্ধে ও সামরিক যুদ্ধে যার অগাধ অভিজ্ঞতা, বুঝলে?' অবশেষে আন্তরিক হাসি।

বুঝলাম, সত্যনাথ চক্রবর্তী মোনালিসার ব্যাপারটা গোপন রাখেননি। সিবির কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় কোম্পানির ডিউটির অমূল্য সময়ের কিছু অংশ যে মেয়েদের ব্যাপারে আমি খরচ করেছি, সেটা যথাস্থানে জানাতে একটুও দেরি করেননি।

নিজের সিটে ফিরে এলাম। আমার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কোনও ঠাট্টা-রসিকতা করার সাহস পায়নি। সত্যদা বার-দুয়েক চোরাচাউনিতে আমাকে লক্ষ করেছেন। আমি কাগজপত্র গুছিয়ে আবার ফিরে গেছি সিবির কাছে। বলেছি, দু-তিনঘণ্টার জন্যে আমার ছুটি চাই। ব্যক্তিগত প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ স্মিত হেসে ছুটি মঞ্জুর করেছেন সিবি। আর আমিও বেরিয়ে এসেছি অফিস থেকে। বেরোনোর সময় কানে এসেছে নমিতা বাসুর মিহি গলা, 'বেস্ট অফ লাক!'

লাক যে বেস্ট না হলেও তার কাছাকাছি, সেটা বুঝলাম দূরে অপ্রস্তুত পায়ে এগিয়ে আসা মোনালিসার দিকে চোখ পড়তেই। কারণ, ঘড়ির কাঁটা সবে এগারো পেরিয়ে মাত্র মিনিট-পাঁচেক এগিয়েছে, তার মধ্যেই আমার আশপাশে সূর্য উঠেছে সোনালি কিরণের মালা গলায় দিয়ে।

ও যেন হাওয়ায় ভেসে এগিয়ে এল আমার কাছে। আমরা মুখোমুখি হলাম। ওর পরনে আমাদের প্রথম আলাপের সাদা রঙের শাড়িটা। সঙ্গে সবুজ ব্লাউজ। কপালে কালো টিপ যথারীতি। হালকা শীতের হাওয়ায় আমার শরীর শিউরে উঠছে থেকে-থেকে। উজ্জ্বল দিনের আলোয় অপলকে ওকে দেখতে লাগলাম। ওকে দেখলে দেখা কখনও শেষ হয় না।

পায়ে-পায়ে আমরা হাঁটতে শুরু করেছি রাস্তা পেরিয়ে খোলা মাঠের দিকে। সবুজ ঘাস এখন দুষ্প্রাপ্য। এক বিশাল গাছের ছায়ায় তা-ও পাওয়া গেল অবশেষে। ওকে বললাম, 'বসব?'

ওর নীরব অনুমতি পেলাম। বসলাম দুজনে।

সময় প্রায় দুপুরের শুরু, ফলে এক অদ্ভুত নির্জনতা চারিদিকে। কর্কশ দিনের আলোয় যা বেমানান। মাথার ওপরে গাছের পাতার ঘন ছাউনি। কিন্তু সেই ঘন ছাউনির ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঠিকরে আসছে সূর্যকিরণ। জলছবির মতো সোনালি গোলাকার প্রতিবিম্ব সংখ্যাহীনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে আমাদের শরীরে ও সবুজ ঘাসে। নিরাকার নিস্তব্ধতায় থেকে-থেকে বিদ্রোহ তুলছে দূরের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া বাস ও গাড়ির গর্জন। ঠান্ডা হাওয়া বখাটে খোকার মতো ওর চুল নিয়ে খেলা করছে। একটা মিষ্টি শব্দ কানে আসতেই প্রমাণ পেলাম আজও এখানে লুকিয়ে পাখি ডাকে। আর আমি ততক্ষণে ফ্রেমে বাঁধানো কোনও স্বপ্নের ছবি হয়ে গেছি।

'মোনালিসা...এবার বলো....সব।' আমি অস্ফুটে বললাম।

ও অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে রইল। তারপর বলল, 'তোমাকে আমি ভালো করে এখনও চিনি না, কিন্তু বিশ্বাস করো, এতটা নিজের করে কেউ কখনও আমাকে কাছে ডাকেনি। ভেবেছিলাম তোমাকে সব বলব, কিন্তু তা হলে আজকের এই সুন্দর মুহূর্তগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'আজ নয়...অন্যদিন...কথা দিচ্ছি।'

টের পেলাম একটা অজানা দ্বিধা ওকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। ও মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'শুধু এটুকু এখন বলতে পারি, জীবনের ঋণ আমাকে দিনের পর দিন শোধ করতে হচ্ছে...।'

'সে-ঋণ আমি শোধ করব। কথা দিলাম।'

আমার প্রতিজ্ঞার সুরে ও ক্লিষ্ট হাসল শুধু।

এরপর আমরা সময়জ্ঞান হারিয়ে বসে রইলাম দুজনের কাছাকাছি। কখন আকাশে তারারা উঁকি মেরেছে জানি না। শীতের হাওয়ার বর্শা কখন যেন আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।

অবশেষে এসেছে বিদায়ের ক্ষণ। ওর ঠোঁট ছুঁয়ে আমি সমবেদনা জানিয়েছি। ও তাতে সাড়া দিয়ে ছোট্ট করে বলেছে, 'আমি আর কাউকে ভয় পাই না।' কান্নায় স্বর বুজে এসেছে ওর।

পরদিন সন্ধ্যায় দেখা করব, এই কথা বলে আমরা যার-যার পথে হেঁটেছি।

পাঁচ আকাশ পাতাল রোড

অন্তর্দৃশ্য

সবুজ অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা রাস্তার মাঝ-বরাবর ছুটে চলেছে। প্রতিটি বাঁক নিচ্ছে অতি সাবধানে, অভ্যস্ত সহজ ভঙ্গিতে। রাস্তার দু-পাশে আলোর দুর্ভিক্ষ। যে-কয়েকটা রশ্মি চোখে পড়ে, তা শীর্ণ কঙ্কালসার। গাড়ির পিছনে একটিমাত্র টেল লাইট জ্বলছে। গাড়ির চালক আলোছায়ায় অস্পষ্ট। তার চোখের শূন্য দৃষ্টি স্পষ্ট বলে দেয় তার মন ভীষণ ব্যস্ত। কারণ, সে ভাবছে কয়েক ঘণ্টা আগের নৈশদৃশ্যের কথা। শত চেষ্টাতেও যেন ভুলতে পারছে না।

মুন্নির সবকিছুর অধিকারে সে অধিকারী। আর তরুণ? রোগা চারচোখো তরুণ চৌধুরী তার মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বে কি ইস্পাতের মেরুদণ্ড কিনে এনে লাগিয়ে নিয়েছে? নইলে মুন্নি কীসের জোরে এত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে?

মুন্নি ও তরুণের কথা ভাবতে-ভাবতেই গাড়িটা গন্তব্যে পৌঁছে গেল। বিশাল লোহার গেট পেরোল, সুরকি ঢালা পথ অতিক্রম করল, এসে থামল বন্ধ দরজার সামনে। গাড়ি থেকে নামল বাবি। সিঁড়ি ভেঙে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চাবি বের করল পকেট থেকে। দরজা খুলল। খুব আস্তে চাপ দিয়ে ঠেলে দিল দরজার পাল্লা। ভেতরে ঢুকল। সব অন্ধকার। স্বাভাবিক। কারণ, রাত এখন প্রায় বারোটা।

সুইচ টিপে টিমটিমে আলঙ্কারিক বাতিটা জ্বেলে দিল বাবি। এগিয়ে গেল টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল। তারপর অপেক্ষা।

ও-প্রান্তে কেউ ফোন তুলে নিল।

'হ্যালো.... ।'

'তৈরি আছ তো?' বাবি টেনে-টেনে প্রশ্ন করল। মদের গন্ধ হলকা ছুড়ে দিল নিজের নাকে।

ও-প্রান্তের কণ্ঠ সচকিত হল, বলল তৎক্ষণাৎ, 'হ্যাঁ, আছি।'

'তা হলে বেরিয়ে পড়ো এখুনি। আজ রাতেই শেষ করে দাও। তবে অ্যালার্ট থেকো।'

'ও-কে!'

দু-প্রান্তই রিসিভার নামিয়ে রাখল। বাবি মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিল। তরুণ চৌধুরীর কিনে আনা শিরদাঁড়া আজ রাতেই ভেঙে দেওয়া হবে। চূর্ণবিচূর্ণ করে। আর একইসঙ্গে ধ্বংস হবে শরীরী যুবতীর অহঙ্কার।

আলো নিভিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল সে। এখানেও অন্ধকার। তবে জানলা খোলা থাকায় চোখে পড়ছে অস্পষ্ট সাদা বিছানা। বিছানায় কেউ যেন শুয়ে আছে। বাবি ঘরের ভেতরে আরও কয়েক পা এগোতেই ঘরের আলো জ্বলে উঠল অকস্মাৎ এবং বাবি নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। বিছানা খালি। চকিতে ও ঘুরে তাকাল দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধানে। তাকে দেখতে পেল।

গাল দুটো অস্বাভাবিক ফোলা। মুখের অনুপাতে চোখ অনেক ছোট। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত। কোঁকড়ানো। ঠোঁটে গাঢ় রঙের লিপস্টিক। চোখে ম্যাসকারা। সব মিলিয়ে প্রসাধন উগ্র। মহিলা বসে আছেন একটি চেয়ারে। একটা বিদেশি কম্বলে কোমর থেকে পা পর্যন্ত পুরোপুরি ঢাকা। ফলে, চেয়ার যে আছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে একমাত্র তার বসার ভঙ্গি থেকে।

দুজনে চোখে-চোখে তাকাল। ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বারোটা বাজতে শুরু করল অলস সুরেলা ছন্দে।

'এত রাত করে জেগে রয়েছ কেন?' বাবির স্বর এখন একেবারে পালটে গেছে। অনেক মমতায় ভরা।

মহিলা অপ্রতিভভাবে হাসল 'ঘুম যে আসে না, বাবি।' কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে কম্বলের প্রান্ত ধরে নাড়াচাড়া করে 'তুমি না ফেরা পর্যন্ত কখনও ঘুমোতে পারি না আমি।'

বাবি জামাকাপড় ছাড়তে শুরু করে ক্লান্ত হাতে। মহিলা দ্যাখে। একসময় বলে ওঠে, 'তোমার খাবার ঢাকা আছে রান্নাঘরে।'

বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে বাবি বলল, 'জানি।'

কানে আসছে জলের ধারা অস্থিরভাবে ছড়িয়ে পড়ার শব্দ। বাবি স্নান করছে। কান পেতে শুনছে মহিলা। তারপর রঙিন নখওয়ালা ভুমো-ভুমো হাতে কম্বলের নীচ থেকে বের করে নিয়ে এল একটা হাত-আয়না। ঘাড় বাঁকিয়ে, মুখ তুলে পরীক্ষা করতে লাগল প্রসাধন। গুনগুন করে সুর জাগাল ঠোঁটে। মাঝে-মাঝে চুলের গোছা, ভুরু, চোখের পাতা ঠিক করে নিতে লাগল। ঘরের জোরালো ফ্রস্টেড বাতির আলোয় ঝিকমিক করছে কপালের টিপ, নাকের নথ, কানের দুল, ও ঘন নীল সিল্কের শাড়ির

সোনালি জরির পাড়। বাবি ফিরে এল। পরনে ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট। ভিজে চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মহিলার মুখের কাছে মুখ এনে ঠোঁট ছোঁয়াল গালে। বলল, 'এসো, শোবে এসো।'

'হ্যাঁ, চলো।' শিথিল স্বরে বলল মহিলা। কম্বল খসে পড়ল মেঝেতে। এবং এই প্রথম ইনভ্যালিড চেয়ারটা দেখা গেল। পায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ে নীল শাড়ির ঝুলন্ত অংশটাকে মুঠোয় ধরে মুড়ে নিল বাবি। তুলে দিল মহিলার কোলের ওপর। এখন বোঝা যাচ্ছে, উরুর মাঝামাঝি জায়গা থেকে মহিলার দুটো পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। শাড়িতে মোড়া ভোঁতা দুটো পিণ্ড প্রকট হয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, 'এককালে আমরা দু-দুটো পায়ের মালিক ছিলাম।'

শিশুর মতো মহিলাকে কোলে তুলে নিল ববি। মহিলা তাকে আঁকড়ে ধরল দু-হাতে। পরম স্নেহে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। চাদর টেনে দিল গায়ে। আলো নিভিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল পাশে। খোলা জানলা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে ওদের শরীরে। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু দেওয়াল-ঘড়ির ক্লান্তিকর টিকটিক শব্দ।

'কেমন লাগল আজ?' মহিলার আকস্মিক প্রশ্ন।

চমকে ফিরে তাকাল বাবি। মহিলার ছোট-ছোট দুটো চোখ খোলা জানলার দিকে।

নিজেকে সামলে নিয়ে বাবি জবাব দিল 'ভালো'। সেইসঙ্গে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে এল বুক ঠেলে। মনে পড়ল, প্রতিবাদী মুন্নির কথা। জিভে তেতো স্বাদ পেল।

'বাবি, রোজ রাতে এভাবে শুয়ে-শুয়ে আমার মনে পড়ে আমাদের আগেকার দিনগুলো। আমার অ্যাক্সিডেন্টের আগের দিনগুলোর কথা। সে কতদিন হয়ে গেল বলো তো! তুমি—তুমি এক অবাক করে দেওয়া পুরুষ ছিলে। আমি যন্ত্রণার আনন্দে ভেঙেচুরে কুটিকুটি হয়ে যেতে চাইতাম। মনে হত, সেই অদ্ভুত সময়টার বুঝি আর শেষ হবে না। সত্যি, শেষ হতও না!' মহিলা ফিরে তাকাল বাবির দিকে। সরে এল আরও কাছে। ওর উরুর কাটা অংশের উর্বস্থি বিঁধছে বাবির উরুতে। বলল, 'বাবি, তুমি কি লোহার তৈরি?....আচ্ছা, আর একবার, একটিবার আমাকে সেই সুখ সেই আনন্দ দিতে পারো না তুমি? বলো?'

'ঘুমিয়ে পড়ো, নন্দিতা।' নির্লিপ্ত স্বরে বলল বাবি, 'তুমি তো জানো, ডাক্তারের বারণ আছে। সেই ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্টের পর কখনও ভাবিনি তোমাকে ফিরে পাব, আরও ভয় ছিল পাপুর জন্যে। ওর জন্ম নিতে তখন তো মাত্র মাসতিনেক দেরি ছিল।' আবার দীর্ঘশ্বাস 'আমি খুব লাকি, নন্দিতা, যে, তোমাদের দুজনকেই ফিরে

পেয়েছি। তুমি.....তুমি বলতে গেলে তোমার পা দুটোর বিনিময়ে পাপুকে বাঁচিয়েছ। ওঃ.... ।'

'আমার দুঃখ কী জানো?' বলল নন্দিতা, 'তোমাকে কাছে পেয়েও পাই না। তোমার শরীরের চাহিদা কতখানি, আমি জানি।' সে-চাহিদা অনমনীয়, দীর্ঘস্থায়ী, ভাবল বাবি, 'যখন সুস্থ সবল ছিলাম, তখন সে-চাহিদার প্রতিটি কণা আমি মেটাতে চেষ্টা করেছি প্রাণ দিয়ে। কিন্তু এখন রোজই চিন্তা হয় সে-চাহিদা যে মেটাচ্ছে, সে ঠিকমতো পারছে কি না। পারছে?' উদগ্রীব হল নন্দিতা।

'পারছে, তবে তোমার মতো করে নিশ্চয়ই নয়।' হেসে বলল বাবি। মনে পড়ল মুন্নির কথা।

আরও কাছে ঘেঁষে এল নন্দিতা। আদুরে স্বরে বলল, 'আমাকে সব বলো না গো। শুনে দেখি, ও আমার মতো, নাকি আমার চেয়ে ভালো। বলো না, বাবি। সব বলো, একটু-একটু করে, প্লিজ!'

বাবি তেতো হাসল। এই মুহূর্তে নন্দিতাকে ভীষণ বুড়ি দেখাচ্ছে। রোজ রাতে ফেরার পর ওকে সব বলতে হয়। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শোনে ও। দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে মোনালিসার। বলে, 'বাবি, আমি হলে ওরকম না করে এরকম করে করতাম.... ।'

বাবি ক্লান্ত স্বরে যান্ত্রিক সুরে ধারাবিবরণী দিয়ে যায়। এমনও হয়েছে, মোনালিসার কাছে না গেলেও বানিয়ে-বানিয়ে বর্ণনা শোনাতে হয়েছে নন্দিতাকে।

বিকলাঙ্গ স্ত্রীর অনুরোধে, অনুনয়ে, বলতে শুরু করল বাবি। মনে দুশ্চিন্তার টাইফুন। তবু বলে চলল, 'প্রথমে আমি বিছানায় গিয়ে বসলাম, তারপর... ।'

বিবরণী এগিয়ে চলে। বাবি অনুভব করে, চাদরের নীচে নন্দিতা অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জিভে একটা বিস্বাদ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে। নন্দিতার চঞ্চলতা উত্তেজনায় উদ্দাম হয়।

হঠাৎই অন্ধকার থেকে একটা আধো-আধো বিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

'মা-মণি...মা-মণি। আমাল না ঘুম আত্‌তে না। একা-একা ভয় কত্‌তে।'

ভীষণ চমকে ওঠে ওরা দুজনেই। পাশের ছোট শোওয়ার ঘরে ঘুমিয়ে থাকা পাপুর কথা দুজনেই ভুলে গিয়েছিল এই মুহূর্তে। হাত বাড়িয়ে বেডসুইচ টিপে নিয়ন আলোটা জ্বালাতে গেল বাবি। কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় নন্দিতার নখালো থাবা কেটে বসল বাবির কবজিতে। হিসহিস করে বলল, 'আলো জ্বেলো না। চুপ করে থাকো। নিজে থেকেই ভয় পেয়ে চলে যাবে।'

বাবির বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিল সে। আলো জ্বেলে দিল। অব্যক্ত স্বরে ডুকরে উঠল নন্দিতা।

উজ্জ্বল আলোয় অনুপ্রবেশকারীকে স্পষ্ট দেখা গেল।

বছর তেরো বয়েস। মাথাটা শরীরের তুলনায় প্রকাণ্ড। চোখও তাই। পুরু ঠোঁটের কোণ ঘেঁষে লালা পড়ছে। পরনে স্লিপিং স্যুট। দুটো হাত দু-পাশে ঝুলছে জড় পদার্থের মতো। খরগোশের মতো সামনের দুটো দাঁত বিজ্ঞাপনের ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে।

শূন্য দৃষ্টি মেলে পাপু আবার বলল, 'বাপি, ঘুম আত্তে না। সত্যি বল্‌তি।'

একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা মাথা থেকে জন্ম নিয়ে ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ল বাবির শরীরের প্রতিটি কোষে।

নন্দিতা নিজের পা দুটোর বিনিময়ে পাপুকে বাঁচিয়েছে। রূঢ়, তিক্ত, বাস্তবের মতো কথাগুলো আঘাত করল বাবিকে। পলকের জন্য তার মনে হল, ওই বিনিময় পদ্ধতির আদৌ কোনও প্রয়োজন ছিল কি না।

বিভিন্ন মানসিক ক্ষত বাবির বুকের ভেতরটা দলে পিষে থেঁতলে দিচ্ছিল। তখনই তার নতুন করে মনে পড়ল মুন্নির অপমানের কথা। ক্রোধ ও হিংস্রতা আবার জায়গা করে নিচ্ছে বাবির হৃদয়ে। সে ভাবছে একটু আগে ফেলে-আসা সন্ধ্যার কথা, রাত্রির কথা, মুন্নির কথা...।

ছয় মিডলটন রো

অন্তর্দৃশ্য

'মুন্নি, তুমি কিন্তু আজকাল আমার দিকে নজর দাও না।'

অনুযোগকারী বসে আছে খাটের ওপর। দু-হাত দু-পাশে ভর দিয়ে ড্রেসিং টেবিলে বসা মোনালিসাকে আয়না দিয়ে দেখছে। বসবার ঘরে টিভিতে লোকসঙ্গীত। মোনালিসা আজ ভীষণ মন্থর। বারবার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নিজের মুখটা পরখ করছে সামনের কাচের পরদায়। সম্রাটের সঙ্গে আজকের দুপুরটা ওকে পাগল করে দিয়েছে। পাইয়ে দিয়েছে রক্তের স্বাদ। সত্যিকারের ভালোবাসা হয়তো এমনই শক্তিশালী। অপরাজেয়।

রাহু সবসময় গ্রাস করে চন্দ্রকে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা কি ঘটে না? চন্দ্র কি কখনও গ্রাস করতে পারে না রাহুকে? মোনালিসার চোয়ালের রেখা কঠিন হল। আয়না দিয়ে ও চোখ মেলাল রাহুর চোখে। বাবির চোখে। নির্ভাজ স্বরে বলল, 'নজর দেওয়ার মতো কী আছে তোমার?'

বাবি চমকে উঠল। দু-হাতের ভর ছেড়ে দিয়ে চাবুকের মতো টানটান হয়ে

বসল খাটে। অলস মেজাজ মিলিয়ে গিয়ে আসল বিষধর সাপটা বেরিয়ে এল খোলস ছেড়ে। ফণা তুলল।

'মুন্নি, জিভ ছাড়া তোমার মুখটা ভীষণ বেমানান লাগবে। তাই মত পালটালাম।'

সাপ খাটে বেয়ে নেমে এল মেঝেতে। এসে দাঁড়াল মোনালিসার ঠিক পিছনে। ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে হাসল, 'এত তেজ কীসের? দেবদূতের সঙ্গে প্রেম হয়েছে? নাকি তরুণ চৌধুরীর পয়সার জোর বেড়েছে?'

দুটো খসখসে হাত পিছন থেকে হাত রাখল মোনালিসার দু-গালে। আদরের পরশ বোলাতে লাগল। এক ঝটকায় সেই জোড়া হাত ঠেলে দিল ও। অবাক হল নিজের এই আকস্মিক দুঃসাহসে। উঠে দাঁড়াতে গেল মোনালিসা। আর ঠিক তখনই পিছন থেকে বজ্রপাতের মতো চড়টা আছড়ে পড়ল ওর নরম গালে।

ওর পড়ে যাওয়া শরীরটা বাঁ-হাতে রুক্ষভাবে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল বাবি। তারপর ডানহাতে দ্বিতীয় চড় বসিয়ে দিল। টিভির লোকসঙ্গীত হার মানল সেই বিশ্রী শব্দের কাছে। মোনালিসা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ঠোঁটের কোণ ঘন লাল হয়ে গেছে। দু-চোখে ওর ইস্পাতের ফলা ঝিলিক মারছে।

'মুন্নি, যেদিন তোমাদের কেউ ছিল না, সেদিন তোমাকে রাস্তার কুকুরগুলোর হাত থেকে কে বাঁচিয়েছিল, সেটা আজ বোধহয় তোমার আর মনে পড়ে না। তোমার ছোটভাইয়ের আজ পথে-পথে ভিক্ষে করে বেড়ানোর কথা। কিন্তু সেটা আমি হতে দিইনি। স্নেহ-ভালোবাসায় তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছি, প্রতিদান চাইনি। অথচ—।'

আহত বাঘিনীর মতো ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়িয়েছে মোনালিসা। তারপর চিৎকার করে বলেছে, 'রাস্তার কুকুরগুলোর হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে নিজের জন্যে। তোমার চেয়ে নোংরা কুকুর আমি আর দেখিনি।' একটু থেমে বড় শ্বাস টেনে দম নিল 'আর প্রতিদান? কী প্রতিদান তোমাকে আমি দিনের পর দিন দিয়ে চলেছি, তা তুমি ভালোই জানো। আমি একইসঙ্গে আমার আর ত[illegible]র ঋণ শোধ দিয়ে গেছি অক্লান্তভাবে। কিন্তু....কিন্তু আজ আমি আলাদা। অন্যরকম। আর আমি কাউকে ভয় পাই না!'

বাবির মুখে অজানা অচেনা ভাঁজ পড়ল। চোখ ছোট হল। তার হাত খামচে ধরল মুন্নির শাড়ি। মোনালিসা ছিটকে কাছে চলে এল। বাবি জাপটে ধরল ওকে। অসুর-শক্তিতে মিশিয়ে নিল নিজের শরীরে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'এ-ফ্ল্যাট কার? আমার। ওই টিভি কার? আমার। ওই টেপরেকর্ডার, রেডিয়ো, টেলিফোন, ফার্নিচার কার? আমার, সব আমার।'

লালা জড়িয়ে গিয়েছিল বাবির জিভে। শরীরের সাত তারে টঙ্কার শুরু হয়েছে।

শুরু হয়েছে কামকেলি রাগের মূর্ছনা।

ঢোক গিলে আবার বলল বাবি, 'আমি না থাকলে না খেতে পেয়ে বারো বছর বয়েসেই তুমি মরে যেতে, মুন্নি। আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। তাই, এই শরীর কার? আমার! ঠোঁট, চোখ, নাক, বুক, মুখ—সব আমার!' টেনে-টেনে হাসল বাবি। যুদ্ধরত মোনালিসার গাল চাটতে শুরু করল, 'মুন্নি....মুন্নি....মুন্নি....।'

মোনালিসার প্রতিরোধ একে-একে শেষ হল। ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ও ভাবতে লাগল সম্রাটের কথা। সম্রাট, কেন তুমি এলে আমার জীবনে?

হঠাৎই হালকা শীতার্ত হাওয়া গায়ে কাঁটা তুলতেই মোনালিসা বুঝল ও নিরাবরণ হয়েছে, অতীত একযুগ ধরে যে-ইতিহাস রোজকার পুনরাবৃত্তিতে বাঁধা পড়েছে।

ওদের বিজড়িত শরীর দুটো লতিয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর। সাপটা ঠান্ডা দেহ নিয়ে চলে বেড়াতে লাগল মুন্নির শরীরের ভূগোলে—উপবনে। অবশেষে অরক্ষিত দুর্বলতম জায়গাটি বেছে নিয়ে বিষাক্ত ছোবল বসিয়ে দিল। কোনও ওঝা এ-বিষ নামাতে পারে না।

এমনসময় ঘরের টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল।

সাত পার্ক স্ট্রিট

রাস্তার চরিত্র এখন ত্রিমাত্রিক : নির্জন, শান্ত ও অন্ধকার। তবে নির্জন কিংবা অন্ধকার না থাকলেও আমার তরফ থেকে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু শান্ত না থাকলেই সেই অশান্তির মধ্যে আমাকে নাক গলাতে হয়। সেটাই আমার কাজ। আর আজ রাতে আমি অপরাজেয়, অসমসাহসী। কারণ, আজকের অভিনব দুপুর আমাকে পাগল করে তুলেছে।

মোনালিসার কাছ থেকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরে এসেছিলাম অফিসে। অফিস প্রায় খালি। শুধু একজন টাইপিস্ট ওভারটাইম করার জন্যে তৈরি হয়ে কাগজপত্র টেবিলে নিয়ে বসেছে। আর কাজে ব্যস্ত অপারেশান্‌স ম্যানেজার মনমোহন বোস, বিলাস পাকড়াশি, আর ইনভেস্টিগেশানের সত্যনাথ চক্রবর্তী। আমাকে দেখেই সত্যদা হেসে বললেন, 'ভায়া কি চাকরি-বাকরি ছেড়ে দেবে নাকি?'

আমাকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাতে দেখে আরও বললেন, 'বড়সাহেব বারতিনেক তোমার খোঁজ করেছেন। তারপর না পেয়ে কী একটা নোট রেখে গেছেন তোমার

টেবিলে।'

আমি নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। ম্যানেজার মনমোহন বোস আড়চোখে বারকয়েক মেপে নিয়েছেন আমাকে। ভারিক্কি, গোলগাল চেহারা। মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা যায় না। যেহেতু আমি, বিলাস পাকড়াশি আর অবিনাশ দত্ত রোজ নাইট ডিউটি করি, সেহেতু দিনেরবেলা অফিসে বসে যথেষ্ট স্বাধীনতা পাই আমরা। সুতরাং ওপরওয়ালাদের তেমন গুরুতর ভয়ের চোখে দেখি না।

টেবিলে বসে ইংরেজিতে টাইপ করা সংক্ষিপ্ত নোটটা পড়লাম। তার সারমর্ম হল, গতকালের তিন রাউন্ড গুলি চালানো নিয়ে লালবাজারের সঙ্গে খুব অপ্রীতিকর আলোচনা হয়ে গেছে সিবির। তাঁর জবাবদিহিতে ওরা তো সন্তুষ্ট হয়ইনি, বরং বলে গেছে, আমার মতো একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন লোককে কেন এ-বি-সি-তে পোষা হচ্ছে? সিবি কি জানেন না, পুলিশে থাকার সময় কী ধরনের বাজে রেকর্ড আমার ছিল? সুতরাং, অনেক আলোচনার পর সিবি নিরুপায় হয়ে ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন যে, আমাকে রাতের টহলে বেশ কয়েকদিন আর কোনও ফায়ারআর্মস দেওয়া হবে না। কারণ, পুলিশের চোখে আমি বিপজ্জনক।

নোট পড়া শেষ হতেই আমি তাকালাম মনমোহন বোসের দিকে। তিনিও আমার দিকে দেখছিলেন। হয়তো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন। বললেন, 'সেন, তুমি বরং আজ রাতে টহলে বেরিয়ো না। ক'টা দিন ছুটি নাও। আমি দত্তকে আজ থেকে তোমার জায়গায় দিয়ে দিয়েছি।'

বুঝলাম, বোসসাহেবও আমার কার্যকলাপকে খুব একটা ভালো চোখে দেখছেন না। না-দেখাটাই স্বাভাবিক। হয়তো আমার জন্যে কোম্পানির ক্ষতি হচ্ছে।

ঠিক করলাম, আজ রাতে তাহলে আর ডিউটিতে যাব না। মোনালিসার কথা ভেবেই কাটিয়ে দেব। এই মুহূর্তে খুব ইচ্ছে করছে ওর সঙ্গে কথা বলতে। এখন অফিস প্রায় খালি, সুতরাং এখান থেকেই একবার ফোন করে দেখা যাক। মোনালিসার ফোন নম্বর আজ জেনে নিয়েছি ওর কাছ থেকে।

নোটটাকে দুমড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলাম। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে কাগজের টুকরোয় লেখা ফোন নম্বর দেখে ডায়াল করতে শুরু করলাম। মোনালিসা এখন কী করছে কে জানে। আমার কথা ভাবছে না তো!

ও-প্রান্তে টেলিফোন বেজেই চলল, বেজেই চলল। আর আমার মুখ ক্রমশ থমথমে হয়ে উঠল। ওর কোনও বিপদ হয়নি তো? ফোন নামিয়ে রেখে দ্বিতীয়বার ডায়াল করলাম। ও-প্রান্ত নিরুত্তর। তৃতীয়বার। ফলাফল একই।

যখন মনমোহন বোসের দিকে ঘুরে তাকালাম, তখন বিলাস পাকড়াশি অফিস ছেড়ে বেরোতে যাচ্ছিল, হয়তো আমার মুখের চেহারা দেখেই থমকে গেল। বলল,

'সেন, কী ব্যাপার? এনি প্রবলেম?'

আমি বললাম, 'না, কিছু নয়।' তারপর ম্যানেজারের দিকে ফিরে 'বোসসাহেব, আমি রাতে বেরোব। রিভলভারের কোনও দরকার নেই।'

বিলাস পাকড়াশি ও মনমোহন বোসের অবাক নজরের সামনে দিয়ে আমি রওনা হলাম ভেতরে আর্মস সেকশানের দিকে।

দরজা বন্ধ। তালা লাগানো। রামকৃপাল নিজের কর্তব্য শেষ করে চলে গেছে। সুতরাং ঢুকে পড়লাম আর-আর সেকশানে।

ঘরটা পুরোনো নথিপত্রে বোঝাই। ফলে ধুলো এবং আরশোলা এই রাজ্যকে নিজেদের সুবিধেমতো ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ঘরের একটা কোণে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ভাঁড়ার। লোহার ফ্রেম, কাঠের বাটাম, ভাঙা চেয়ার, টুকিটাকি সবই এখানে আছে। নির্বিচারে ধুলোময় জিনিসগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে চললাম। যেটা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম মিনিটখানেকের মধ্যেই। হাত তিনেক লম্বা একটা মরচে পড়া লোহার রড। ইঞ্চি-দুয়েক মোটা। সেটা তুলে নিয়ে মুছে নিলাম। ওজনটা পরখ করে দেখলাম। প্রায় চার কেজি হবে। হয়তো দরকারের তুলনায় একটু বেশিই, কিন্তু আমি নিরুপায়। কিছু কাপড় ও দড়ি জোগাড় করে রডের একটা প্রান্তে হাতলের মাপে শক্ত করে জড়িয়ে নিলাম। তারপর সেটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরের অফিসে।

বিলাস পাকড়াশি চলে গেছে। সত্যদা যাওয়ার উপক্রম করছেন। আর বোসসাহেব এখনও কাজে ব্যস্ত। কিন্তু আমার হাতে বিচিত্র অস্ত্র দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন।

আমি ওঁর টেবিলের ওপর থেকে মরিস মাইনরের চাবিটা তুলে নিয়ে বললাম, 'আর আপনাদের লালবাজারে জবাবদিহি করতে হবে না।'

বোসসাহেব কোনও উত্তর দিলেন না।

সত্যনাথ আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'ভায়া, মাথা গরম কোরো না। এইজন্যেই তুমি পুলিশের চাকরিতে টিকতে পারোনি।'

আমি হেসে বললাম, 'সত্যদা, আমি কিন্তু একটুও মাথা গরম করিনি। কোম্পানির কাজ আমি ভালোবাসি, তাই রাতে বেরোচ্ছি। আর....' একটু থেমে 'আপনাদের উপদেশ দেওয়ার কথা, আপনারা দেবেন। আমার এক কান দিয়ে শুনে আর-এক কান দিয়ে বের করে দেওয়ার কথা, তাই দিচ্ছি।'

সত্যনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। ওঁর চোখের দৃষ্টিটা আমার পছন্দ হল না একটুও। তারপর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি অফিস ছেড়ে। মোনালিসা এখন কেমন আছে, ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে। মনে-মনে ঠিক করেছি, টহলে বেরিয়ে ওর জানলায় উঁকি দেব রাস্তা থেকে। দূর থেকে ছুড়ে দেব আমার ভালোবাসা ও

শুভেচ্ছা।

এখন সেই ইচ্ছেই সত্যি। আমার গাড়ি চুপচাপ ঢুকে পড়েছে মিডলটন রো-তে। গাড়ি থামিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মারলাম চারতলার বিশেষ ঘরটা লক্ষ করে। রাত এখন প্রায় এগারোটা, কিন্তু মোনালিসার ঘরে আলো জ্বলছে। দুটো ঘরেই। নিশ্চয়ই ও নিরাপদে আছে।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার এক পাগল-করা ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসল। চারতলার কল্পমানসী আমাকে সূর্যমন্দিরের চুম্বকের মতো টানছে। আর আমি এক অসহায় জাহাজ। চুম্বক-সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াতেই যার চরম তৃপ্তি। কিন্তু দাঁতে ঠোঁট চেপে আমি বসে রইলাম। ভাবতে লাগলাম এ-বি-সি-র আপ্তবাক্য মিশন ফার্স্ট, মিশন লাস্ট। এবং স্রেফ মনের জোরে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম পার্ক স্ট্রিটে। শুরু করলাম রাতের টহল। আজও গাড়িতে আমরা দুজন। আমি ও বীভৎস লোহার রডটা। পেছনের সিটে ওটা নিরীহভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে শুয়ে রয়েছে। প্রয়োজনে সক্রিয় হবে আশা করি।

ঘটনাটা আমার অনেকক্ষণ ধরে চোখে পড়লেও খেয়াল হল অনেক পরে। যত রাত বাড়ছে, রাস্তার প্রাইভেট কার ও ট্যাক্সির সংখ্যা ততই কমে আসছে সমানুপাতে। কিন্তু একটা বিশেষ ফিয়াট গাড়িকে মনে হল আমি যেন বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। কখনও ক্যামাক স্ট্রিটে। কখনও পার্ক হোটেলের সামনে। কখনও ফ্লুরিজের দরজায়। প্রথমে শুধু তার রংটাই চোখ টেনেছিল। কালো। এখন নম্বরটাও।

সুতরাং সচেতন হওয়ার পর ফিয়াট গাড়িটাকে আমি এ-বি-সি-র ক্লায়েন্টের লিস্টে ঢুকিয়ে নিলাম। বন্ধ দোকানপাট ছাড়াও ওটার দিকে নজর রাখতে লাগলাম।

নজরে-নজরে দৃষ্টি ক্লান্ত হল। সময় বয়ে গেল অনেক। তখন শুধু আমাদের দুটো গাড়িই বারবার পার্ক স্ট্রিট আর ক্যামাক স্ট্রিটে ঘোরাফেরা করছে। মনে পড়ল অপারেশান্স ম্যানেজার বোসসাহেবের কথা অবিনাশ দত্ত আজ থেকে আমার এলাকায় টহল দেবে। তা হলে কালো ফিয়াট গাড়িতে অবিনাশ দত্ত বসে নেই তো? আমাদের কোম্পানির গাড়ি চেনার উপায় নেই। বেশিরভাগ গাড়িই ভাড়ায় নেওয়া হয় এবং দ্রুত তাদের চেহারা ও চরিত্র বদল হয়। সেইমত, এই ফিয়াট গাড়িটা নতুন, ফলে অচেনা।

আমাদের এই ঘোরাফেরা ও লুকোচুরি চলার সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্যে আমার চোখে আটকে গেল।

পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের পাশেই বিশাল এক ফটোগ্রাফির দোকান 'ক্লোজআপ'। এই দোকান আমাদের সুরক্ষা-তালিকায় নথিভুক্ত। দোকানের সামনে বিরাট কাচের

শো-কেস। তাতে কোডাক কোম্পানির কয়েকটা প্রচার-চিত্র সাজানো। এ ছাড়াও কয়েকটা ক্যামেরা ও ফ্ল্যাশগান চোখে পড়ে। দোকানের দরজা ফুট-পাঁচেক চওড়া, রোলিং শাটারে বন্ধ। শাটারের ওপরে আগফা কোম্পানির বিজ্ঞাপন। কিন্তু শো-কেসটা অরক্ষিত, এবং কাচের দেওয়াল পেরিয়ে দোকানের ভেতরটা মোটামুটি দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় দোকানের ভেতর ও বাইরেটা অন্ধকার থাকে। ফুটপাথের কিনারায় বিশাল ঘন পাতার গাছ দাঁড়িয়ে থাকায় রাস্তার ভেপার ল্যাম্পের আলো যতটা উচিত ততটা পৌঁছয় না। এখন সেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। কারণ, দোকানের শো-কেসটা ভাঙা। ভেতরে একটা তীব্র অথচ শীর্ণ রশ্মি চলাফেরা করছে। আর কোনও কিছু ভাঙচুরের আবছা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ভেতর থেকে। সম্ভবত, 'ক্লোজআপ'কে কেউ ক্লোজ ডাউন করতে চলেছে।

টহল দেওয়ার সময় আমরা মাঝে-মাঝে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করে পাঁচ-দশমিনিটের বিশ্রাম নিই। এখন সেরকমই বিশ্রাম নিচ্ছিলাম ক্যামাক স্ট্রিটের কোণে এয়ার কন্ডিশনড্ মার্কেটের সামনে। তখনই ভাঙা কাচের ওপর আলোর ঝলকানিটা আমার নজরে পড়ে।

গাড়িটা চুপিসাড়ে নিয়ে এসে পার্ক করেছি রং সাইডে, পোস্ট অফিসের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি। লোহার রডটা তুলে নিয়েছি শক্ত হাতে। তারপর পা টিপে-টিপে গিয়ে দাঁড়িয়েছি ভাঙা কাচের সামনে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

দোকানের ভেতরে উষ্ণতা অনেক বেশি। শব্দও। কারণ, যে-দুরন্ত গতিতে জিনিসপত্র ভাঙচুর হচ্ছে, তাতে শব্দ এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক। এবং শব্দগুলো আসছে ভেতরের কোনও ঘর থেকে।

শো-কেস ডিঙিয়ে ঢুকতেই সেল্‌স কাউন্টার। তার পেছনে স্টুডিয়ো। অকুস্থল সেটাই। নিজেকে আড়াল রেখে উঁকি মারলাম ভেতরে। অনুপ্রবেশকারী দু-হাতে তার কাজ করে চলেছে। টর্চলাইটটা জ্বলন্ত অবস্থায় একটা টুলের ওপরে রাখা আছে। আর সে দু-হাতে প্রতিটি দামি জিনিস মাথার ওপরে তুলে আছাড় মারছে পায়ের কাছে। ক্যামেরা, হাই পাওয়ারের ল্যাম্প, আর্ক ল্যাম্প, স্ট্যান্ড, ফ্ল্যাশগান, এনলার্জার—সব। তারপর বুটসমেত পায়ের নিষ্ঠুর চাপে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে যথাসম্ভব। আলোছায়ার মধ্যে ডুবে থাকা লোকটা কি খোঁড়াচ্ছে? কাল রাতে একেই কি আমি গুলি করেছিলাম? অত চিন্তার সময় নেই। ক্লায়েন্টের স্বার্থরক্ষায় আমি সরাসরি লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন সে একটা আর্ক ল্যাম্প মাথার ওপরে তুলে ধরেছে আছাড় মারতে। আমাকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ল্যাম্পটা ছেড়ে দিয়ে ডানহাতটা ছুটে গেল প্যান্টের পকেট লক্ষ করে। কিন্তু আমি আর

দেরি করলাম না। প্রচণ্ড কৌণিক গতিবেগে বৃত্তাকার পথে লোহার রডটাকে দু-হাতে ঘুরিয়ে বিপুল ভরবেগ সঞ্চয় করে বসিয়ে দিলাম লোকটার কোমরে। এটা হল কালকের প্রথম লাথিটার বিনিময়ে। লোকটার শরীর ঝাঁকুনি খেয়ে সামনে দু-হাত এগিয়ে গেল। রড ও দেহের সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে অস্ফুট যন্ত্রণার চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। আমি রডটা তুলে নিয়ে এবারে আঘাত করলাম বুকের ওপর। দ্বিতীয় লাথির শোধ। ফলাফল হল প্রথম আঘাতের মতোই, তবে এবারে লোকটা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ছিটকে গেল পেছনে। পড়ে গেল ভাঙা জিনিসপত্রের ওপরে। সেকেন্ডকয়েক ধরে অগোছালো শব্দ হল একটা। হাঁপাতে-হাঁপাতে আমি জ্বলন্ত টর্চটা তুলে নিলাম টুলের ওপর থেকে। খুঁজতে লাগলাম আলোর সুইচ। খুঁজে পেলাম। আলো জ্বেলে দিলাম। এবারে লোকটাকে প্রয়োজন-মাফিক জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। যদি অবশ্য সে কথা বলতে পারার মতো শারীরিক অবস্থায় থাকে।

কিন্তু আমি ঘুরে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই অবিনাশ দত্ত লোকটার কপালে গুলি করল।

চাপা কালো প্যান্ট। ছাপা টেরিকটনের শার্ট। ঝাঁকড়া চুল। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। চাপদাড়ি। শৌখিন গোঁফ এবং ধূমায়িত আগ্নেয়াস্ত্র। সব মিলিয়ে এই হল অবিনাশ দত্ত। মধ্য কলকাতায় এ-বি-সি-র নৈশ অপারেটর। এখন দু-পা ফাঁক করে যুদ্ধের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে অহঙ্কারে। কারণ, এইমাত্র অচেনা আক্রমণকারীর হাত থেকে সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

'গুলি করলেন কেন, দত্ত?' আমি আহত গলায় জিগ্যেস করলাম। একটা উজ্জ্বল সূত্র নিভে গেল একটা গুলিতে। হয়তো এই লোকটার কাছ থেকে ওদের গোটা দলটার সন্ধান পাওয়া যেত। জানা যেত, দামি জিনিসপত্রগুলো চুরি না করে সে ভাঙচুর করছিল কেন। কিন্তু এখন সব শেষ।

অবিনাশ দত্ত অস্বস্তির ভঙ্গিতে হাসল। বলল, 'সেন, লোকটার ডানহাতটা খেয়াল করেছ? ও আর্মস বের করতে যাচ্ছিল। তোমাকে অ্যাটাক করতে—।'

আমি লোহার রডটা উঁচিয়ে দেখালাম। বললাম, 'এটার বাড়ি খাওয়ার পরেও?'

কারণ, আমি জানি, গুলিটা যখন কপালে লাগে, তখনই আততায়ী নিশ্চিত অজ্ঞান হয়ে গেছে রডের আঘাতে।

এগিয়ে গেলাম শিথিল মৃতদেহটার দিকে। রক্তে মুখ ভেসে গেছে। ফলে অবয়ব চেনা যায় না। চেহারা দেখে মনে হয়, বয়েস চল্লিশের এ-পিঠেই। পোশাক-আশাক অপরিষ্কার ও জীর্ণ। চোখদুটো অবাক হয়ে খোলা।

আমি দোকানের টেলিফোনটা খুঁজে বের করলাম। লালবাজারে খবর দিতে যাব,

অবিনাশ দত্ত এগিয়ে এল কাছে। বলল, 'রিসিভারটা আমাকে দাও। আজ অফিসিয়ালি এই এলাকায় আমার বিট পড়েছে। তোমার কথা জানতে পারলে পুলিশ জলঘোলা করতে পারে। তা ছাড়া, ওটার ব্যাপারেও...।' অবিনাশ দত্ত আঙুল তুলে আমার হাতের অস্ত্রটা দেখাল 'তুমি বরং চলে যাও, আমি সব দেখছি। দোকানের মালিককে খবরটা দিয়ে আগামীকাল আমাদের অফিসে আসতে বলব। তখন ইচ্ছে হলে তুমি কথা বোলো।'

রাজি হলাম। কাজের ব্যাপারে অবিনাশ দত্তের সঙ্গে আমার চাপা রেষারেষি থাকলেও এই মুহূর্তে সে যেন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। বিদায় নিয়ে রাস্তার দিকে রওনা হলাম। ভাঙা শো-কেস দিয়ে বাইরের রাস্তায় দাঁড় করানো দত্তর কালো ফিয়াট গাড়িটা চোখে পড়ছে। বেরোতে গিয়েও কী একটা মনে হতে থমকে দাঁড়ালাম। ফিরে এলাম স্টুডিয়োর ভেতরে। সোজা এগিয়ে গেলাম নিহত তস্কর-চূড়ামণির দিকে। ঝুঁকে পড়ে তার ডানহাতটা দেখলাম। শরীরের লাগোয়া পকেটের কাছাকাছি পড়ে আছে। অবিনাশ দত্ত তখন টেলিফোনে কথা বলতে-বলতে সামান্য বিস্মিত ভঙ্গিতে আমাকে দেখছে। আমি তখন মনোযোগ দিয়েছি লোকটার জামা-প্যান্টের পকেটের দিকে। এবং পরীক্ষা সফল হল। একটা নল-কাটা শটগান পাওয়া গেল ওর প্যান্টের পকেটে। তাতে গুলি ভরা। বন্দুকটা আবার পকেটে গুঁজে দিয়ে রওনা হলাম ভাঙা শো-কেসের দিকে। আমার ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে। মন বিষিয়ে উঠেছে। যেতে-যেতে দত্তকে লক্ষ করে বললাম, 'ওই বিপদের সময় লোকটা বোধহয় ভুলে গিয়েছিল সে ন্যাটা। কারণ, বন্দুকটা দেখলাম ওর বাঁ-পকেটে রয়েছে।' একটু থেমে আরও বললাম, 'বেকার আপনি গুলিটা খরচ করলেন।'

'নিয়তি কে রুখতে পারে!' উত্তর পেলাম।

চলে যাওয়ার মুহূর্তে জুনিও এই একই কথা বলেছিল। ওর চোখ সিক্ত, রক্তাক্ত। ঠোঁট ফোলা। গলা বুজে এসেছে। তবু জড়ানো গলায় ডুকরে উঠে বলেছে, 'আমি যাচ্ছি। নিয়তি কে রুখতে পারে!....জানো, সবচেয়ে অবাক লাগছে, এই ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তেও তোমাকে আমি ভালোবেসে চলেছি। আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি, সম্রাট। তুমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু—আবার তুমিই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। আমি তা কী করি...' ওর কান্নার ঢলে প্রকৃতি ডুবে গেছে, সেইসঙ্গে আমিও।

দোকানের বাইরে ঘন রাতের কোলে বেরিয়ে এলাম। আত্মসমর্পণ করলাম চাঁদের আলোর কাছে। বললাম, 'আমায় বন্দি করো।'

আট হসপিটাল রোড

আমার সামনে সূর্য, আর ডানপাশে অঙ্গাঙ্গী উজ্জ্বল চাঁদ : মোনালিসা। মাথার ওপরেও চাঁদ আর-একটা রয়েছে, তবে সে তুলনায় দীনহীন মলিন এবং পশ্চিমের আকাশে সূর্যদেবের আসন্ন ইচ্ছামৃত্যুর কারণেই দৃশ্যমান। আমার পাশটিতে যে-চাঁদ শরীর এলিয়ে বসে আছে, সে সূর্যকে ভয় পায় না। কাউকে না।

আমাদের মাথার ওপরে সবুজ, চারপাশে সবুজ, মনেও সবুজ। সবুজে-সবুজে আমরা ক্রীতদাসের মতো বন্দি। সামনেই মসৃণ রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে রেসকোর্স। এখন গোধূলি আলোয় সেই বিশাল শূন্য মাঠে এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডি চেতনা ভেসে বেড়াচ্ছে অদৃশ্য কুয়াশার মতো। ঘরমুখো পাখিরা গুঞ্জরনে ব্যস্ত। জ্বলন্ত হেডলাইট নিয়ে ছুটে যায় কোনও গাড়ি। কদাচিৎ হেঁটে যায় কোনও শ্রান্ত পথিক।

'সম্রাট....' মোনালিসা কথা বলে অস্ফুটে, 'সবরকম বিপদে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলো কেন?'

আমি ওর দিকে তাকালাম। ছায়া-ছায়া আঁধারে ও অস্পষ্ট। শুধু নাকের নথ চিকচিক করছে। জানি, ও গতকাল রাতের কথা বলতে চাইছে। কারণ, ওকে একটু আগেই সব খুলে বলেছি, আর তখনই জেনেছি কিছু-কিছু নতুন কথা। বিচ্ছিন্ন। অস্ফুট।

আজ সকালে অফিসে ঢুকতেই সিবির মুখোমুখি হয়েছি। অবিনাশ দত্ত, বিলাস পাকড়াশি আর নৃপতি বোস সিবিকে ঘিরে বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে। উত্তেজিতভাবে কিছু একটা বলছিলেন সিবি, আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, 'সেন, আমার ঘরে চলো, কথা আছে। মিস্টার দত্ত, আপনিও আসুন।' শেষের কথাটুকু অবিনাশ দত্তকে লক্ষ করে।

স্পষ্টই বুঝলাম, গতরাতের চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে এখন আমাদের আলোচনা হবে। হোক, আমার আপত্তি নেই। সুতরাং আমরা দুজনে অনুসরণ করলাম, সিবিকে।

সিবি প্রথমেই আমাকে স্নেহময় তিরস্কার করেছেন অস্ত্রহীনভাবে উপযাচক হয়ে টহলে বেরোনোর জন্যে। উত্তরে অবিনাশ দত্ত সামান্য রুক্ষভাবেই বলেছে, 'না, সেন নিরস্ত্র ছিল না। ওর হাতে একটা ভারী লোহার রড ছিল।' রডটা আমি আবার ফিরিয়ে রেখেছি আর. আর. সেকশানে।

আমি মিষ্টি করে হাসলাম। বললাম, 'সিবি, ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আত্মরক্ষার ষোলো আনা অধিকার আমার রয়েছে। তা ছাড়া, ওঁর চেহারা দশাসই—খালি হাতে থেকেও নিজেকে সুরক্ষিত বলে ভাবতে পারেন—' আঙুল তুলে অবিনাশ দত্তর দিকে দেখালাম। দত্ত হেসে ফেলল 'কিন্তু আমি, দুর্বল সম্রাট সেন, পুলিশে

চাকরি করার ফলে যার শত্রু সংখ্যা আকাশের তারার মতোই অগুনতি, নিজেকে নিরস্ত্র অবস্থায় রাখতে বড় অস্বস্তি বোধ করি। আমাকে ক্ষমা করুন এই অক্ষমতার জন্যে।' মাথা ঝোঁকালাম অভিবাদনের ভঙ্গিতে।

সিবি হালকা চালে হাত নাড়লেন। বললেন, 'এবার কাজের কথা শোনো। লালবাজার অলরেডি কেসটা টেকআপ করেছে। তদন্তে জানা গেছে, মৃত চোরটি হচ্ছে মল্লিকবাজার অঞ্চলের এক দাগি গুণ্ডা। ভাঙচুর কেন সে করছিল, তার কারণ এখনও তাঁরা জানতে পারেনি। আর ঘটনাস্থলে তুমি যে হাজির ছিলে, সে-কথা আমরা পুরোপুরি চেপে গেছি। বলেছি, শুধু দত্তই প্রেজেন্ট ছিল—।'

আমি অবিনাশ দত্তর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। হাতে হাত মিলল। রুক্ষ কর্কশ ও শক্তিময় অনুভূতি। বললাম ওকে, 'ধন্যবাদ। প্রাণ ও পুলিশি ঝামেলা থেকে বাঁচানোর জন্যে। জানেন তো, পুলিশ মহলের বড়কর্তারা কেউই আমাকে পছন্দ করেন না।'

'ফরগেট ইট, সেন।' অবিনাশ কাঁধ ঝাঁকাল। ওর জামার নীচে কেঁপে উঠল পেশিবহুল বুক। জানান দিল, আমরা আছি।

সিবি আবার আলোচনার খেই ধরলেন, 'দোকানের মালিকের নাম তরুণ চৌধুরী। ক্যামাক স্ট্রিটে থাকে। টেলিফোনে জেনেছি, সে লালবাজারে গিয়ে এজাহার ইত্যাদি ফেলেছে। এখন আমাদের এখানেই আসবে। কথা বলার সময় ইচ্ছে করলে তোমরা দুজনেই থাকতে পারো।'

আমরা নীরব সম্মতি জানিয়েছি।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হরিচরণ এসে খবর দিল, তরুণ চৌধুরী দেখা করতে এসেছেন।

আগন্তুককে দেখে আমি প্রথাগত ভঙ্গিতে চমকে উঠলাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে। লোকটার চেহারা ছিপছিপে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। চলাফেরায় ভীষণ ইতস্তত ভাব। ফরসা লম্বাটে মুখ। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ ঘন-ঘন কামড়ে ধরছে। ঝটকা মেরে ঘাড় ফিরিয়ে ক্রমান্বয়ে দেখছে আমাদের তিনজনের দিকে।

আমি সরাসরি তার চোখে চোখ রেখেছি একটা কথা জানতে সে আমাকে চিনতে পেরেছে কি না। প্রায় আট সেকেন্ড আমাদের স্থিরদৃষ্টি পরীক্ষা চলল। না, সে চিনতে পারেনি আমাকে। বুঝলাম, সেই রাতে মোনালিসার ফ্ল্যাটে ওঠার সিঁড়িতে যে সংঘর্ষ আমাদের হয়েছিল, সেটা তরুণ চৌধুরীর কাছে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত হওয়ায় সে আমাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু তরুণ চৌধুরী মোনালিসার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল কী দরকারে?

আলোচনার সময় আমি নীরব রইলাম। সিবি প্রধান বক্তা। অবিনাশ দত্ত বিশেষ-

বিশেষ সময়ে সিবির কথার প্রতিধ্বনি-যন্ত্র।

কথা বলার সময় তরুণ চৌধুরীর অস্বস্তি চরমে উঠল। চোখে-মুখে ধরণী-দ্বিধা-হও গোছের অভিব্যক্তি। এই আচরণের কারণ আমি কি না বলতে পারি না।

আলোচনায় প্রকাশ পেল, 'ক্লোজআপ' যথেষ্ট লাভজনক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু গতকালের ঘটনার পর, লাভজনক কেন, দোকানটাকে ক্ষতিজনক বললেও কম বলা হয়। কারণ, দোকানটা বিমা করা নেই এবং গতরাতের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ষাট হাজার টাকা। দু-হাতের ফাঁকে মাথা রেখে হঠাৎই বাচ্চাছেলের মতো ভেউভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে তরুণ চৌধুরী। বলেছে ভাঙা গলায়, 'আমি শেষ হয়ে গেলাম.....আমি শেষ হয়ে গেলাম....।'

অন্য কেউ এ-ধরনের আচরণ করলে আমি হয়তো মনে-মনে মন্তব্য করে বসতাম, 'ছেনালিপনা!' কিন্তু তরুণের স্বরে এমন একটা আর্তি ছিল, যার সঙ্গে বন্যার কবলে কিংবা যুদ্ধের বিধ্বংসী বিভীষিকায় সর্বহারা কোনও মানুষের হাহাকারের যথেষ্ট মিল রয়েছে। হঠাৎই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম বাইরে। সিবি আর দত্ত অবাক চোখে আমার দিকে একঝলক তাকাল।

বাইরের ঘরে এসে অফিসটাকে খুঁটিয়ে দেখলাম। সবই স্বাভাবিক। কারণ, চুরি, মৃত্যু কিংবা দুর্ঘটনা এ-বি-সি প্রোটেকশানের জীবনযাত্রার একটা অঙ্গ। লুণ্ঠিত তরুণ চৌধুরী অন্যান্য সহস্র লুণ্ঠিত মানুষের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। সে কোনও বিশেষ গুরুত্ব দাবি করতে পারে না।

রিসেপশানে বসা নমিতার কাছে এগিয়ে গেলাম। সবুজ পাড় লাল সিল্কের শাড়ি। তাতে শান্তির দূত অসংখ্য পারাবতের বিমূর্ত ছবি। যেন বলতে চাইছে, সাদা পায়রার ছবি এঁকে নিলেই শান্তি পাবে।

আমাকে দেখে টাইপ মেশিনে ঝুঁকে-বসে-থাকা নমিতা মুখ তুলল। বলল, 'ডিসটার্বড, বেবি?'

এরকম ঠাট্টা-রসিকতা ও মাঝে-মাঝেই করে থাকে আমার সঙ্গে। তবে ভীষণ চাপা গলায়। আমি চিন্তিত মুখে বললাম, 'সরি, নট ইন দ্য মুড। একটা টেলিফোন করব।'

ও বিনা বাক্যব্যয়ে রিসিভার তুলে দিল আমার হাতে।

মোনালিসাকে ফোন করলাম।

ফোন বেজেই চলল অক্লান্তভাবে। বিরামহীন যন্ত্রসঙ্গীতে ছন্দপতন ঘটিয়ে কোনও মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ বলে উঠল না, 'আমি মোনালিসা বলছি।'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

নমিতা অবাক চোখে আমাকে দেখল। বলল, 'মিস্টার সেন, কী ব্যাপার?'

'পারসোনাল।' ছোট্ট জবাব দিয়ে নিজের সিটে ফিরে গেলাম। চিন্তাকুলভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে বসতেই এতক্ষণ অধীর কৌতূহলী সত্যনাথ চক্রবর্তী জিগ্যেস করলেন, 'ভায়া, কী হয়েছে?'

ফিরে তাকালাম তাঁর দিকে। কৌতূহল চুঁইয়ে পড়ছে দু-চোখ দিয়ে। একমুহূর্ত ভাবলাম, যে-উত্তরটা মনে-মনে ভেবেছি সেটা বলব কি না। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে গম্ভীর মুখে বলেই ফেললাম, 'মশার পেটে হাতির বাচ্চা!'

বিলাস পাকড়াশি আর নৃপতি বোস হো হো করে হেসে উঠল।

....মোনালিসার হাসিতে চমক ভাঙল। ও বলল, 'কী ভাবছ, সম্রাট?'

আমি উত্তর না দিয়ে ওর মাথায় হাত রাখলাম। আলতো করে টেনে নিলাম কাঁধের ওপর। উচ্ছৃঙ্খল চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ মেলে নীরব রইলাম। তরুণ চৌধুরী মোনালিসার একমাত্র ভাই। ওর চেয়ে বয়েসে বছর-দুয়েকের ছোট। তরুণের আয় মোনালিসার একটা অবলম্বন ছিল। ওরা দুজনে মিলে গড়ে তুলেছিল পরস্পরের মেরুদণ্ড। কিন্তু সেই স্থিতিশীল স্তম্ভকে কেউ চুরমার করে দিয়েছে অকরুণ আঘাতে। একটু আগে যখন মোনালিসার ঠোঁট থেকে প্রস্ফুটিত হল এই তথ্যগুলো, তখন আমি স্থবির হয়ে গেছি। শুনেছি এক উপকারীর ইতিহাস। যে-উপকারী তার উপকারের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সমান প্রতিদান চায়। ও বলেনি সেই উপকারীর নাম। আমাকে অধৈর্য উত্তেজনা প্রকাশ করতে দেখে ও হেসে বলেছে, 'ভীষণ ছেলেমানুষ তুমি, সম্রাট।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে : 'তুমি যদি সেই লোকটা হতে....' প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘশ্বাস। যে-বাতাস সবকিছু বিষণ্ণ করে দেয়। সব আনন্দ-খুশি শুষে নেয় পলকে।

আমার সমস্ত প্রশ্ন ও কৌতূহলের উত্তরে মোনালিসা বারবারই বলেছে, 'আর একটু ধৈর্য ধরো। বলব, আজ রাতেই বলব।'

ঘড়িতে তখন ক'টা বেজেছিল জানি না। বাতাসে শীতের খোঁচা হঠাৎই আরও তীব্র হয়ে উঠতে আমরা সচেতন হয়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়ালাম সবুজ আসন ছেড়ে। পায়ে হেঁটে শুরু হল আমাদের পথ চলা। আমি চাই এ-পথ অনন্ত হোক। মনে-মনে কাতর প্রার্থনা জানালাম উপরওয়ালার কাছে, ঈশ্বর, আমার এই একটা কল্পনা অন্তত সত্যি হোক।'

ঈশ্বর আমাকে প্রবঞ্চিত করেননি।

ফেরার পথে হঠাৎই নামল বৃষ্টি। অথচ আকাশ কোনওরকম অগ্রিম আভাস দেয়নি। এই বৃষ্টি শীতের বন্ধু। শীতকে পাকাপাকি আসন করে দিতে যে প্রায় ফি

বছরই অভিভাবকের মতো দেখা দেয়। আমরা আশ্রয় নিলাম এক গাড়িবারান্দার নীচে। আমাদের নীরব কথোপকথন ক্রমেই বেগবতী হয়ে উঠেছে। ক্ষণস্থায়ী অতিথির মতো বৃষ্টি আকস্মিকভাবেই আবার বিদায় নিল। আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। ভিজে পথঘাট নির্জন।

মোনালিসার বাড়ির কাছে এসে থামলাম। লক্ষ করছিলাম, ওর মধ্যে এক অজানা লড়াই ক্রমশ ব্যাপক হয়ে ছুঁয়ে ফেলছে মুখের অভিব্যক্তি। হঠাৎই ও শাড়ির ভাঁজ থেকে লুকোনো একটা ক্যাসেট বের করে তুলে দিল আমার হাতে। থেমে-থেমে বলল, 'সম্রাট, আমি নিজের মারণ-ভোমরা তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। এই ক্যাসেটে রেকর্ড করা রয়েছে আমার ইতিহাস। আমি জানি, তোমার সঙ্গে আমার হয়তো আর দেখা হবে না। কারণ, এই ক্যাসেট বাজিয়ে শোনার পর তোমার স্বপ্ন ভেঙে যাবে, নেশা কেটে যাবে পলকে। কিন্তু তবু—।'

আমি ক্যাসেটটা ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ও বাধা দিল। বলল, 'ফেলো না, তোমার জন্যে অনেক না-বলা কথা বলেছি আমি। শুনো, প্লিজ।'

আমার হাত ওর হাতে বন্দি হল। আমার সব কৌতূহলের মৃত্যু হয়েছে এই অনুপলে। কোনও নগণ্য ক্যাসেটের বিনিময়ে মোনালিসাকে আমি হারাতে চাই না। কিন্তু ওর কথা যে আমি ফেলতেও পারি না। তখন আমি একান্ত অনুগত ও সম্মোহিত।

ক্যাসেটটা পকেটে রাখলাম। জনহীন পথে দাঁড়িয়ে আগামী সাক্ষাৎকারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিদায় নিলাম। বুঝলাম, এই মুহূর্তে ওকে দেখতে-দেখতে আমি আমার ইন্দ্রিয়ের ওপর সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলছি।

ও চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। মনে সুললিত ভাবনার মিছিল। মিছিলে দেখা যায় কল্পনার নানান রঙে রঙিন অনেক পতাকা। তাদের স্লোগান একটাই জীবনের অন্য নাম মোনালিসা চৌধুরী।

হঠাৎই আমার চোখ চলে গেল চারতলার জানলায়। এতক্ষণ কেন যে সেদিকে তাকাইনি সেটাই আশ্চর্য। অবাক নজরে দেখলাম, মোনালিসার ঘরে আলো জ্বলছে, এবং জানলার ঘষা কাচে কোনও পুরুষের বিকৃত কালো ছায়া নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ধৈর্যচ্যুত ক্ষুব্ধ কোনও পশু। কে লোকটা? রহস্যময় রবি?

ঠিক করলাম, ধর্মতলায় পৌঁছে কোনও ওষুধের দোকান থেকে মোনালিসাকে ফোন করব। একটা অজানা দুশ্চিন্তা কুসংস্কারের মতোই জাঁকিয়ে বসেছে আমার মনের গভীরে। শুনতে পেলাম পথ-চলা এক মাতালের বেসুরো গানের কলি, 'চাঁদ কো কেয়া মালুম চাহ্‌তা হ্যায় উসে কোই চকোর...।'

পকেটের ওপর হাত রেখে ক্যাসেটটা একবার অনুভব করলাম। তারপর

দ্রুতপায়ে রওনা হলাম ধর্মতলার দিকে। তখনই লক্ষ করলাম, চারতলার জানলার কাছে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী ছায়া মুখোমুখি হয়েছে।

এ লড়াই কি বাঁচার লড়াই? জানি না।

নয় মিডলটন রো

অন্তর্দৃশ্য

'কোথায় ছিলে?' বাঘ যদি কথা বলতে পারত, হয়তো এইরকম স্বরেই কথা বলত।

বসবার ঘরের টেবিলে মদের গেলাস, মদের বোতল, সিগারেটের টুকরোয় ঠাসা অ্যাশট্রে। পাশেই কার্পেটের ওপর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের মতো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জুতো, কোট, টাই। মৃতদেহগুলোর মালিক বসে আছে সোফায়। চোখ নেশায় ঝাপসা, ঠোঁটজোড়া চকচকে ও পিচ্ছিল—সম্ভবত মুখের লালায়।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেছে মোনালিসা। ফ্ল্যাটে ঢুকেছে। দরজা বন্ধ করেছে আবার এবং বাঘের মুখোমুখি হয়েছে। যে-বাঘ ক্ষুধার্ত, হিংস্র, লোভী ও সুষম চিন্তায় অক্ষম।

'কোথায় ছিলে?' মদের গ্লাস অভ্যস্ত হাতে উঠে এল ঠোঁটের কাছে। চুমুক পড়ল।

বেপরোয়া ঘোড়ার মতো কেশর ফুলিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াল মোনালিসা। ঠোঁট টিপে শক্ত করল চোয়ালের রেখা। সম্রাট সেন হাজির থাকলে হয়তো লক্ষ করত, দা ভিঞ্চির ছবির চারিত্রিক ছকের সঙ্গে ওর তফাত ক্রমশ বেড়ে উঠছে। মোনালিসাকে আর চেনা যাচ্ছে না।

অপরাধী নায়িকাকে উত্তরহীন দেখে গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর উঠে দাঁড়াল। অচেনা অতিথির মতো শিথিল অনিশ্চিত পা ফেলে মোনালিসার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল বাবি। আবার প্রশ্ন করল, 'কোথায় ছিলে, মুন্নি?' প্রশ্নের কাঠামো ও তীব্রতায় অধিকারীর সুর।

মোনালিসার স্থাণু ভঙ্গিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। ও বাবির পাশ কাটিয়ে রওনা হল শোওয়ার ঘরের দিকে। বাবির রাগ জান্তব আক্রোশে ফেটে পড়ল। একটা অদ্ভুত শব্দ করে সে খামচে ধরল পাশ-কাটিয়ে-চলে-যাওয়া মোনালিসার গোলাপি শাড়ির আঁচল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ঘৃণা-কুঞ্চিত মুখে শাড়ির অপর দিকটা ধরে সজোরে হ্যাঁচকা মেরেছে মোনালিসা। মাতাল পুরুষটার ক্ষমতা হয়তো কমে এসেছে, সেইসঙ্গে শক্তিও। ফলে, বাবির হাত থেকে ঝটকা মেরে ছুটে গেল শাড়ির আঁচল। সে ছিটকে পড়ে

গেল মেঝেতে। অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ বেরোল তার হিংস্র দাঁতের ফাঁক থেকে।

মোনালিসা আবার রওনা হয়েছে শোওয়ার ঘরের দিকে। বাবির উপস্থিতি ওর অনুভূতিতে কোনও আঁচড়ই কাটতে পারছে না আজ। ড্রেসিং টেবিলে পৌঁছে ও খুব স্বাভাবিকভাবে কানের দুলজোড়া খুলে ড্রয়ারে রাখল। মাথার ক্লিপে হাত পড়তেই আয়নার কাছে বাবিকে ও দেখতে পেল।

জামার বেশ কয়েকটা বোতাম খোলা, চুল এলোমেলো, হাত দুটো গোরিলার মতো ঝুলছে দু-পাশে। কাছে এগিয়ে এল। বলল ভারী গলায়, 'আমাকে তুমি আর ভালোবাসো না তাহলে? বলো?'

যুদ্ধের আক্রমণাত্মক ঢংটা সরে গিয়ে এখন সন্ধির সুর। হাঁটুগেড়ে ওর পিছনে এসে বসল।

ক্রমে নির্লিপ্ততার অদ্বিতীয় উদাহরণ হয়ে উঠছে মোনালিসা। ও মাথার ক্লিপ খুলল। আয়নায় নিজেকে দেখল। সম্রাট, সম্রাট, আমি তোমার সম্রাজ্ঞী। কিন্তু, কিন্তু, কাল তুমি আসবে তো? ওই কীটগ্রস্ত ক্যাসেটে আমার জীবনের গ্লানিময় ধারাবিবরণী শোনার পরেও আসবে তো?

ঠিক সেই মুহূর্তে বাবি পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরল আবেগময় আশ্লেষে। বলল, 'এখনও তোমার কীসের জোর, মুন্নি? তরুণ চৌধুরীর পয়সার জোর তো আর নেই। তার রুপোর হাবেলি আমি গুঁড়িয়ে পিষে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। কেন? শুধু তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে।' ঘুরে এসে মুন্নির মুখোমুখি হল বাবি 'এক যুগ ধরে ভালোবাসার কি কানাকড়িও দাম নেই? কী তোমাকে দিইনি আমি? সাধ-আহ্লাদ-অর্থ সব দিয়েছি। তোমার ভাইকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি নিজের পায়ে। তবু, তবু তুমি আমাকে রোজ-রোজ এভাবে ফিরিয়ে দেবে?' ওর দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল সে। ঠোঁট নিয়ে এল কাছে। ফিসফিস করে বলল, 'আই লাভ য়ু, ডার্লিং।' বাঘের দু-চোখ এখন গাভীর মতো সরল এবং সেই কাচের চোখে জল টলটল করছে।

দু-চোখ তীক্ষ্ণ করে একদলা থুতু শব্দ করে বাবির মুখের ওপর ছিটিয়ে দিল মোনালিসা। ঘেন্নায় ওর ঠোঁট বিকৃত হল। নজর স্থির বাবির বিস্মিত মুখে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বাবি হতচকিত, স্তম্ভিত। তার থুতু-মাখা চোখ-মুখের হাস্যকর অবস্থা দেখে হঠাৎই হেসে উঠল মোনালিসা। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বাঁকা তরোয়াল যেন ঝলসে উঠল। যে-মেয়ে যত সুন্দরী, তার বিদ্রূপ বোধহয় ততটাই ভয়ঙ্কর হয়। এক্ষেত্রেও হল।

খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়া মোনালিসার হাসি আচমকা স্তব্ধ হল বাবির প্রচণ্ড চড়ে। বাবির চোখে অপমানের শিখা লকলক করছে। মদের নেশা অথবা কামনা

এখন নির্বাসিত। বাঁ-হাতে মুখ মুছে নিল সে। এবং অশ্রু।

চড় মারার সঙ্গে-সঙ্গেই কোনও অভ্যস্ত যোদ্ধার মতো এক জোরালো ধাক্কায় হাঁটুগেড়ে বসা বাবিকে ড্রেসিং টেবিলের ওপর ছিটকে ফেলে দিয়েছে মোনালিসা। দ্বিতীয়বার থুতু ছিটিয়েছে তার গায়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, 'অনেক সহ্য করেছি, আর নয়...।'

বাবি নিজের পতন সামলাতে দু-দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং তার ডানহাতে ধরা পড়ছে ড্রেসিং টেবিলের একপাশে রাখা রজনীগন্ধায় শোভিত এক পেতলের ফুলদানি। অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা—সবরকম আবেগ শক্তি পৌঁছে দিল বাবির হাতে। অন্ধ আক্রোশে ফুলদানিটা শক্ত থাবায় আঁকড়ে ধরে সে উঠে দাঁড়াল। মোনালিসা তখন চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং, প্রথম আঘাতটা পড়ল ওর ব্রহ্মতালুতে। দ্বিতীয়, ডানকানের পিছনে। মোনালিসা একটা অপার্থিব চাপা শব্দ করে পা ভেঙে পড়ে গেল মাটিতে। বাবির ঠোঁটের কোণ ফেনিল। মাথার লম্বা-লম্বা চুল চলে এসেছে মুখ-চোখের ওপর। ভয়ঙ্কর অমানুষিক উন্মত্ততায় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম...অগুনতি আঘাত পরম্পরায় সে বসিয়ে দিল মোনালিসার মাথায়, মুখে, গায়ে।

মিনিট-দশেক পরে যখন সে হাঁপিয়ে পড়ল, তখন থামল। মোনালিসার মাথা এখন লালচে কাদায় মাখামাখি এক পিণ্ড। একটা অক্ষত চোখ বাঁ-গালের ওপর সরে এসেছে। শরীর নিস্পন্দ-অচঞ্চল। অকালমৃত্যু তার দায়িত্ব নিয়েছে।

বাবি পুরো দৃশ্যটা কিছুক্ষণ ধরে দেখল। তার চোখে আবার জল এসে গেল হঠাৎই। নিজের বাগানের প্রস্ফুটিত গোলাপ কেউ যদি হঠাৎই ছিঁড়ে ফেলে, পিষে ফ্যালে পায়ের তলায়, তা হলে বুকের ভেতরে যে-যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, এ-যন্ত্রণা অনেকটা সেইরকম।

রক্তাক্ত ফুলদানিটা বাবির হাত থেকে খসে পড়ল একসময়। সে অপলক চোখে দেখল রক্তের ছিটে বসানো গোলাপি শাড়িটা। শাড়িতে অর্ধ-আবৃত শরীরটা। হঠাৎই বাবির হাত-পা প্রচণ্ড আক্ষেপে কাঁপতে শুরু করল। সেই অবস্থাতেই বসবার ঘরে ফিরে এল সে। কোট-টাই-জুতো কাঁপা হাতে অতি কষ্টে পরে নিল আবার। মদের গ্লাস ও বোতল তুলে নিয়ে রওনা হল বাথরুমের দিকে।

জলের ঝাপটা দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। গ্লাস ও বোতল খালি করে ধুয়ে ফেলল ভালো করে। সাজিয়ে রাখল বাথরুমের তাকে। তারপর শোওয়ার ঘরে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরখ করল, তাকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে কি না। হাত-মুখ ভালো করে মুছে নিয়ে যখন সে বাথরুমের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবে বলে রওনা হচ্ছে, ঠিক তখনই শোওয়ার ঘরের টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল।

থমকে দাঁড়াল বাবি। কয়েক সেকেন্ড দ্বিধাগ্রস্ত রইল। তারপর কী ভেবে ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। শুনল কান পেতে। মাঝে-মাঝে আড়চোখে দেখতে লাগল মোনালিসার মৃতদেহের দিকে।

'হ্যালো, মোনালিসা?' উদগ্রীব প্রশ্ন ছুটে এল পরিবাহী তার বেয়ে।

বাবি নিরুত্তর। শুধু তার ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখনও তার হাঁপানি থামেনি।

'হ্যালো, কে? মোনালিসা?'

বাবি চুপ। কে এই অজানা টেলিফোনকারী পুরুষ? মুন্নির প্রেমিক? নাকি তরুণ?

'হ্যালো—।'

ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস একঘেয়েভাবে ও-প্রান্তের আকুল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলল। তারপর একসময় রিসিভার নামিয়ে রাখল বাবি। রওনা হল গোপন সিঁড়ির উদ্দেশে। যাওয়ার আগে মুন্নির দিকে ইচ্ছে করেই সে তাকাল না। আজ তার শোক-দিবস। ক্ষণিকের উত্তেজনায় যেন নিজেকেই চরম শাস্তি দিয়ে ফেলেছে সে। তার মনে পড়ল, এই ঘরে দাঁড়িয়ে এই প্রথম, নন্দিতার কথা।

বাথরুমের খিড়কি দরজা খুলতেই এক ঝলক হিমেল বাতাস বাবিকে অভ্যর্থনা জানাল।

থমথমে ধৈর্যশীল শ্বাস-প্রশ্বাস। এ ছাড়া কোনও শব্দ নেই ও-প্রান্ত থেকে।

তারপর হঠাৎই কেটে গেল টেলিফোনের লাইন। আমার বুকের ভেতর তুষার ধস নামল তৎক্ষণাৎ। একইসঙ্গে শুরু হল শব্দময় ভূমিকম্প। ধক...ধক... ধক...ধক। হৃৎপিণ্ড বেজে চলেছে উন্মত্ত লয়ে। কোথাও যেন প্রলয় শুরু হয়েছে।

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এলাম পলকে। টেলিফোন বাবদ একটা দু-টাকার নোট কাউন্টারের ওপর ছুড়ে দিয়ে ফেরত পয়সার জন্যে আর অপেক্ষা করলাম না। মোনালিসাকে এক্ষুনি একবার দেখতে চাই। আমার মনে নানান অশুভ আশঙ্কা ছায়া ফেলেছে। অবুঝ মন কোনওরকমেই শান্ত হতে চাইছে না।

একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম অত রাতেও। এবং রওনা হলাম মিডলটন রো-র দিকে।

মিনিট সাত-আটের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছলাম। ভাড়া মিটিয়ে তৎপর পায়ে ঢুকে পড়লাম সেকেলে বাড়ির ভেতরে। দ্রুতগতি চলচ্চিত্রের মতো একতলা, দোতলা, তিনতলা মিলিয়ে গেল পেছনে। এসে হাজির হলাম মোনালিসার ফ্ল্যাটের দরজায়। উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় আমি হাঁপাচ্ছি। দরজা বন্ধ। কী আছে ওই বন্ধ দরজার ও-

পিঠে?

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালাম। তারপর মনকে প্রস্তুত করে সামনে এগিয়ে গেলাম। নব ঘুরিয়ে চাপ দিলাম দরজায়। প্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটল—দরজা খুলল না। অতএব দরজায় একটা টোকা মারলাম। একবার...দুবার...তিনবার...চারবার। উত্তর নেই। সুতরাং দ্বিধা কাটিয়ে মোনালিসার নাম ধরে ডাকলাম বার-কয়েক।

কোনও সাড়া নেই তবুও।

অবাক হলাম শততমবার। কারণ, রাস্তা থেকে দেখেছি মোনালিসার ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিতে ভয় পেলাম। নীচের তলার ফ্ল্যাটগুলোর কোনও বাসিন্দা সচকিত হয়ে হাজির হতে পারে ঘটনাস্থলে। সেটা আমি চাই না।

অন্ধের মতো যখন পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি, তখন হঠাৎই মনে পড়ল পেছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়িটার কথা। অতএব যথা চিন্তা তথা কাজ। আমি আবার ছুটলাম।

এবারের অভ্যর্থনাও প্রত্যাশিত। অর্থাৎ, বাথরুমের পেছনের দরজাটা হাট করে খোলা। শোওয়ার ঘরের আলো ঠিকরে এসে পড়ছে মোজেকের টালি বসানো বাথরুমের পিচ্ছিল মেঝেতে। অন্ধকারের কোনও অংশে কল থেকে টপটপ শব্দে জল পড়ছে অবিরাম। বাথরুমে ঢুকে পড়তেই হালকাভাবে আমার নাকে এল মদের গন্ধ। কেউ কি মদ খাচ্ছে? কে, বাবি নয় তো? নাকি...?

শোওয়ার ঘরে পা দিতেই মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার মতো মোনালিসার ধ্বংসাবশেষ আমার নজরে পড়ল। আমি এক অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলাম। আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অনুভূতি, বিদ্রোহ করে উঠল। চোখ যা দেখল, তা সে বিশ্বাস করল না। মস্তিষ্ক যে-ইশারা পেল, তা সে বুঝতে চাইল না। মন যা অনুভব করল, তা সে কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু আমার সামনের ভাঙাচোরা শিল্পকলা তো বাস্তব। কোনও কালাপাহাড় তাকে ধ্বংস করেছে।

টের পাইনি কখন আমি খুব কাছে এগিয়ে গেছি। মদের গন্ধ মিলিয়ে গিয়ে এখন রক্তের আঁশটে গন্ধ রাজত্ব করছে।

আমি মোনালিসার মুখটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

চোখে জল এল অনেক দেরিতে। কারণ, ঘটনাকে বিশ্বাস করে উঠতেই তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। তারপর অশ্রু ও চিন্তার ধারা একইসঙ্গে আকুলভাবে বয়ে চলল। তাদের ওপর আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। হয়তো এইকারণেই জুনি আমাকে ঠাট্টা করে বলত, 'সেন্টিমেন্টাল যুবনেতা'। আমি কখনও সে-কথা অস্বীকার করিনি। আমি যে আবেগপ্রবণ—সে আমার দারুণ অহঙ্কার। কারণ, সত্যি মানুষের ভেতরে শুধু বিভিন্ন অনুভূতি আর আবেগ বাসা বেঁধে থাকে।

এরপর শুরু হল অনুসন্ধান।

তৃতীয় কোনও ব্যক্তি ঘরে হাজির না থাকলেও তার উপস্থিতির বেশ কিছু চিহ্নই নজরে পড়ল। রক্তাক্ত ফুলদানি, বাথরুমে সদ্য ধোওয়া বোতল ও গ্লাস। বসবার ঘরের সোফায় কোনও ভারী মানুষের বসার ছাপ। সিগারেটের গন্ধের ফিকে ইশারা। আর টেলিফোনে শোনা ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস।

কে ছিল এই ঘরে?

টেলিফোনটা ঠিক তখনই বেজে উঠল আমাকে চমকে দিয়ে।

এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম।

'হ্যালো, কে?'

ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন সোঁ-সোঁ ডাকে ঝড় তুলল আমার কানে। ও-প্রান্ত আর কোনও উত্তর দিল না। আমি চুপ করে শুনতে লাগলাম।

প্রায় দশ সেকেন্ড আমরা পরস্পরের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনলাম। তারপর ও-প্রান্ত টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

আমি ধৈর্যহারা হয়ে নিষ্ফল আক্রোশে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ছুটে বেড়ালাম বারবার। পুঙ্খানুপুঙ্খ-পর্যবেক্ষণে খুঁজে চললাম কোনও সূত্র, কোনও ইঙ্গিত। বিছানা উলটেপালটে তোলপাড় করলাম। তাতে পাওয়া গেল কয়েকটা পুরোনো খবরের কাগজ, মাথার ফিতে, কিছু টাকা, কয়েকটা বাদামি খাম। কাজের জিনিস কিছুই পেলাম না। ড্রেসিং টেবিলের সব ক'টা ড্রয়ারও ঘেঁটে ফেললাম, কিন্তু বৃথাই।

উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হল স্টিলের আলমারিটা তন্নতন্ন করে খোঁজার পর।

একটা বড়সড় শৌখিন অ্যালবাম পাওয়া গেল আলমারির তাকে। অ্যালবামটা খুলে ভীষণ অবাক হলাম। ভেতরের পাতাগুলোয় কোনও ফটো লাগানো নেই। অথচ কালো কাগজে আঠা দিয়ে লাগানো কর্নারগুলো দেখে বোঝা যায়, অ্যালবামের সব ক'টি পাতাতেই একসময় ফটো লাগানো ছিল।

এই বিচিত্র ঘটনার কারণ অনুমানের চেষ্টায় অ্যালবাম রেখে দিয়ে আলমারিটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করলাম আবার। অবশেষে পেলাম রহস্যের উত্তর।

একটা বড় বাদামি খামে সমস্ত ফটোগুলো পাওয়া গেল। তবে তার একটি বাদে বাকি সব ক'টি কুটিকুটি করে ছেঁড়া। ছেঁড়া ফটোর কুচিতে কখনও দেখা গেল মোনালিসার মুখের অংশ, কখনও প্রকৃতি, কখনও তরুণ চৌধুরী, কখনও ছোটবেলাকার ছবি—সঙ্গে সম্ভবত আত্মীয়-স্বজন, কখনও অপরিচিত মানুষেরা। কোনও ফটোতেই কারও স্পষ্ট মুখ ধরা পড়েনি। নিতান্ত জাতক্রোধ না থাকলে এত সময় ও তীব্রতা কেউ অপচয় করতে পারে না। যে-ছবিটি অক্ষত, সেটি মোনালিসা চৌধুরীর মোটামুটি সাম্প্রতিক ছবি। পুরোপুরি অক্ষত অবশ্য বলা যায় না, কারণ পোস্টকার্ড

সাইজের ছবিটা মাঝামাঝি ছিঁড়ে ফেলে আবার সেলোটেপ দিয়ে সযত্নে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফটোটা ওলটাতেই একটা লেখা চোখে পড়ল 'মুন্নিকে—বাবি'।

আমার কানের পরদায় কেউ ঢাক পিটিয়ে বিসর্জনের বাজনা বাজাতে লাগল। এই ছবিতে অজানা-অচেনা বাবির স্পর্শ ও চেতনা লেগে রয়েছে। আমি যেন এই ছবিটা ছুঁয়ে তার খুব কাছাকাছি চলে গেছি।

মোনালিসা একটা কারুকাজ করা শাড়ি পরে মরসুমি ফুল-ফোটা এক বাগানে দাঁড়িয়ে। সাদা-কালো ফটো, তবুও ওর অনাবিল সৌন্দর্য প্রকাশে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। ও হাসছে। হাতে একটা ফুলের গুচ্ছ। পটভূমিতে সেকেলে একটা একতলা বাগানবাড়ি। বাড়ির ছাদের পাঁচিলে একটি ডানাওলা দেবশিশুর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। শিশুর বাঁ-দিকের ডানার মাথা কিছুটা ভাঙা, এবং পায়ের কাছে লেখা, ১৯৩০—সম্ভবত, বাড়িটা যে-বছর তৈরি হয় সেই সাল।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর একসময় ওটা ঢুকিয়ে নিলাম পকেটে। আর তখনই হাতে ঠেকল মোনালিসার দেওয়া ক্যাসেটটা। ওটা ধীরে-ধীরে বের করে নিলাম। ছেঁড়া ফটোর কুচিতে ভরা খাম আবার আলমারিতে রেখে আলমারি বন্ধ করে দিলাম। আমার চোখ এই সুসজ্জিত বিলাসী ফ্ল্যাটে একটা টেপরেকর্ডারের সন্ধান করে চলল। অবশেষে পেয়েও গেল।

টেপরেকর্ডারটা ছিল বসবার ঘরে। টিভির পাশে। ওটায় লাগানো ক্যাসেটটা খুলে আমার হাতের ক্যাসেটটা লাগিয়ে দিলাম। পাওয়ার 'অন' করে বোতাম টিপে দিলাম। মোনালিসার দেওয়া ফিতে বাজতে শুরু করল। আমি একটা সোফায় বসে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। নগণ্য প্রতীক্ষার শেষে মানসপ্রিয়ার স্বর শোনা গেল। আমাকে সম্বোধন করেই তার আত্মজীবনীর সূত্রপাত।

'সম্রাট, নিশ্চয়ই ঘরে তুমি একা রয়েছ?'

হ্যাঁ, একা, ভীষণ একা।

'জানি না, যতটা শক্ত হয়ে নিজের কথা বলতে শুরু করেছি, ততটা আস্থা নিয়ে শেষ করতে পারব কি না। সম্রাট, আমার জীবনের শুরুটা খুব সাধারণ অথচ সুখের ছিল...।'

এক অচেনা কুয়াশার আবরণ ভেদ করে প্রতিটি তথ্য ক্রমে-ক্রমে গেঁথে যেতে লাগল আমার মনের ভেতরে। মোনালিসার মা তরুণ চৌধুরীর জন্মের সময় মারা যান। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। এ-দেশ থেকে ও-দেশে উড়ে বেড়াতেন প্রায়ই। হঠাৎই একদিন ঘটে গেল এক বিমান দুর্ঘটনা। তিনি মারা গেলেন। মোনালিসার বয়স তখন তেরো বছর। মামা-কাকারা বিপদে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু যখনই জানা গেল,

মোনালিসার বাবা হিমালয়সদৃশ ঋণ রেখে গেছেন তখনই তাঁদের পরোপকারের সংক্রামক ব্যাধি সেরে গেল আশ্চর্য দ্রুততায়। মোনালিসা আর ওর ছোটভাই তরুণ আবার হয়ে পড়ল স্বজনহীন। তখনই কোনও দেবদূতের মতো এসে আবির্ভূত হল বাবি। মোনালিসার বাবার ব্যবসায়ী বন্ধু। শুধু ব্যবসা ছাড়াও কিছুটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। মোনালিসাদের অচল গাড়িকে সচল করল বাবি একা। প্রথমে সে দেনা মেটাল। তারপর অপরিসীম ধৈর্য ও মমতায় মোনালিসা ও তরুণকে মানুষ করতে লাগল। তবে নানান কথায় এটা সে বুঝিয়ে দিত, মোনালিসা ও তরুণকে সে পুনর্জীবন দিয়েছে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির সে-ই একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

মোনালিসার যৌবন এল একদিন। প্রেমে পড়তেও দেরি হল না ওর। এবং সেই খবর একদিন বাবির কানে পৌঁছল। আর সেই রাতেই চরম শোধ নিল বাবি। মোনালিসাকে বুঝিয়ে দিল ওর শরীরের ওপর নিঃশর্ত অধিকার কার।

তরুণ চৌধুরী মুখচোরা সরল কিশোর। সে এই দুর্নীতির কথা জেনেও বিদ্রোহ করতে পারেনি। সাহস পায়নি। কারণ, বাবি বিরূপ হলে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। অতএব, প্রেম মুছে গেল মোনালিসার জীবন থেকে। বাবি একই ইতিহাসের আবর্তন ঘটিয়ে চলল।

ধীরে-ধীরে তরুণ চৌধুরী একটি ফোটোগ্রাফির দোকানের মালিক হয়ে প্রতিষ্ঠিত হল জীবনে। কিন্তু সে যখনই মোনালিসাকে বাবির কাছ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে, তখনই বাবি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এমনকী শেষ পর্যন্ত ওর দোকান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। আর মোনালিসাকে যখের ধনের মতো সর্বদা কুক্ষিগত করে আগলে রাখতে চেয়েছে। ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, প্রাচুর্য আর সুখের লালসায় ডুবিয়ে এক অদ্ভুত যন্ত্রণার আরকে ওকে সম্পৃক্ত করে রেখেছে বাবি।

অবশেষে নতুন এক দেবদূত হয়ে সম্রাট সেন এসে দেখা দিয়েছে ওর জীবনে। প্রথম দিন সম্রাট ওকে যে-দুজন গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, মোনালিসার স্থির বিশ্বাস, তারা ওকে আক্রমণ করেছিল বাবির নির্দেশে। মোনালিসার বাড়াবাড়ি যেন সীমাহীন হয়ে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে। আর বাবির পরিকল্পনাতেই মোনালিসা পায়ে হেঁটে সদর স্ট্রিট দিয়ে রওনা হয়েছিল।

সম্রাটকে পেয়ে মোনালিসার স্বপ্ন দেখা নতুন করে শুরু হল, কিন্তু বাবি যে এখনও ওকে গ্রাস করে চলেছে নিয়মিতভাবে। কবে সম্রাট এসে সেই অন্ধকারের দুর্গ চুরমার করে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তার মোনালিসাকে? এসব শোনার পর সে আসবে তো?

'....সম্রাট, তোমাকে সব বলতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে...' অনেকক্ষণ আগেই

কান্নায় বিকৃত হয়ে গেছে মোনালিসার কণ্ঠস্বর। সুর-তাল-লয়-ছন্দ সব কেটে গেছে 'জানি না, তুমি আর কখনও আমার সামনে আসবে কি না, ভালোবাসবে কি না আগের মতো। এখন তা হলে আসি? ঘুমিয়ে পড়ো, লক্ষ্মীটি! কাল ভোরে উঠে যেন আমার কথাই তোমার সবার আগে মনে পড়ে, কেমন?'

যন্ত্রের কণ্ঠস্বর শেষ হল। আমি বসে রইলাম আরও বহুক্ষণ। যদি তখন ওকে বাড়িতে ফিরতে না দিতাম? যদি নিয়ে যেতাম আমার কাছে? চিরকালের মতো? তা হলে ও—।

কল্পনায় যে-সমাধান সহজে পাওয়া যায় বাস্তবে সে অনেক দূরে। সুতরাং সোফা ছেড়ে উঠে টেপরেকর্ডার বন্ধ করে ক্যাসেটটা খুলে পকেটে রাখলাম। তারপর কী ভেবে এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে লালবাজারে ডায়াল করলাম। বললাম, 'হ্যালো, আমি একটা খুনের খবর দিতে চাই...।'

'নাম বলুন। কোত্থেকে বলছেন?' ও-প্রান্ত থেকে ক্লান্ত গতানুগতিক স্বর শোনা গেল।

'নাম জেনে লাভ নেই।' আমি বললাম, 'শুধু খুনের খবরটা লিখে নিন। মোনালিসা চৌধুরী নামে একটি মেয়ে...।'

ওর ফ্ল্যাট ছেড়ে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন দেওয়াল ঘড়িতে রাত বারোটার সংকেত আধঘণ্টার ওপর পুরোনো হয়ে গেছে।

দশ আকাশ পাতাল রোড

অন্তর্দৃশ্য

বিস্ময় ও অনুশোচনা বাবির মুখের চামড়ার পরতে-পরতে। মুন্নি নেই। এতদিনের সহচরী এক মুহূর্তের অপমান ও উত্তেজনার বশে বাবির জীবন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। শুধু রয়ে গেল ধারাবাহিক শরীর-সুখের স্মৃতি। কিন্তু আশঙ্কা ও আতঙ্ক বাবির ভাবনায় যে সামান্য জায়গা পায়নি, তা নয়। পুলিশ। তদন্ত। ফাঁসি। কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কেউ কি এতক্ষণে অবিষ্কার করে ফেলেছে মুন্নির মৃতদেহ?

মসৃণ বাঁক নিয়ে লোহার গেট পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল সবুজ অ্যাম্বাসাডার। গাড়ির পিছনের একমাত্র টেল লাইটটি যেন বলতে চাইছে, দ্যাখো, আমি একা।

একসময় গাড়িটা থামল। ততক্ষণে বাবি মোনালিসার ফ্ল্যাটে টেলিফোন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাইরের ঘরে পা ফেলতেই কানে এল অস্ফুট গুনগুন ঘুমপাড়ানি গানের কলি

আয় ঘুম, যায় ঘুম...। নন্দিতা গাইছে। স্বাভাবিকভাবেই পাপুর জন্য। সন্তর্পণে টেলিফোন তুলে নিয়ে মুখস্থ নম্বরটা ডায়াল করল বাবি। শুরু হল তার থমথমে অপেক্ষা।

ও-প্রান্তে কেউ টেলিফোন তুলে বলে উঠল, 'হ্যালো, কে?'

কে? কে তুমি? সদ্য গতি নেওয়া ট্রেনের মতো হৃৎপিণ্ডের দৌড় শুরু হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়। তারপর টেলিফোন নামিয়ে রাখে বাবি।

শোওয়ার ঘরে পা রাখতেই যেন অদৃশ্য কোনও কাচের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে থমকাল বাবি।

ঘরে উজ্জ্বল আলো। বিছানায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে পাপু। মুখে পুপসি বোতল। দুধ খাচ্ছে। আর আধো ঘুম আধো জাগরণের একটানা 'উ—উ' শব্দ বেরিয়ে আসছে ওর অস্বাভাবিক ঠোঁট চিরে। ওর শরীরের ওপর ঝুঁকে রয়েছে নন্দিতা। নিজে বসে আছে ইনভ্যালিড চেয়ারে। বাবির পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল। বলল, 'দ্যাখো না, গায়ে চাদর রাখতে চাইছে না। বলছে, গরম লাগছে।' পাপুকে দেখিয়ে অনুযোগ করল নন্দিতা।

পাপুকে দেখে বাবির শরীরটা কুঁকড়ে গেল। আর তখনই নন্দিতা একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। কারণ, বাবির চেহারা ও প্রথমে লক্ষ করেনি। এখন করছে। কোটের ফাঁক দিয়ে জামায় লেগে থাকা রক্তের ছিটেগুলো ও দেখতে পেয়েছে।

নন্দিতার উৎকট সাজগোজ করা মুখটা বিশ্রী দেখাল। ও চাপা চিৎকারে বলে উঠল, 'কী হয়েছে? কী করে এসেছ তুমি?'

বাবি কান্না-বিকৃত মুখে ওর কাছে এগিয়ে গেল। হাঁটুগেড়ে বসল। ওর কোলে মুখ গুঁজল। জড়ানো গলায় বলল, 'আমি ওকে খুন করে ফেলেছি। আমি ওকে শেষ করে দিয়েছি, নন্দিতা।'

নন্দিতা যেন নির্লিপ্ত পাথর হয়ে গেল পলকে। ঠান্ডা গলায় বলল, 'কেন, কী করেছিল মেয়েটা?' একটা চাপা মর্ষকামী আনন্দ কি ঢেউ তুলছে নন্দিতার বুকের ভেতরে?

'ও, ও, আমাকে ঠকিয়েছে। অন্য একটা ছেলেকে ও ভালোবাসে। ভালোবাসত।'

বাবির পিঠে আশ্বাসের হাত রাখল নন্দিতা। বলল সহজ স্বরে, 'ঠিকই করেছ। যারা অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ, তাদের চেয়ে ঘেন্নার লোক আর হয় না। তুমি কোনও অন্যায় করোনি, বাবি।'

এমনসময় হঠাৎই চিৎকার করে কেঁদে উঠল পাপু। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টায় ঘুরে গেল ওর তেরো বছরের শরীরটা। ও অভিব্যক্তিহীন চোখ খুলে তাকাল। যথাক্রমে দেখল বাবা ও মায়ের দিকে। তারপর মাকে উদ্দেশ করে বলল, 'মামণি,

আমাকে আদর করো।'

বাবি চমকে মুখ তুলে দেখল ছেলেকে। মস্তিষ্কের কোষ থেকে বিদ্বেষ তরঙ্গ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুতের মতো। বাবি লক্ষ করল, তেরো বছর বয়েসটা তার ছেলেকে বুদ্ধির দিক দিয়ে না পারলেও, শরীরটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

এগারো মিশন রো

যান্ত্রিক যুগের যান্ত্রিকতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে উদাসীন পৃথিবী আবার স্বাভাবিক। মোনালিসা চৌধুরী নামে কোনও যুবতীর না-থাকা কোনওরকম ছাপ ফেলতে পারেনি সেই পৃথিবীর বুকে। এ-বি-সি প্রোটেকশানও তার ব্যতিক্রম নয়। কারণ, মোনালিসা চৌধুরীকে রক্ষা করার দায়িত্বে ছিল না এ-বি-সি। তাই জ্বালা-ধরা চোখ নিয়ে অফিসে এসে সাজগোজ করা নমিতা বাসুকে দেখি আমি। দেখি পানাসক্ত সত্যনাথ চক্রবর্তীর টুকটুকে ঠোঁট। এবং কর্নেল বটব্যালের ভীম চুরুট—শোভা পাচ্ছে তাঁর রাজসিক ঠোঁটে।

গতকাল আমি অফ-ডিউটি ছিলাম। সুতরাং আমাকে দেখে রোজকার মতো সিবি বললেন না, 'ও-কে?' আমার অবিন্যস্ত বেশবাসের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে রইলেন।

আমি নিজের সিটে গিয়ে বসলাম শান্তভাবে। ভেতরের আলোড়ন কাউকে বুঝতে দিতে চাইলাম না। গতকালের ঘটনা মনে থাকায় সত্যনাথও কোনওরকম আলোচনা শুরু করলেন না।

বিলাস পাকড়াশি ও অবিনাশ দত্ত মনমোহন বোসের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। কথা শেষ করে অবিনাশ দত্ত উঠে এল আমার কাছে। বলল, 'সেন, আজ তোমাকে লালবাজারে একবার যেতে হবে।'

'সময় নেই।' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছি আমি।

দত্ত খানিকটা থতমত খেয়ে গেছে সেই অপ্রত্যাশিত উত্তরে। কিছুক্ষণ আমাকে পর্যবেক্ষণ করল ও। তারপর ধীর স্বরে বলল, 'সে তোমার যা ইচ্ছে।' একটু থেমে আবার যোগ করল 'কেন, কোনও রাজকাজে যাচ্ছ বুঝি?'

আমি উত্তর না দিয়ে সটান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম আর-আর সেকশানের দিকে।

জায়গামতো পৌঁছে দেখি, যার খোঁজে আমি এসেছি সে নিরীহ ভঙ্গিতে উপস্থিত কাপড়ের হাতল লাগানো আমার প্রিয় লোহার রড। ওটা তুলে নিয়ে ফিরে এলাম নিজের টেবিলে।

অবিনাশ দত্ত তখন নৃপতি বোসের সঙ্গে আগামী ঘোড়দৌড় নিয়ে কথা বলছিল, আমি তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঁ-হাতে টোকা দিলাম পিঠে। নৃপতি বোস অবাক হল। সেইসঙ্গে অফিসে হাজির আর সবাই। অবিনাশ দত্ত ঘুরে তাকাল আমার দিকে।

লোহার রড হাতে আমাকে নিশ্চয়ই খুব খারাপ দেখায়। তার ওপর এস-আই সম্রাট সেনের কুখ্যাতি যোগ করলে ব্যাপার-স্যাপার অনেক বেশি কুৎসিত হয়ে ওঠে। এখনও তাই হল।

আমি খুব শান্ত অচঞ্চল গলায় বললাম, 'দত্ত, আজ সত্যিই আমার রাজকাজ আছে।' আর হাতের লোহার রডটা ইশারায় দেখালাম 'এই হচ্ছে আমার রাজদণ্ড। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি—গত কয়েকদিন ধরে সস্তার ফাজলামি আমার ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না।'

অবিনাশ দত্তের প্রতিটি পেশি তৈরি হল। শক্তির অবরুদ্ধ তরঙ্গ খেলে গেল পেশি থেকে পেশিতে। আমি জানি, অন্য সময় হলে, অন্য কেউ হলে, ও হয়তো তার সামনের পাটির সব ক'টা দাঁত নামিয়ে দিত বীভৎস ঘুষিতে। কিন্তু এখন ও কিছুই করবে না। শুধু নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে যাবে। কারণ, ও জানে, ঘুষি সমেত হাত সামান্যতমও তোলামাত্র আমি হয়তো ওর মাথা চুরমার করে দেব।

কয়েকটা উৎকণ্ঠাময় বিপজ্জনক মুহূর্ত কেটে গেল। অবিনাশ দত্ত চেষ্টা করে হাসল। জড়ানো স্বরে অস্পষ্টভাবে কী একটা বলে চলে গেল নিজের টেবিলে। আমি চেয়ারে বসলাম গা এলিয়ে। অনুভব করলাম, পকেটে মোনালিসার ছবি ও কণ্ঠস্বর আমাকে খোঁচা দিচ্ছে।

মিনিট-দশেক পর একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখলাম। তারপর অসংখ্য অবাক চোখের সামনে লোহার রডটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম অফিস ছেড়ে। যাওয়ার সময় নমিতা আস্তে করে ডাকল আমাকে। থমকে দাঁড়ালাম।

'মিস্টার সেন, পারসোনাল ব্যাপার জানি, কিন্তু তবুও বলছি, টেক কেয়ার।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'নমিতা, তুমি খুব ভালো। তোমাকে মাঝে-মাঝে ভীষণ ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আই লাইক য়ু।'

ও অভিবাদন গ্রহণের স্মিত হাসি হাসল। প্রতিহাসি উপহার দিয়ে আমি বেরিয়ে

গলাম। এখন আমাকে ডানাকাটা পরির সন্ধানে বেরোতে হবে। কলকাতা শহরের এক থেকে তাকে আমি খুঁজে বের করবই।

১৯৩০ সালে তৈরি একটা প্রাচীন বাগানবাড়ি। এবং তার ছাদে বসানো দেবশিশুর বাঁ-দিকের ডানাটির মাথা কিছুটা ভাঙা। এরকম বাড়ি সচরাচর চোখে পড়ার নয়। সুতরাং খুঁজে আমাকে বের করতেই হবে। কারণ, এটাই হল মোনালিসার মৃত্যুর একমাত্র সূত্র। ভালোবাসা আর কর্তব্যের জালে আমি যে ওর আত্মার কাছে দায়বদ্ধ!

প্রভু দেবশিশু, তুমি দর্শন দিয়ে আমাকে করুণা করো। আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন যাত্রাপথ আলোকিত হোক তোমার আশীর্বাদে।

বারো **ধর্মতলা স্ট্রিট**

ডানাকাটা দেবদূতকে খুঁজে পেলাম তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়।

পড়ন্ত সূর্যের আলো তখন মিলিয়ে গেছে। লাল গোলাপের অসংখ্য পাপড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পশ্চিম আকাশে। এই সময়টায় দুর্লভ পুষ্পবৃষ্টি চেতনা আচ্ছন্ন করে দেয়। সুতরাং আচ্ছন্ন অবস্থাতেই অতি ধীরে ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে মৌলালির মোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। আকাশের পটভূমিতে দেবশিশুর ভাঙা ডানাটা কালো গভীর ছায়া হয়ে ধরা দিল হঠাৎই।

গাড়ি থামিয়ে ফেলেছি আমি। নেমে পড়েছি গাড়ি থেকে। অবাক চোখে দেখতে শুরু করলাম আকাশের দিকে তুলে ধরা ডানা দুটো। ডানদিকেরটা অক্ষত, বাঁ-দিকের ডানাটি সামান্য ভাঙা। মোনালিসার ছবিটা পকেট থেকে বের করে নিলাম।

বিশেষ বাড়িটা খুঁজে বের করার জন্যে মিশন রো-র একটা মোটর গ্যারেজ থেকে একটা সাদা ফিয়াট সেইদিনই ভাড়া নিয়েছি। কারণ, আমি জানতাম, আমার এই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কর্নেল বটব্যাল কোম্পানির গাড়ি ব্যবহার করতে দেবেন না। আর দিলেও সেটা অন্যায় হত। সুতরাং, রোজ আড়াইশো টাকা হিসেবে লাগাতার সাতদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে ফেলেছি গাড়িটা। আর আমার ছুটির দরখাস্তও সাতদিনের। আশা ছিল, সাতদিনের মধ্যে সেই বাড়িটা আমি খুঁজে পাব। মাত্র তিনদিনেই পেয়েছি।

রোজ ভোর ছ'টায় আমি বেরিয়ে পড়তাম গাড়ি নিয়ে। পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতাম কলকাতা শহরের আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে, রাজপথে। বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের কাছে দরবার করেছি। বাড়িটার বর্ণনা দিয়ে হদিস জানতে

চেয়েছি। শ্রমে-শ্রমে ক্লান্ত করে ফেলেছি চোখ দুটোকে। এ যেন মোনালিসার প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা। দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছি হোটেলে। তারপর আবার শুরু। সন্ধ্যার আঁধারের ছোঁয়ায় সমাপ্ত হয় সেই দিশেহারা ভ্রমণ। তখন ক্লান্ত শরীরে আমি গাড়ি নিয়ে ফিরে চলি বাড়ির দিকে, আর গাড়ির পেছনের সিটে শুয়ে থাকা লোহার রডটা নীরবে আমাকে প্রশ্ন করে, সম্রাট, আজও পেলে না? আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, না রে, আজও পেলাম না।

আজ এই কাল্পনিক ব্রাহ্মমুহূর্তে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবিষ্টের মতো চেয়ে আছি বিশাল বাগানবাড়িটার দিকে। মনে হচ্ছে, গঙ্গাস্নানের পর পূত-পবিত্র আমি প্রশান্ত হৃদয়ে এসে দাঁড়িয়েছি কোনও মন্দিরের দরজায়। মন্ত্রপাঠ ও পূজাসমাপনে আমি আমার অভীষ্ট বস্তু লাভ করব মোনালিসার হত্যাকারী।

আমার সামনে বিশাল লোহার গেট। আধখোলা। ভেতরে টানা চলে গেছে সুরকি ঢালা পথ। তার দু-পাশে মরসুমি ফুলের বাগান। আবেশ কাটিয়ে রাস্তা পার হয়ে আমি এগিয়ে গেলাম বাড়িটার দিকে। লোহার গেটের কাছে দাঁড়িয়েই ছাদের পাঁচিলে উৎকীর্ণ দেবশিশুর ঠিক নীচে '১৯৩০' লেখাটা আমার নজরে পড়ল। সেইসঙ্গে আরও দেখলাম বাড়ির সাজগোজের পারিপাটি চেহারা।

দরজার সামনে একটা ছোট গাড়িবারান্দা। তার দু-পাশে দেওয়ালে গাঁথা তিনটে তিনটে করে ছ'টা জানলা। ঘন নীল পরদায় ঢাকা সুচারুভাবে। জানলার নীচে ফুলের কেয়ারি। তাতে লাল, হলদে, বেগুনি, সবুজ—নানান ফুল হাসাহাসি করছে। বাগানের সবুজ ঘাসে বিষাদের ছায়া। কারণ, আকাশের রং এখন ধূসর ইস্পাতের মতো।

আমার গলা বুজে এল। জিভ বিস্বাদ। অশ্রু বিদ্রোহী। রাস্তা পার হয়ে ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। মোনালিসার ছবিটা পকেটে রেখে প্রতীক্ষায় রইলাম। এত তীব্র সাধনায় খুঁজে পাওয়া পরশপাথরকে আমি খুব সাবধানে ব্যবহার করতে চাই।

প্রতীক্ষার প্রতিটি পল-অনুপল আমি মোনালিসার কথা ভাবতে লাগলাম। আমাদের প্রথম দেখা, আলাপ, ভালোবাসা ও মোনালিসার নৃশংস মৃত্যু।

এইসব পবিত্র ভাবনার মাঝামাঝি অপবিত্র সবুজ অ্যাম্বাসাডারটা আমার নজরে পড়ল। রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে লোহার গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসায় গাড়ির ডানদিকের একমাত্র টেল লাইটের টকটকে লাল আলোটা যেন দাউদাউ করে জ্বলছে। আর কিছু ঠাহর করা যায় না।

গাড়িটা লোহার গেটের কাছে থামল। বার-দুয়েক হর্ন বাজাল অধৈর্যভাবে। একজন দারোয়ান এসে লোহার গেটের দুটো পাল্লাই হাট করে খুলে দিল। অপরাধী অ্যাম্বাসাডার ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। সুরকি ঢালা পথ ধরে রওনা হল বাড়ির দরজার দিকে।

ফিয়াট গাড়ির পেছনের সিট থেকে লোহার রডটা হাতে তুলে নিলাম।

আসন্ন কালবৈশাখীর পূর্বাভাসের মতো চারিদিক কী অদ্ভুত থমথমে! আমার মনেও কোনও দোলা নেই। সব ঢেউ থেমে গেছে কোন অদৃশ্য প্রাপ্তিতে।

বৃদ্ধের লাঠির মতো লোহার রডটাকে ব্যবহার করে রাস্তা পার হলাম। দ্বিতীয়বার এসে দাঁড়ালাম লোহার গেটের সামনে। লক্ষ করলাম, কাছাকাছি কেউ নেই। এবং ভেতরের বাগান ঢেকে গেছে কালো আঁধারে। শুধু জ্বলজ্বল করছে জানলার পরদা ও কাচ ভেদ করে ঠিকরে-আসা আলোগুলো।

নিঃসাড়ে গেট পেরিয়ে পা দিলাম সুরকির রাস্তায়। দ্রুত পায়ে রওনা হলাম বাড়ির দরজা লক্ষ করে।

গাড়িবারান্দার নীচে সবুজ অ্যাম্বাসাডারটা ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে। গাড়ির ভেতরে কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। অতএব গাড়িটা পেরিয়ে সিঁড়ির ধাপে উঠে বন্ধ দরজার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। দরজায় চাপ দিলাম। দরজা বন্ধ।

আমার ধৈর্য শেষ হয়ে গেল নিমেষে। ক্রোধের ধস নামল সহসা। গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'বাবি-ই-ই-ই-ই! বাবি-ই-ই-ই!'

ছমছমে প্রতিধ্বনি জন্ম নিল।

উত্তরে বাগানের দিক থেকে একজন দারোয়ান এসে হাজির হল। আমি তাকে কাছাকাছি এগিয়ে আসার সময় ও সুযোগ দিলাম। তারপর লোহার রডটা পলকে বসিয়ে দিলাম তার বাঁ-কাঁধে।

টুঁ শব্দ বেরোল না। শুধু যেন একটা চিনির বস্তা আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

আমি আবার ফিরে তাকালাম দরজার দিকে। দারোয়ানের শারীরিক অবস্থার হিসেব-নিকেশ করার সময় আমার হাতে নেই। এবং বলতে হবে, সময়মতোই মনোযোগ দিয়েছি সামনের দরজায়—কারণ, সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা খুলে গেল। দরজায় প্রকাশিত হল অবিনাশ দত্ত। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, প্রকাশিত হল ওর দুরন্ত স্বাস্থ্যময় বুকের কপাট।

লোহার রডটা আমার পায়ের সঙ্গে ঘেঁষে থাকায় সেটা অবিনাশ দত্তের নজরে পড়েনি। আর হয়তো সেই কারণেই ভীষণ অভদ্র এবং রুক্ষস্বরে ও বলে উঠল, 'কী চাই, সেন? পরের বাড়িতে এসে কী পাগলামি শুরু করেছ? জানোয়ারের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?'

গায়ে ছাইরঙা টেরিকটনের শার্ট। তার ওপরে কালো চেক। উদ্ধত স্বাস্থ্য শীতের পোশাককে পাত্তা দেয়নি। প্যান্টের রং সাদা। দু-পা ফাঁক করে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ও দাঁড়িয়ে।

আমি ওর অভদ্রতার উত্তর দিলাম লোহার রড দিয়ে। নীচ থেকে প্রচণ্ড বেগে

রডটাকে নিয়ে এলাম সামনে, ওপর দিকে।

লক্ষ্যভেদ হল স্বাভাবিকভাবেই। অবিনাশ দত্তের উরুসন্ধির সঙ্গে বীভৎস সংঘর্ষ হল লোহার রডটার। ও যন্ত্রণাবিকৃত মুখে ঝুঁকে এল সামনে। দুটো হাত ছিটকে গেল আহত জায়গা আগলাতে। আমি একটানে লোহার রডটা ফেরত নিলাম। ডানপায়ের লাথি চালিয়ে দিলাম ওর চোয়াড়ে মুখে। এইবার ও কাত হয়ে পড়ল মেঝেতে। এবং আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

অবিনাশ দত্ত টলতে-টলতে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছিল, আমি নির্বিকারভাবে রডের দ্বিতীয় আঘাত বসিয়ে দিলাম ওর পিঠে। হাড় ভেঙে যাওয়ার বিশ্রী শব্দ হল। কিন্তু আমি নিরুপায়। দত্ত আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে।

মোনালিসার ক্যাসেটে বাবির যে-পরিচয় পেয়েছি, তাতে অবিনাশ দত্তের বয়েসের সঙ্গে তার হিসেব মেলে না, কিন্তু বাস্তব সবসময়েই কল্পনার চেয়ে বেশি চমকপ্রদ।

হয়তো এই অবাক অবস্থায় থাকার দরুণ ভেতরের ঘর থেকে সামনে এসে হাজির হওয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি খেয়াল করিনি। তার পরনে ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট। মুখে বয়সের ভাঁজ। লোমশ ভুরু। চোখে যন্ত্রণা। চেহারায় পরিপাটি ছাপ। এই মুহূর্তে তার চোখে বিস্ময়।

তার পরনের পোশাক আমাকে পলকে বলে দিয়েছে, এই বাড়ির মালিক অবিনাশ দত্ত নয়, আটপৌরে পোশাক পরা এই মহান ব্যক্তি। বাবি।

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ফুসফুস অবাধ্য হয়ে ভারী হল। গলার ভেতরে একটা লোহার বল ওঠানামা করতে লাগল। আমি অবিশ্বাস ও আগুন দু-চোখের তারায় পরিপূর্ণ করে তাকে দেখতে লাগলাম। কয়েক পা এগিয়ে গেলাম সামনে। পকেট থেকে মোনালিসার জোড়া-দেওয়া ফটোটা বের করে বাঁ-হাতে তার হতভম্ব চেহারার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। কান্না চেপে কোনওরকমে ফিসফিস করে বললাম, 'বাবি, মিশন ফার্স্ট, মিশন লাস্ট।'

বিস্মিত হাত বাড়িয়ে কর্নেল বটব্যাল মোনালিসার ছবিটা নিলেন। দেখলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভেতরে এসো, সেন।'

আমি নির্লিপ্তভাবে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

আমরা এসে হাজির হলাম শোওয়ার ঘরে। ছিমছাম অথচ বিলাসী ঘর। সব জায়গাতেই অর্থ ও রুচির ছাপ। ঘরে কেউ নেই। আমার একটু আগের চেঁচামেচিতে কেউই বিচলিত হয়নি। অথবা সিবি বিচলিত হতে দেননি। একটা চেয়ার দেখিয়ে তিনি বললেন, 'বোসো, সেন—।'

আমি বসলাম।

হাতের ফটোটা দেখতে-দেখতে বিছানার ওপর বসলেন সিবি। অদ্ভুত চোখে দেখলেন আমাকে। অস্বস্তি আর দ্বিধার ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললেন, 'সেন, মোনালিসাকে আমি ভালোবাসতাম।'

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ, জানি।

'সেন, তুমি আমার ছেলের মতো—' কর্নেল বটব্যালের স্বর স্নেহসিক্ত, ধীর-স্থির, অচঞ্চল। যেন ভ্রূক্ষেপই নেই, বাইরের ঘরে ও দরজায় দু-দুটো সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে আছে। ফটোটা তাঁর ভোঁতা আঙুলের ফাঁকে আলতো করে ধরা : 'তোমাকে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। মুন্নিকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। তোমার চেয়েও অনেক বেশি। ওকে প্রায় একযুগ ধরে আমি সবকিছু দিয়ে ভালোবেসে এসেছি। ওর রূপে আমি মুগ্ধ, গুণেও মুগ্ধ ছিলাম....' চোখদুটো তাঁর দৃষ্টিহীন শূন্য হল 'আবার ওর অবহেলা এবং ঘৃণা দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। তুমি হয়তো সব ইতিহাস জানো না—।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম কর্নেলের কাছে। বাঁ-হাতের এক ঝটকায় মোনালিসাকে ছিনিয়ে নিলাম ওঁর হাত থেকে। বাঁ-হাতে, কারণ, আমার ডানহাতের লোহার রডটা যেন আমার হাতেরই বাড়তি অংশ।

ফটোটা পকেটে রাখলাম, এবং বের করে নিলাম মোনালিসার শেষ কথার ক্যাসেটটা। আমার চোখ চারপাশে চকিত তাকিয়ে একটা টেপরেকর্ডার খুঁজল।

'ওটা কী, সেন?'

আমি সিবির প্রশ্ন শুনতে পাইনি। তখনও টেপরেকর্ডার খুঁজে চলেছি।

শোওয়ার ঘরে না পেয়ে চলে এলাম বসবার ঘরে। কর্নেল বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

এবারে আমি রেকর্ডারটা খুঁজে পেলাম। মোনালিসার ক্যাসেট যন্ত্রে চাপিয়ে যন্ত্রটা চালু করতে মিনিটখানেকের বেশি লাগল না। এবং সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর শুরু হল

'সম্রাট, নিশ্চয়ই ঘরে তুমি একা রয়েছ? জানি না, ঘটনা শক্ত হয়ে...।'

না, ঘরে আমি একা নেই। অবিনাশ দত্তের সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে রয়েছে আশ্রয়হীন হয়ে। বাবি বসে আছে শ্রুতিপরিধির ভেতরে। তোমারই কণ্ঠস্বর ওর মহাতর্পণের মন্ত্র। মহানির্বাণের মন্ত্র।

টেপরেকর্ডারের শব্দ উঁচু গ্রামে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম শোওয়ার ঘরে। কর্নেল বটব্যাল একইভাবে বসে। তবে মোনালিসার কথার সরগমে তাঁর মুখে ধীরে-ধীরে এক সূক্ষ্ম যন্ত্রণার পরদা নেমে আসছে।

আমি আবার চেয়ারে গিয়ে বসলাম। এক ঐতিহাসিক জাদুতে সেই কণ্ঠস্বর আমাদের সম্মোহিত করে রাখল...।

'.....ঘুমিয়ে পড়ো, লক্ষ্মীটি। কাল ভোরে উঠে যেন আমার কথাই তোমার সবার আগে মনে পড়ে, কেমন?'

সম্মোহন কাটতে আরও কিছুটা সময় লাগল। তারপর কর্নেল বললেন, 'সেন, মুন্নির সঙ্গে তোমার পরিচয় মাত্র কয়েকদিনের। যে-জিনিসটা তোমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, তাকে ভালোবাসা বলা যায় না। বরং বলা যায়, একটা ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ মাত্র।'

সিবির কণ্ঠস্বর বহুক্ষণ আগেই বাবির মতো হয়ে গেছে। ভারী, কর্কশ ও জড়ানো। আমি চুপচাপ শুনতে লাগলাম।

এ যেন এক অগ্নিপরীক্ষা—শত সহস্র স্তোকবাক্য আমাকে প্রতিজ্ঞা থেকে টলাতে পারে কি না, আমার হিংসা স্তিমিত করতে পারে কি না।

'তুমি ওর জন্যে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছ, কতটুকু কষ্ট করেছ?' সিবির গলায় তাচ্ছিল্য ও অহঙ্কারের সুর 'আর আমি? আমি কখনও ভাবতে পারিনি, তোমার মতো একজন সুলভ যুবক মুন্নির কাছে অমন দামি হয়ে উঠতে পারে। আমি ভাবিনি—' নিস্ফল ক্ষোভে বিছানায় একটা ঘুষি মারলেন সিবি। ঠোঁট কামড়ে মাথা নিচু করে হয়তো কান্না চাপতে চাইলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে চললেন, 'আমি বুঝিয়েছি, ভয় দেখিয়েছি, কিন্তু কাজ হয়নি। ও অবাধ্য থেকেছে। আমি ওর ভাইকে সর্বস্বান্ত করতে লোক লাগিয়েছি। তুমি আচমকা সে-কাজে বাধা দিয়েছ। আমি সেটা টের পেয়ে অবিনাশ দত্তকে লাগিয়েছিলাম তোমার ওপর নজর রাখতে। তুমি সেই চোরকে কবজা করেছ, দত্ত প্রমাণ লোপাট করতে গুলি করেছে তাকে। তোমাকেও রুখতে কম চেষ্টা করিনি আমি। কারণ, মোনালিসা যে আমার জীবনে কী, তা তুমি জানো না।' মুখ তুলে উদভ্রান্ত চোখে তাকালেন সিবি, 'তুমি জানো, আমি কী নিয়ে বেঁচে আছি?' বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আমার কাছে এগিয়ে এলেন কয়েক পা। আমি শক্ত মুঠোয় লোহার রডটা চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে। সিবি বললেন, 'দেখবে এসো।'

আমরা ভেতরে দ্বিতীয় এক শোওয়ার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। আলো জ্বলছে। ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে এক উগ্র আধুনিকা উল বুনছেন, আর ঘরের অন্যপ্রান্তে দম দেওয়া টিনের রেলগাড়ি নিয়ে আকৃষ্ট একটি বছর বারো-তেরোর ছেলে। মাথাটা বীভৎস বড়, ঠোঁটের কোণ থেকে সূক্ষ্ম প্রপাতের মতো লালা গড়িয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখে মহিলা এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন আগেই আমার উপস্থিতি টের পেয়েছেন, কিন্তু এই প্রথম দেখে আশ্বস্ত হলেন। ছেলেটা হাঁ করে তাকাল,

বলল জড়ানো কচি স্বরে, 'কে বাপি, এতা কে?'

কর্নেল বটব্যাল কোনও উত্তর দিলেন না। জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রায় ছুটে গেলেন মহিলার কাছে। তাঁর পায়ের কাছের শাড়িটা মুঠো করে দলা পাকিয়ে আমাকে দেখালেন। কান্না-ভাঙা গলায় হাসলেন, বললেন, 'আমার বউ। জীবনে-মরণে সহধর্মিণী, সেন। যখন ওর এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তখন ওই হাবা হাফ-উইট ছেলেটা—' অদ্ভুত কিশোরটিকে দেখালেন সিবি '—নন্দিতার পেটের ভেতর ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই পরিহাস যে, মা-ও মরল না, ছেলেও মরল না। বেঁচে রইল। আর সেইসঙ্গে আমাকে করে দিল মরে-গিয়ে-বেঁচে-থাকা এক মানুষ।'

তেতো হাসলেন কর্নেল বটব্যাল 'শুনে নাটক মনে হলেও সব সত্যি, সেন, সব সত্যি। নন্দিতা আর পাপুর ভাঙাচোরা তছনছ জীবনে আমিই একমাত্র অবলম্বন। সেইজন্যেই মুন্নিকে হারিয়েও বেঁচে থেকে সব দুঃখ-কষ্ট সইতে হচ্ছে আমাকে—শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে। সামান্য উত্তেজনায় এক মুহূর্তের ভুল....' হঠাৎই থামলেন সিবি। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এমনসময় মহিলাটি চিৎকার করে উঠলেন তীব্র স্বরে। প্রাচীন বাগানবাড়ি কেঁপে উঠল। কিন্তু আমি এতটুকুও বিচলিত হলাম না। বুঝলাম, আমার হাতের লোহার রডটা তিনি এইমাত্র দেখতে পেয়েছেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে সিবি বললেন, 'নন্দিতা, নিজের কাজ করো। এ আমাদের দুজনের ব্যাপার—' আমার দিকে ইশারা করলেন কর্নেল।

ঘর ছেড়ে আমরা আবার ফিরে এলাম আগের জায়গায়।

'সেন, একে কি জীবন বলে? নন্দিতা আজ তেরো বছর ধরে পঙ্গু। ওই অ্যাক্সিডেন্টে ওর দুটো পা-ই কাটা গেছে.....' বাবির কণ্ঠস্বর বিস্বাদ হয়ে আসে। মুখের ভেতর থুতু জমে গিয়ে জড়ানো স্বর আরও জড়ানো হয়ে যায় : 'আর পাপু? পাপুকে কি মানুষ বলা যায়, সেন? এরপর—এরপর যদি আমি মুন্নিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই, তাহলে কি অন্যায় হবে, বলো? কী পাপ করেছি আমি?'

বুঝতে পারছি, ক্রমশ আমার প্রতিজ্ঞা দ্রবীভূত হচ্ছে। মন শিথিল হচ্ছে আবেগে। কর্নেল বটব্যাল ধীরে-ধীরে খুলে চলেছেন নিজের পরিত্রাণের দরজা। সুতরাং আমি প্রাণপণে ভাবতে শুরু করলাম মোনালিসার কথা।

কর্নেলের চাউনি অবিনাশ দত্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ওর উপস্থিতি আমাকে জানিয়ে দিল। আমি একইসঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম এবং রড চালালাম সজোরে।

আঘাতটা লাগল অবিনাশ দত্তের হাতে-ধরা চেয়ারে যেটা ও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অবলীলায় তুলে এনেছে। এবং হাজির হয়েছে শোওয়ার ঘরের দরজায়।

মানুষের জীবনীশক্তি যে সময়ে-সময়ে কিংবদন্তিসুলভ হয় তার প্রমাণ পেলাম দত্তকে দু-পায়ের ওপর খাড়া দেখে। এবং একইসঙ্গে আমার দ্রবীভূত প্রতিজ্ঞা আবার জমাট বাঁধল।

রডের আঘাতে চেয়ারের কাঠে ফাটল ধরল। সিবি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দত্ত, থামো! কী হচ্ছে!'

কিন্তু অবিনাশ দত্ত থামল না। আবার চেয়ার তুলল, এবং পলকে রড ঘুরিয়ে আমি ওর কোমরে বসিয়ে দিলাম। ও চেয়ার সমেত বেঁকে গেল। তারপর বাবির চোখের সামনে আমি ওর স্বাস্থ্য চৌচির করতে শুরু করলাম। ওর ছাইরঙা শার্টের কালো চেকের পাশে লাল চেকের জন্ম হল। সাদা প্যান্ট লাল হল। চাপদাড়ি রক্তাক্ত হল। কে বলে অবিনাশ দত্তের বিনাশ নেই!

আমি স্থির হলাম একসময়। মাথার চুল আমার কপালে রিফিউজি হয়ে বাসা বেঁধেছে। আমি হাপরের মতো শব্দ করে হাঁপাচ্ছি। লোহার রড দু-হাতের শক্ত মুঠোয় ধরা। গায়ের জামাটা দু-বগলের কাছে ছিঁড়ে গেছে।

'সেন, সেন!' ডেকে উঠলেন সিবি, 'তুমি কি ওকে খুন করে ফেলবে? করছ কী?'

আমি খুব শান্তভাবে তাঁর দিকে ঘুরে তাকালাম। নিস্পাপ হাসলাম। সিবি বুঝলেন, আমি নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছি। সিবি আমার কাছে আবার বাবি হয়ে গেছেন।

আমি কোনও কথা না বলে অবিনাশ দত্তকে ডিঙিয়ে ফিরে গেলাম বসবার ঘরে। টেপরেকর্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ক্যাসেটের টেপ ফুরিয়ে যেতেই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রেকর্ডার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। টেপটা রিওয়াইন্ড করে আবার চালু করলাম বোতাম টিপে। গমগম করে উঠল স্বপ্নময় কণ্ঠ

'সম্রাট, নিশ্চয়ই ঘরে তুমি...।'

আমি সিবির কাছে ফিরে এলাম। লোহার রডটা অনুভব করে অবাধ্য ভঙ্গিতে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। আমরা আবার মন্ত্রমুগ্ধ মোনালিসার জীবনকাহিনিতে। আমার চোখ অশ্রুময়। সিবি হয়তো ভাবলেন, আমি আবার শিথিল হচ্ছি। তবুও নিজের পরিণতির আতঙ্কে কান্না-ভাঙা গলায় বললেন, 'সেন, তোমার মনে কি এক বৃদ্ধের জন্যে কোনও দয়া নেই?'

সত্যিই সিবিকে এখন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মনে হচ্ছে। আমি ঝটকা মেরে ঘন-ঘন মাথা নাড়ালাম এপাশ-ওপাশ। না, নেই! মোনালিসা তো দয়া পায়নি।

'সেন, আমার পঙ্গু স্ত্রী। অসুস্থ ছেলে। আমি....আমিই ওদের একমাত্র অবলম্বন।' সিবির কথা হোঁচট খেয়ে যাচ্ছে বারবার 'আমাকে ছাড়া ওদের জীবন, ভবিষ্যৎ, আশ্রয় কিচ্ছু নেই। ওদের—ওদের জন্যে কি তোমার মনে কোনও করুণা নেই? সেন, বলো—।'

আমি ঝটকা মেরে ঘন-ঘন মাথা নাড়ালাম এপাশ-ওপাশ। না, নেই। মোনালিসা তো করুণা পায়নি।

'সেন, তুমি আমার ছেলের মতো। তোমাকে আমি ভালোবাসি। নন্দিতা, পাপু—ওরা তো তোমার কাছে কোনও অন্যায় করেনি?'

সিবির দেহে অবরুদ্ধ কাঁপুনি 'তা ছাড়া, একটা সামান্য মেয়ের জন্যে তুমি এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারো না। তোমার তো মায়া-মমতা-স্নেহ বলে কিছু আছে—।'

আমি ঝটকা মেরে ঘন-ঘন মাথা নাড়ালাম এপাশ-ওপাশ। না, নেই। মোনালিসা তো মায়া-মমতা-স্নেহ পায়নি।

'সেন, মুন্নিকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসতাম। ওর মৃত্যু আমাকে কম যন্ত্রণা দেয়নি। অনুশোচনা আর অপরাধবোধে আমার মন ক্ষতবিক্ষত। ছিন্নভিন্ন। আমি প্রতিটি মুহূর্তে আমার অন্যায়ের শাস্তি পাচ্ছি। আমি—আমাকে—' কান্না ভেসে উঠল কর্নেলের চোখে-মুখে-দেহে 'আমাকে—আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারো না? সেন, প্লিজ—।'

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। লোহার বল দামাল শিশুর মতো খেলা করছে শ্বাসনালীতে।

মোনালিসার সুরেলা মিষ্টি কণ্ঠ তখনও কথা বলে চলেছে। ও যেন এই পরিবেশে সশরীরে উপস্থিত। এবং এই নাটকের দর্শক।

আমার সত্তা দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে মানবিকতা, বিবেক। আর অন্যদিকে প্রতিশোধ ও প্রতিজ্ঞা।

আমি বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলাম। জোরে শ্বাস নিতে চাইলাম বুকভরে। তারপর ঝটকা মেরে ঘন-ঘন মাথা নাড়ালাম এপাশ-ওপাশ। কোনওরকমে কান্না ও দুঃখ মেশানো গলায় উচ্চারণ করলাম, 'না, ক্ষমা নেই। মোনালিসাকে কেউ ক্ষমা করেনি, বাবি।'

বিছানায় বসে দু-হাতে দু-পাশে ভর দিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদছেন সিবি। কিন্তু আমি কান পেতে মোনালিসাকে শুনছি। আর একইসঙ্গে চোখ দিয়ে লোহার রডটার দৈর্ঘ্য মেপে নিলাম। আরও মেপে নিলাম আমার কাছ থেকে সিবির দূরত্ব। হিসেব করে দেখলাম, আমাকে আরও একপা এগিয়ে যেতে হবে তাঁর দিকে।

আবার চোখের জল মুছে নিলাম। মোনালিসার ধারাবিবরণী শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

একসময় হঠাৎই একটা শব্দ পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি, ঘরের অন্য দরজায় পাপু ও নন্দিতা এসে হাজির হয়েছে। নিস্পলকে তাকিয়ে আছে আমার লাল চোখের

দিকে। হাতের লালচে রঙের দিকে। অবিনাশ দত্তের ধ্বংসস্তূপের দিকে।

দুজনেই নির্বাক। হয়তো পরিবেশ ও পরিস্থিতিই তার জন্যে দায়ী।

আমার মনে পড়ল জুনির কথা। এই অবস্থায় আমাকে দেখলে কী ভাবত ও? সেন্টিমেন্টাল যুবনেতা?

একইসঙ্গে তুলনামূলক বিচারের মতো মনে পড়ল মোনালিসার কথা। ও কী ভাবত এখন আমাকে দেখলে? দেবদূত?

'.....ঘুমিয়ে পড়ো, লক্ষ্মীটি। কাল ভোরে উঠে যেন আমার কথাই তোমার সবার আগে মনে পড়ে, কেমন?'

তর্পণের মন্ত্র শেষ হল। ক্ষমা নেই, মায়া-মমতা-স্নেহ নেই, করুণা নেই, দয়া নেই। শুধু প্রতিজ্ঞা বেঁচে আছে! প্রতিশোধ আছে।

মোনালিসা, আমি নিজের হাতে তোমার সব রক্ত মুছে দেব। ছিন্নভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়ে তোমাকে আবার প্রতিষ্ঠা করব এক অনন্ত শিল্পকলায়। হতভাগ্য দর্শক যে-শিল্পকলায় সম্মোহিত হয়। মগ্ন হয়। বিলীন হয়।

নতুন করে আমার ও সিবির দূরত্ব আবার মেপে নিলাম এবং জ্বালাধরা চোখ নিয়ে অবশিষ্ট এক পা এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। প্রমাণিত হল, আমার হিসেবে কোনও ভুল ছিল না। কারণ, ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের কুৎসিত শব্দে ঘরে উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠল।

আমার যুদ্ধ

এক

অন্ধকারে লেকের বুক চিরে একটা ছিপনৌকো এগিয়ে আসছিল। আমি সাঁতরে যত দূরে সরে যেতে চাইছি, নৌকোটা মুখ ঘুরিয়ে ঠিক আমাকে লক্ষ করেই এগিয়ে আসছে। নৌকোয় কে বা কারা বসে আছে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু অন্ধকারে ভেসে আসছে বইঠার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ।

দূরে অনেকগুলো আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। যেন দীপাবলির আলোকমালা। সেই আলো অন্ধকার লেকের জলে প্রতিফলিত হয়ে তৈরি হয়েছে নমনীয় আলোকস্তম্ভ। ওগুলো ভাঙছে, চুরছে, আবার তৈরি হচ্ছে। এক অদ্ভুত মোহময় নৃত্যকলা, নেশা ধরিয়ে দেয় যেন।

নৌকোটা আরও কাছে, খুব কাছে, এগিয়ে এল। আমি সাঁতার থামিয়ে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে ভিজে চুল ঝাড়লাম। হাত দিয়ে চুল সরিয়ে দিলাম চোখের ওপর থেকে। দুটো কালো ছায়া আমার স্পষ্ট নজরে পড়ল। এই প্রথম যেন টের পেলাম লেকের জল কী ঠান্ডা! হঠাৎই কাঁপুনি দিয়ে শীত করে উঠল। আর তখনই একটা ছায়া চলন্ত নৌকোর ওপরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আলোকমালার পটভূমিতে তার শরীরের রেখা ধরা পড়ল। ধরা পড়ল হাতের মোটা লাঠিটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা মেয়েলি চিৎকার শোনা গেল। এবং লাঠিটা আছড়ে পড়ল আমার খুব কাছে জলের ওপরে। কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতটা আর এড়াতে পারলাম না। মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা টের পেলাম। কী একটা নাম ধরে ডেকে চিৎকার করে উঠলাম গলা ফাটিয়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমটা ভেঙে গেল। শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে। আগুনের হলকা বেরোচ্ছে চোখ-মুখ থেকে। মনে হচ্ছে, সাহারায় শুয়ে আছি। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম? তাই যদি হবে তা হলে মাথার পিছনটা এখনও ব্যথা করছে কেন? হাত দিতেই টের পেলাম অসহ্য ব্যথা। ছোঁওয়া যাচ্ছে না।

এমনসময় ঘরের দরজায় কেউ ধাক্কা দিল। ডাকল, 'দাদা, দাদা! কী হয়েছে? দরজা খোল—।'

মিতা ডাকছে। ও আর মা পাশের ঘরে শোয়।

বিছানা ছেড়ে উঠলাম। শরীর চলছে না। লোহার পা নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই

দরজার কাছে গেলাম। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। চোখ কুঁচকে জড়ানো গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে? ডাকাডাকি করছিস কেন?'

তারপর দরজা খুলে দিলাম।

মিতা আমার মুখে কী যেন দেখল। বলল, 'কীরকম চেহারা হয়েছে তোর! ঘুমের মধ্যে ওরকম চিৎকার করছিলি কেন?'

আমি কোনও জবাব না দিয়ে ফিরে গিয়ে বিছানায় বসলাম। মিতাকে বললাম ভাবনার কোনও কারণ নেই। ও শুধু আমাকে যেন একগ্লাস জল গড়িয়ে দেয়।

ও জল এনে দিল। বহুদিনের পিপাসার্তের মতো ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলাম।

মিতা গলা নামিয়ে জিগ্যেস করল, 'স্বপ্ন দেখছিলি?'

আমি কিছু বলার আগে মা এসে ঘরে ঢুকল। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই মা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। তাই হয়তো দেরিতে ঘুম ভেঙেছে।

আমি ঘড়ি দেখলাম। রাত একটা কুড়ি।

মা বলল, 'রুণু কি স্বপ্ন দেখছিলি? আমাদের বল, তা হলে বাকি রাতটুকু ঠিকমতো ঘুমোতে পারবি।'

আমি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললাম সব। মাথাটা এখনও দপদপ করছে।

মা বলল, 'সত্যি তোর মাথা এখনও ব্যথা করছে? কই, দেখি, কোন জায়গাটায়?'

মাথা নিচু করে মাকে দেখালাম। মা শীর্ণ হাতটা বারকয়েক সেখানে বুলিয়ে দিল। তারপর জিগ্যেস করল, 'কখনও এখানে চোট পেয়েছিলি?'

আমি বললাম, 'না, মনে তো পড়ছে না।'

মা একটু চিন্তা করে বলল, 'ছোটবেলায়ও তো ওখানে কখনও সেরকম ব্যথা পাসনি...তা হলে হঠাৎ এরকম ব্যথা শুরু হল কেন?'

'সেটাই তো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মিতা চুপ করে আমাদের কথা শুনছিল। হঠাৎই ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দিল।

'দাদা, তুই কাল ডাক্তার দেখা।'

মা অন্যমনস্কভাবে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বলল, 'স্বপ্ন তো আমিও রোজ দেখি। ঘুমের ওষুধ খেলেও স্বপ্ন যায় না। সে যে কী কষ্ট!'

আমি জানি, মা রোজ রাতে বাবাকে স্বপ্নে দেখে। বাবা রেলের টি-টি ছিল। ট্রেন ডাকাতি রুখতে গিয়ে ছ'বছর আগে খুন হয় ডাকাতের হাতে। পুলিশ যখন বাড়িতে আসে তখন মা একা ছিল। ফলে মা একা গিয়েছিল বাবাকে শনাক্ত করতে। তারপর থেকেই বাবার মৃতদেহটা মায়ের চোখের সামনে সবসময় ভাসে—দিনেও, রাতেও।

'তুই শুয়ে পড়। দুশ্চিন্তা করিস না। তোকে কে মারতে আসবে!' এই কথা বলে মা আর মিতা চলে গেল।

কিন্তু চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে মা থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, রুণু, এই স্বপ্নটা তুই আগে কখনও দেখেছিলি?'

আমি জানি, সত্যি কথা বললে মা বাকি রাতটা ঘুমোতে পারবে না। তাই বললাম, 'না মা, এই প্রথম দেখলাম।'

ওরা চলে গেল। আমি উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। গ্লাসে কিছুটা জল ছিল। সেটা হাতে আঁজলা করে নিয়ে মাথায় দিলাম। আর তখনই টের পেলাম, ব্যথাটা একদম নেই। ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। রহস্যের কোনওরকম উত্তর না পেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম আসছিল না। স্বপ্নটার কথাই বারবার ভাবছি। স্বপ্নটা আজ নিয়ে বেশ কয়েকবার দেখলাম। প্রথম রাতে শুধু অন্ধকার লেকের জল দেখেছি আর ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ শুনেছি। দ্বিতীয়বার আলোর বিন্দুগুলো সঙ্গে যোগ হয়েছে। তারপর ধীরে-ধীরে যোগ হয়েছে আরও নতুন-নতুন টুকরো। নৌকো। ছায়ামূর্তি। লাঠি। আর আজ চিৎকার। মাথার ব্যথাটাও আজই প্রথম টের পেলাম। সত্যি, এ এক অদ্ভুত স্বপ্ন! এর মানে কী?

আমি সায়েন্স কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করি। দুঃস্বপ্নের কুসংস্কার আমাকে মানায় না। কিন্তু তবু যেন মনটা খচখচ করতে লাগল।

অন্ধকারে শুয়ে-শুয়েই কখন যেন ঘুম এসে গিয়েছিল।

পরপর কয়েক রাত একই ঘটনা ঘটল।

মিতার মুখে শুনলাম, আমি নাকি এমন চিৎকার করেছি যাতে মনে হয় প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও আতঙ্কে কোনও মৃত্যুপথযাত্রী আর্তনাদ করছে। মা কাঁদতে-কাঁদতে বারবার ডাক্তার দেখানোর কথা বলতে লাগল।

আমি ঠিক করলাম যে, আর নয়, এবারে সত্যিই ডাক্তার দেখানো দরকার। তাতে স্বপ্ন দূর হোক না হোক মাথার যন্ত্রণাটার তো একটা ব্যবস্থা হবে।

পরদিন সায়েন্স কলেজে গেলাম। একটা থেকে দুটো পর্যন্ত একটা ক্লাস ছিল। ভেবেছিলাম, ক্লাস শেষ করেই বেরিয়ে পড়ব। ধর্মতলায় ডক্টর প্রধানের চেম্বার আছে। আজ সোমবার, ওঁর বসার দিন। বাড়ির কারও কিছু হলে আমরা ওঁকেই দেখাই। খুব প্রয়োজন না হলে ওঁর বাড়িতে দেখাতে যাই না। আমাদের বাড়ি শ্যামবাজারে, আর ডক্টর প্রধানের বাড়ি যাদবপুরে। সুতরাং সায়েন্স কলেজ থেকেই টেলিফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হল না। কারণ, কলেজে ক্লাস নেওয়ার সময়ে একটা বিচিত্র ব্যাপার হল।

ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্স পড়াচ্ছিলাম। হঠাৎই চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। একটা মেয়েলি গলা তীব্রস্বরে কী যেন বলে উঠল। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ভাষাটা আমার অজানা-অচেনা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক অলৌকিক ক্ষমতায় আমি চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম। মেয়েটা কী যেন বলল, আমি আবার জবাব দিলাম। আর পরমুহূর্তেই চোখের সামনে থেকে অন্ধকার পরদাটা সরে গেল। দেখি, ক্লাসের ছেলেমেয়েরা গ্যালারি-বেঞ্চে বসে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। এবং আমার মাথার সেই জায়গাটা আবার ব্যথা করছে!

মাথায় হাত চেপে চেয়ারে বসে পড়লাম। চোখ বুজে রইলাম কিছুক্ষণ। একজন ছাত্রী জিগ্যেস করল, 'স্যার, শরীর খারাপ লাগছে?'

আমি কোনওরকমে বললাম, 'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ পর ব্যথাটা আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে গেল। তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, 'সরি, আজ আর ক্লাস নিতে পারছি না।'

তারপর ধীরে-ধীরে ক্লাসরুম ছেড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। মনে হচ্ছিল, টলে পড়ে যাব।

কোনওরকমে নিজের ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। পাখাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম।

একটু পরেই সুমন আর নন্দিতা আমার ঘরে এল। ওরা আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী। আমি এখন কেমন আছি তাই জানতে এসেছে। দরকার হলে ওরা আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমি বললাম, না, সেরকম কোনও প্রয়োজন নেই। একটু রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওরা চলে যাচ্ছিল, আমি আবার ডাকলাম। বললাম, 'বোসো, কথা আছে।'

ওরা বসল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ক্লাসে আমার ঠিক কী হয়েছিল বলবে? মানে, আমি ঠিক কী বলেছি বা করেছি আমার মনে নেই।'

দুজনেই ইতস্তত করছিল। আমি বারবার আশ্বাস দিয়ে নিঃসঙ্কোচে সব খুলে বলতে অনুরোধ করলাম।

তখন সুমন বলল, 'স্যার, আপনি পড়াতে-পড়াতে হঠাৎ যেন কার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলেন—।'

'রাগে আপনার চোখ-মুখ ফেটে পড়ছিল—,' নন্দিতা মুখ নামিয়ে যোগ করল।

আমি সামনে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলাম, 'শুধু আমিই কথা বলছিলাম? আর কারও গলা তোমরা শুনতে পাওনি?'

'না, স্যার। আপনি হাত-পা নেড়ে ভীষণ রেগে কাউকে কিছু একটা বলছিলেন।'

এ যেন ঠিক টেলিফোনের একপ্রান্তের কথা শোনার মতো! মেয়েটার গলা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি!

'আচ্ছা, কথাগুলো তোমাদের মনে আছে?'

ওরা দুজনেই বলল, 'না, স্যার। আপনি একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছিলেন। আমরা তার একবর্ণও বুঝতে পারিনি।'

আমি কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলাম। তারপর ওদের বললাম, 'ঠিক আছে, তোমরা এখন যাও। আর একটা রিকোয়েস্ট, আজকের এই ঘটনার কথা ডিপার্টমেন্টের কাউকে বোলো না।'

ওরা চলে গেল। তবে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অবাক চোখে আমাকে দেখছিল।

বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন ভালো করে বিকেল হয়নি। মা বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। ছোট ট্রানজিস্টর রেডিয়ো বালিশের পাশে বাজছে। গান-টান কিছু একটা হচ্ছে বোধহয়, ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। বিছানার মাথার দিকের একটা ছোট জানলা ছাড়া ঘরের আর সব জানলা-দরজা বন্ধ। ঘর আধো-অন্ধকার। শুধু খবরের কাগজ, মায়ের মুখের খানিকটা, আর পরনের সাদা থান আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

মা দুপুরে কখনও ঘুমোতে পারে না। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে বলল, 'কী রে, তাড়াতাড়ি চলে এলি! ডাক্তারের কাছে যাবি বলেছিলি যে—।'

'না, আজ আর যাব না, শরীরটা ভালো নেই।'

মা উদ্বেগে উঠে বসল 'কেন, কী হল আবার?'

'তেমন কিছু নয়। গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে, জ্বর আসবে হয়তো। মিতা এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি?'

'না। তুই এখন কিছু খাবি তো? চল, তোর খাবারটা বেড়ে দিই।'

'না, মা, ভালো লাগছে না। তুমি শুয়ে পড়ো। আমিও শুয়ে একটু বিশ্রাম নিই গিয়ে।'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, 'বড় হয়েছিস, যা ভালো বুঝিস কর। তোর জন্যে আমার বড় চিন্তা হয়।'

আমি ঘর ছেড়ে চলে এলাম। আসার আগে বাবার ফটোর দিকে একবার চোখ পড়ল। মায়ের বিছানার ঠিক মাথার কাছে একটা ছোট টেবিলে বসানো ফটোটা। সকাল-বিকেল মা ফটোর সামনে ধূপকাঠি জ্বেলে দেয়, অর্চনা করে।

উঠি। চোখের কোল বসে যাওয়া, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়া এই লোকটাই কি রণবীর চৌধুরী? মায়ের কথামতো রাতে ঘুমের ওষুধ খাওয়া শুরু করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিস্তার পাইনি।

মা বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে। শুধু আশঙ্কা-ভরা চোখ নিয়ে আমাকে দ্যাখে। আর উচ্ছল মিতার হাসি কোথায় মিলিয়ে গেছে।

আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল শক্তির ওপরে, জেসমিনের ওপরে, টমাসের ওপরে। আমি তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি! তা হলে শক্তি নামে রাগী মাতাল জুয়াড়ির ভূত আমার ঘাড়ে এরকম করে সওয়ার হয়েছে কেন? দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্তে আমি অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগলাম। স্বপ্নে দেখা জায়গাগুলো যদি অন্তত চিনতে পারতাম তা হলে সেখানে গিয়ে কিছু খোঁজখবর করা যেত। জায়গাগুলোর বর্ণনা দিয়ে সমীরকে বেশ কায়দা করে প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু ও ঠিকমতো কিছু বলতে পারেনি।

সুতরাং, রোববার বিকেলে যখন মিতার সঙ্গে বেরোলাম তখন মনের অবস্থা ভীষণ বিপর্যস্ত। মিতাও চুপচাপ ছিল। প্রয়োজনের বেশি একটা কথাও বলছিল না। আমার হাতে ক্যাসেট লাগানো টেপরেকর্ডার আর ছোট খাতাটা। ডক্টর এন. কে. সেন রমাদের বাড়িতেই থাকেন—আমহার্স্ট স্ট্রিটে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে।

একটা ট্যাক্সি ধরে মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

বেশ পুরনো বড়সড় বাড়ি। কার্নিশের খাঁজে-খাঁজে গোলা পায়রা বাসা বেঁধেছে। প্লাস্টার অনেক জায়গাতেই উঠে গেছে। বিশাল দরজার চৌকাঠ পেরোনোর সময়ে কেমন একটা ইতস্তত ভাব জেগে উঠল। কিন্তু মিতা দেখলাম অনেক সহজ হয়ে গেছে। এ-বাড়িতে ও অনেকবার এসেছে। তাই ঢুকেই রমার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

রমা আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। লক্ষ করছিলাম, শঙ্কা ও কৌতূহলের চোখে ও বারবারই আমাকে দেখছিল।

রমার মা-বাবা, কাকা-কাকিমার সঙ্গে আলাপ হল। কিন্তু পিসেমশাইকে তখনও দেখিনি। চা-জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন শেষ হলে রমা উঠে দাঁড়াল। মিতাকে বলল, 'তোরা একটু বোস, আমি পিসেমশাইকে তুরন্ত খবর দিয়ে আসি, তারপর তোদের নিয়ে যাব!'

আমরা ঘরে বসে রইলাম। মিতার কাছে জানলাম, নবকৃষ্ণ সেনকে অনাথ মেধাবী ছাত্র হিসেবে রমার ঠাকুরদা আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে বিদ্বান যুবকের সঙ্গে বড়মেয়ের বিয়ে দেন। রমার ওই একজনই পিসি, বছর-ছয়েক হল মারা গেছেন। আর নবকৃষ্ণ সেন প্রথম প্রবেশের পর থেকে এ-বাড়ির ছাদের আশ্রয় ছেড়ে কখনও কোথাও যাননি।

একটু পরে রমা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল।

দোতলার বারান্দার শেষ প্রান্তে কোণের দিকের ঘর। পশ্চিম দিক খোলা থাকায় আকাশ দেখা যাচ্ছে। সূর্য ডুবে গেছে এইমাত্র। আকাশ লাল।

নবকৃষ্ণ সেনের বয়েস আশির নীচে নয়। একগাদা কাগজপত্রের মাঝে ক্যাশবাক্স গোছের খাটো টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন। এককালের টকটকে ফরসা গায়ের রং বয়েস সামান্য মলিন। চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। চোখে চশমা। চশমার ডাঁটি থেকে সুতো ঝুলছে কানের পাশ দিয়ে। পিছনে দুটি তাকিয়া থাকা সত্ত্বেও নবকৃষ্ণ সেন ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন। মাথার পিছনে ছোট জানলা। জানলার পাশে ঝুলন্ত একটা ছোট্ট খাঁচায় একজোড়া বদ্রি পাখি চঞ্চলভাবে খেলা করছে।

ঘরের বাকি আসবাবপত্র বলতে চার দেওয়াল ঢাকা অসংখ্য বই। আর মেঝেতে বেশ বড় ফরাস পাতা।

আমরা তাঁর কাছাকাছি গিয়ে বসলাম। রমা বোধহয় আগেই সংক্ষেপে ব্যাপার-স্যাপার জানিয়ে রেখেছিল, কারণ পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতেই উনি ভরাট গলায় ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'টেপটা এনেছ?'

আমি বললাম, 'এনেছি। বাজাব?'

'বাজাও। রমা, বাতিটা জ্বেলে দে তো—।'

রমা উঠে গিয়ে সুইচ টিপল। ওঁর টেবিলের ওপরে ঝুলন্ত শেড দেওয়া একটা বাতি জ্বলে উঠল। উনি কাগজ নিয়ে কলম হাতে তুললেন। আমি টেপটা চালিয়ে দিলাম।

কুড়ি মিনিট আমরা চারজনেই চুপচাপ। টেপের কথা শেষ হতেই রেকর্ডার বন্ধ করে দিলাম।

ডক্টর সেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমি ছোট খাতাটা খুলে দেখতে লাগলাম।

উনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'ইন্ডিয়ান ট্রাইব্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ—।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'স্বপ্নের মধ্যে হরফগুলো কিন্তু ইংরেজি দেখেছিলাম।'

ডক্টর সেন আমার দিকে সরাসরি তাকালেন, 'ঠিকই দেখেছ। ইংলিশ অ্যালফ্যাবেটওয়ালা ট্রাইব্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে—।'

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। খাতার পাতা উলটে দেখে বললাম, 'সিম্ কথাটার মানে বলতে পারেন?'

'সিম্?' কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক শুনেছ, সিম্?'

দুই

স্বপ্নের বিষয়ে দুটো বই মিতা জোগাড় করে দিয়েছিল, কিন্তু সেগুলো পড়ে আমার জ্ঞান অনেক বাড়লেও সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। স্বপ্ন যেমন চলছে তেমনই চলছিল। তবে তার বিশেষ কোনও নিয়ম ছিল না। কোন দিন যে স্বপ্নের কোন অংশটা দেখা দেবে তারও কোনও ঠিক নেই। শুধু স্বপ্নের শেষে ওই অদ্ভুত মাথাব্যথার কোনও ব্যতিক্রম হত না। একটা ছোট খাতায় আমি স্বপ্নগুলো লিখে রাখতে শুরু করলাম। স্বপ্নের প্রতিটি দৃশ্য, খুঁটিনাটি—সব।

এর মধ্যে ক্লাসে আর-একবার বিব্রত হয়েছি। এবারের ঝগড়াটা ছিল আরও তীব্র, চলেছিলও বেশিক্ষণ ধরে। সুমনের কাছে খবর পেলাম যে, আমার 'অসুখের' ব্যাপারটা কী করে যেন সারা ডিপার্টমেন্টে ছড়িয়ে গেছে। এমনকী, ডিপার্টমেন্টাল হেডের কানেও কথাটা উঠেছে। খবরটা যে সত্যি সেটা বুঝলাম মঙ্গলবার বিকেলে। ডিপার্টমেন্টের হেড ডক্টর দাস আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি একসময়ে তাঁর ছাত্র ছিলাম।

ঘরে যেতেই ডক্টর দাস হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, 'এসো রণবীর, বোসো।'

তারপর বেল টিপে বেয়ারাকে চায়ের কথা বললেন।

ঘরে আর কেউ নেই। টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো। অ্যাশট্রে থেকে ধোঁয়া উঠছিল। হয়তো একটু আগেই কোনও সিগারেটের টুকরো ফেলা হয়েছে তাতে, কিন্তু সেটা ঠিকমতো নেভেনি। ডক্টর দাস চেন স্মোকার। তাঁর হাতে এখন নতুন সিগারেট।

আমি আমার এককালের মাস্টারমশাইকে দেখছিলাম। ঘটনার সঠিক কতটুকু শুনেছেন তিনি?

কালো ফ্রেমের চশমায় বারকতক হাত বুলিয়ে এবং সিগারেটে মুহুর্মুহু কয়েকটা টান দিয়ে আচমকা ডক্টর দাস কথা বললেন।

'রণবীর, তুমি একমাসের ছুটি নাও।'

'কিন্তু স্যার, ক্লাস...।'

'না, না, ও নিয়ে কোনও চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তোমার সাবজেক্ট তো একসময় আমিও পড়াতাম।' হেড হাসলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মুখটা সিরিয়াস করে বললেন, 'আমার যত অসুবিধেই হোক, তোমার অসুখের ব্যাপারটা তো আর অবহেলা করা যায় না। তা ছাড়া, মাস্টারমশাই হিসেবে তোমার সুনাম নষ্ট হোক তা-ও আমি চাই না। তুমি আমার প্রিয় ছাত্র ছিলে...।'

শুনতে ভালো না লাগলেও হেডের প্রস্তাবে যুক্তি আছে। সুতরাং বললাম, 'থ্যাংক

য়ু, স্যার। আমি তা হলে নেক্সট উইক থেকে একমাসের ছুটিতে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছেন, এমন একটা অসুবিধেয় পড়েছি যে...।'

'আরে না, না, আই ফিল ফর য়ু। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট।'

আমি উঠে চলে আসছিলাম, এমনসময় সুরেনদা চা নিয়ে ঢুকল। সুরেনদা ডিপার্টমেন্টের সাব-স্টাফ। সামনের বছর রিটায়ার করবে।

হেড বললেন, 'চা খেয়ে নাও। আর মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফ্যালো।'

সুতরাং পরদিনই ডক্টর প্রধানের কাছে গেলাম। এতদিন ভয়, আশঙ্কা, দ্বিধা ইত্যাদি নিয়ে গড়িমসি করে আর যাওয়া হয়নি।

ডক্টর প্রধান প্রবীণ ডাক্তার। আমাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে হরেকরকম প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কোনও উত্তরেই হালে পানি পেলেন বলে মনে হল না।

শেষে বললেন, 'দুটো ভিটামিন টনিক লিখে দিলাম, রেগুলার খাবে। আর-একটা পরামর্শ দিচ্ছি গোপনে—ব্রাহ্মী শাক ঘিয়ে ভেজে খাবে। আমিও খাই। মগজ ভালো থাকবে। আর শোনো, এখানে লিখে দিচ্ছি, মাথার একটা এক্স-রে করিয়ে নাও। ছবি নিয়ে নেক্সট বুধবারে এসো। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে লিখে রাখলাম। এরকম সময়ে এলেই হবে।'

ভিজিট দিয়ে বেরিয়ে আসছি, উনি হঠাৎ বললেন, 'কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট জানা-শোনা আছে?'

সব বুঝেও আমি বললাম, 'কেন?'

উনি সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'না, মানে, ঠিক প্রফেশন্যাল অ্যাডভাইসের কথা বলছি না, তবে যদি ফ্রেন্ডলি কোনও সাজেশান পাও তা হলে...ওয়েল, ইট মে হেল্প য়ু আ লট।'

আমি 'থ্যাংক য়ু' বলে তাঁর চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

বুধবার রাতে একটা নতুন স্বপ্ন দেখলাম।

চারিদিকে ঘন কুয়াশা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বেশ শীত করছে। একটা হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বেলে রাখা আছে পায়ের কাছে। আমার হাতে দশ-বারো ফুট লম্বা একটা লিকলিকে মুলি বাঁশের লাঠি। আমার পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেন্টের গন্ধ পাচ্ছি নাকে। কিন্তু কুয়াশায় মেয়েটির মুখ আবছা, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সামনের জমি সবুজ ঝোপঝাড়ে ঢাকা। ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেক নীচে। দূরে, ওপরে ও নীচে, আরও কয়েকটা আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে।

হঠাৎই বাতাস বইতে শুরু করল। আর তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝাঁকে-

ঝাঁকে পাখি উড়ে আসতে লাগল হ্যাজাকের আলো লক্ষ করে—ঠিক শ্যামাপোকার মতো। আমার পাশের তরুণী হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে উঠল, 'সিম্! সিম্!' জাতীয় কিছু একটা বলে। ওর শরীর আমার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমি হাতের লিকলিকে লাঠিটা সাঁই-সাঁই শব্দে পাগলের মতো বাতাসে ঘোরাচ্ছি। মনটা ভীষণ খুশি। অনেক পাখি এসে বসছে আলোর কাছে। কয়েকটা পাখি উড়ন্ত অবস্থায় লাঠির আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়ছে সামনের ঝোপে। মেয়েটি ছুটে গিয়ে টর্চের আলো জ্বেলে সেই পাখিগুলো খুঁজে নিয়ে আসছে ঝোপঝাড় থেকে। ওর পরনের পোশাকটা এবার স্পষ্ট দেখলাম, গোলাপী আর সাদা, অনেকটা হাঁটু পর্যন্ত গাউনের মতো। বুকের কাছে একটা ঘিয়ে রঙের সিল্কের কাপড়ের টুকরো জড়ানো।

আমার পায়ের কাছটা পাখিতে ভরে গেছে। রঙ-বেরঙের নানান পাখি। নাম জানি না কোনওটার। ওরা সম্মোহিতের মতো শূন্য চোখে আলোটা ঘিরে বসে রয়েছে। কেমন নির্বিকার, নির্লিপ্ত। আমার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটি খুব হাসছিল। হঠাৎই দু-হাতে আমাকে একেবারে জাপটে ধরল।

যথেষ্ট শীতের পোশাক থাকা সত্ত্বেও ওর নরম বুক আমাকে চঞ্চল করে তুলল। সেন্টের গন্ধটা আরও গাঢ় হয়ে নাকে আসছিল। দৃশ্যটা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে লাঠি ঘোরানোর সাঁই-সাঁই শব্দটা শোনা গেল।

পরদিন সকালে উঠেই 'সিম্' কথাটা ছোট খাতায় টুকে রাখলাম। আর সমীরের টেপরেকর্ডার প্লে-ব্যাক করে দেখি সেই মৃদুমন্দ নাসিকা-গর্জন। মিতাকে আর বলব না। কারণ, গত এক সপ্তাহ ধরেই সমীরের টেপরেকর্ডারের ফলাফল ওই নাসিকা-গর্জন। মিতা তো গত পরশু ফস্ করে বলেই বসল, 'দাদা, তোর স্বপ্ন-টপ্নের ব্যাপারগুলো সব ফল্স না তো? আমার এখন মনে হচ্ছে বিয়ে-টিয়ে দিলেই সব বোধহয় ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

মা আমাদের খেতে দিচ্ছিল। মিতাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তোর কি মুখে কিছুই আটকায় না? তা ছাড়া, রুণুকে তো আমি বলেইছি বিয়ের কথা। তোরা দুজনেই রোজ পড়তে পড়াতে বেরিয়ে যাস, আমার কি একা-একা বাড়িতে ভালো লাগে!'

আমি ভাতের গ্রাস মুখে দিয়েছিলাম। জড়ানো গলাতেই বললাম, 'না, মা, মিতু আগে এম. এ.টা পাশ করুক, তারপর ওসব ভাবা যাবে। দেখা যাবে বিয়েতে কার তাড়া আছে, ফিজিক্সের না পল সায়েন্সের—।'

আজ সকালে খেতে বসে মাকে আর মিতাকে একমাস ছুটি নেওয়ার ব্যাপারটা জানিয়েছি। গতকাল যে ডক্টর প্রধানের কাছে গিয়েছি সে-কথাও সংক্ষেপে বলেছি। আজকাল স্বপ্নের অসুখটা নিয়ে বেশি কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। একটুও না।

বৃহস্পতিবার রাতে দুটো স্বপ্ন দেখলাম। দুটোই নতুন। প্রথম স্বপ্নে দেখি আমি একটা সুন্দর সাজানো ঘরে চেয়ারে বসে আছি। পরনে শীতের পোশাক। ঘরের ছোট্ট ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। আমার হাতে একটা চটি বই। বইয়ের পাতা খোলা। আমি লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করছি। আর আমার ঠিক পাশটিতে বসে কেউ একজন আমাকে পড়াচ্ছে। আমি তার মিষ্টি স্বরের উচ্চারণগুলো শুনে-শুনে অনুকরণ করছি। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, বইয়ের লেখাগুলো সব ইংরেজি হরফের, অথচ তার একটি শব্দেরও অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া, উচ্চারণগুলো এত কঠিন যে, আমার অনভ্যস্ত জিভ থেকে বিচিত্র সব শব্দ বেরিয়ে আসছিল, এবং আমার পাশের মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠছিল বারবার।

চেনা সেন্টের গন্ধ নাকে আসছে। টের পাচ্ছি মেয়েটির শরীরের উত্তাপ। হঠাৎই ও এক ঝটকায় আমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল পাশের একটা খালি সোফায়। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে 'মাই সুইট ডার্লিং' বলে একেবারে ঠোঁটে গভীর চুমু খেল। আমার বেশ ভালো লাগছিল। এমনসময় দরজায় ঠকঠক করে কেউ শব্দ করল। ডাকল 'জেসমিন! জেসমিন!' বলে। তখনই বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো আমার মনে পড়ে গেল, মেয়েটির নাম জেসমিন, যুঁই। ও আমাকে ছেড়ে উঠে গেল দরজা খুলতে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখছি।

দরজায় দাঁড়িয়ে একজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ। জেসমিনের শরীর তাকে আড়াল করে থাকায় আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। শুধু বলিষ্ঠ হাত-পায়ের কিছু অংশ চোখে পড়ছে। লোকটা অনুনয় করে জেসমিনকে কী যেন বলছিল, আর জেসমিন ঠান্ডা গলায় কাঠ-কাঠ জবাব দিচ্ছিল। শেষপর্যন্ত ও লোকটার মুখের ওপরে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর আমার কাছে ফিরে এসে আবার জড়িয়ে ধরল আমাকে। ফায়ার প্লেসের আগুনের আলো জেসমিনের কালো চুলের ওপরে নাচছিল। আমি অস্ফুট স্বরে বারবার ওর সুন্দর নামটা গুনগুন করছিলাম।

এর পরেই দৃশ্যপট পালটে গেল।

দেখি জেসমিন এলোমেলো বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছে আর আমি প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছি। আমরা দুজনই নগ্ন। আমি মেঝেতে দাঁড়িয়ে শর্টস পরছিলাম। চোখ-মুখ দিয়ে রাগে আগুন বেরোচ্ছিল যেন। আমি চিৎকার করে কথা বলছিলাম। আর কী আশ্চর্য! ভাষাটা আমার ভীষণ চেনা। বাংলা।

'জানো না, কেন তোমাকে বিয়ে করেছি? তোমার টাকার জন্যে, আর ওই বডিটা হল ফাউ। তবে ওটাও আজকাল আমার কাছে অসহ্য। মনে হয়, একটা বুনো জানোয়ারের সঙ্গে শুয়ে আছি। এখন স্নান না করলে আমার বমি পাচ্ছে। ওয়াক-থুঃ...!'

আমি শব্দ করে মেঝেতে থুতু ফেললাম।

জেসমিন কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, শক্তি!'

ওর কথা কেমন আধো-আধো, ভাঙা-ভাঙা।

আমি এরপর অচেনা ভাষায় জবাব দিলাম। জেসমিনও কেঁদে-কেঁদে কীসব বলল। তারপর আমি ইংরেজি, বাংলা, আর ওই অদ্ভুত ভাষার এক জগাখিচুড়ি শুরু করলাম।

'তোমার ওই পোষা কুত্তা টমাসকে পাশের ঘর থেকে ডেকে নাও। শরীরে জ্বালা ধরলে ওকে দিয়ে মেটাও। ফিলদি ডার্টি হগ! এক্ষুনি স্নান করতে হবে....।'

জেসমিন ডুকরে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে। আমি দুম-দুম করে পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। শব্দ শুনে মেঝেটা কাঠের বলে মনে হল।

ঘর থেকে বেরিয়েই কার্পেট পাতা সরু করিডর। দেওয়ালগুলোও কাঠের। কয়েক পা পরেই বাথরুম। বাথরুমে ঢুকে কল খুলে দেখি জল নেই : না ঠান্ডা, না গরম। বাথটবে একটা লাথি মেরে করিডর ধরে বেরিয়ে এলাম বাইরের বারান্দায়। কী সুন্দর করে সাজানো জায়গাটা! কয়েকটা সুদৃশ্য কারুকাজ করা চেয়ার। একটা ছোট্ট টেবিল। অর্ধবৃত্তাকার বারান্দাটা ঠিক যেন জাহাজের ডেক। সুন্দর কাঠের রেলিং। ওপরে ঢালু কাঠের ছাদ। ছাদ থেকে রেলিংয়ের ওপরে ঝুলছে সূক্ষ্ম কাজ করা কাঠের ঝালর। সেখানে লাল-নীল টুনি লাইট জ্বলছে। বারান্দার সামনে খানিকটা জায়গা খোলা—রেলিং নেই। সেখান থেকে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে অন্ধকার লেকের জলে। সিঁড়ির ঠিক পাশেই বাঁধা রয়েছে একটা ছিপনৌকো, লেকের জলে ভাসছে, অল্প-অল্প দুলছে। দূরে চোখে পড়ছে আরও অনেক আলোর বিন্দু, যেন দীপাবলির আলোকমালা।

কেমন অবাক লাগল। আমাদের ঘরবাড়িগুলো কি লেকের ওপরে ভাসছে?

আমি লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জল কনকনে ঠান্ডা, কিন্তু আমার রাগ আর ঘেন্না তাকে ছাপিয়ে গেল। অন্ধকারে হাত টেনে-টেনে খুব ধীরে সাঁতার কাটতে লাগলাম। শরীরটা জুড়িয়ে যেতে লাগল। ছেড়ে-আসা ঘরের দিক থেকে উঁচু গলায় কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জেসমিন হয়তো ওর পোষা চাকর টমাসের সঙ্গে কথা বলছে। আমি সাঁতার কাটতে লাগলাম...।

একটু পরেই নৌকোটা আমি দেখতে পেলাম।

অন্ধকার লেকের জল কেটে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। নৌকোটা আরও কাছে, খুব কাছে, এগিয়ে এল। আমি সাঁতার থামিয়ে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে ভিজে চুল ঝাড়লাম। হাত দিয়ে চুল সরিয়ে দিলাম চোখের ওপর থেকে। নৌকোর ওপরে দুটো কালো ছায়া আমার স্পষ্ট নজরে পড়ল। এই

প্রথম যেন টের পেলাম লেকের জল কী ঠান্ডা! হঠাৎই কাঁপুনি দিয়ে শীত করে উঠল। আর তখনই একটা ছায়া চলন্ত নৌকোর ওপরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আলোকমালার পটভূমিতে তার শরীরের রেখা ধরা পড়ল। ধরা পড়ল হাতের মোটা লাঠিটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা মেয়েলি চিৎকার শোনা গেল। এবং লাঠিটা আছড়ে পড়ল আমার খুব কাছে জলের ওপরে। কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতটা আর এড়াতে পারলাম না। মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠলাম, 'জেসমিন! জেসমিন!'

নৌকোটা আমার আরও কাছে ঘেঁষে এল। টমাসের হাতে লাঠি। পিছনে বসে জেসমিন। হাতে বইঠা। মুখ ঝাপসা। চোখে জল। আমি অনুনয়ের গলায় বললাম, 'জেসমিন, জেসমিন, আমি...।'

ও সমস্ত জোর দিয়ে বইঠাটা বাতাসে ঘুরিয়ে বসিয়ে দিল আমার মাথায়—একবার, দু-বার।

আমি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম। নাকে-মুখে জল ঢুকে গেল। কপালে রক্ত গড়িয়ে চোখ ঝাপসা।

জেসমিন অচেনা ভাষায় কথা বলতে লাগল, কিন্তু ওর কথার অর্থ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম।

'শক্তি, তোমাকে ভালোবেসে আমি সমাজ ছেড়েছি, গাঁ ছেড়েছি। টাকা-পয়সা সব তোমাকে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তা-ও তুমি আমাকে এমন ঘেন্না করো? তুমি এত নোংরা! এত ইতর! তোমাকে বাঁচিয়ে রাখলে তুমি আরও দশটা মেয়ের সর্বনাশ করবে—।'

'জেসমিন!'

ও একটানে টমাসের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিল। এখন লক্ষ করলাম, ওটা লাঠি নয়, বর্শা। আত্মরক্ষার জন্যে টমাসের ঘরে রাখা ছিল। জেসমিন তৃতীয়বার আমাকে আঘাত করল। তারপর বর্শার ফলাটা আমার বুকে বিঁধিয়ে দিল।

ঠান্ডা জল আমার নাকে-মুখে ঢুকে পড়ছে। বুকে-মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। দম আটকে আসছে। আ—আঃ! জেসমিন, টমাস, ওদের নৌকোটা আমার চোখের সামনে ধীরে-ধীরে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন আমি ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছি। রীতিমতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সারা গায়ে ঘাম। মাথায় ছুঁচ ফোটানোর যন্ত্রণা।

এসব আমি কী দেখলাম! জেসমিন, টমাস, ওরা কে! কাকেই বা ওরা খুন করল অমন করে!

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু তবুও জোর করে স্বপ্নের বিবরণ লেখার ছোট খাতাটা বের করে কলম নিয়ে বসলাম। দুটো স্বপ্নেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এক্ষুনি লিখে রাখা দরকার।

আমার বেশ ভয় করতে লাগল। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে একটা কাহিনি কেউ যেন অমোঘ কৌশলে দ্রুত হাতে বুনে ফেলছে। শক্তি আর জেসমিনের কাহিনি। জেসমিন আর শক্তির কাহিনি। সঙ্গে টমাস।

সমীরের রেকর্ডারটা মাথার কাছেই ছিল। সেটা প্লে-ব্যাক করতেই বুকটা একেবারে ধড়াস করে উঠল।

প্রথমে খুব ক্ষীণ স্বরে বারকয়েক 'জেসমিন' নামটা শোনা গেল। তারপর...'জানো না, কেন তোমাকে বিয়ে করেছি! তোমার টাকার জন্যে, আর ওই বডিটা...।'

স্বপ্নের ঘোরে বলা আমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি চিৎকার ধরা পড়েছে টেপরেকর্ডারে। শুধু আমার কথাগুলোই, জেসমিনের নয়। তবে স্বপ্নগুলো এত জীবন্ত যে, স্মৃতি থেকে সমস্ত ঘটনা ও কথোপকথন খাতায় লিখে রাখতে কোনও অসুবিধে হল না। লিখতে-লিখতে আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছিল। স্বপ্নের শক্তি নামের লোকটাই কি আমি? আর জেসমিন তার বউ? স্বপ্নে যা দেখছি তাতে শক্তিকে খুন করেছে জেসমিন। কিন্তু কই, আমি তো দিব্যি বেঁচে রয়েছি। তা হলে কি, তা হলে কি...।

দরজায় ধাক্কা পড়ল। রেকর্ডার বন্ধ করলাম। খাতাটাও ঢুকিয়ে দিলাম বালিশের নীচে।

দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে? হয় মিতা, নয়তো মা।

উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি মিতা। আমাকে দেখে গলা নামিয়ে জানতে চাইল, 'দাদা, টেপ করেছিস?'

আমি অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। আমার জন্য কত ভাবে ও! আমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি, আর ও জেগে থাকে স্বপ্নের ঘোরে বলা আমার কথাগুলো শোনার জন্য। যদি তাতে রহস্যের কোনও সমাধান হয়।

আমি কিছুক্ষণ কী ভাবলাম। তারপর টেপ চালিয়ে ওকে সব শোনালাম। ছোট খাতাটাও বের করে পড়তে দিলাম। এটার কথা ও আগে জানত না।

ওর পড়া শেষ হলে বললাম, 'আমাকে রমার পিসেমশাইয়ের কাছে নিয়ে যাবি? যদি উনি ওই অদ্ভুত ভাষাটার কোনও হদিস দিতে পারেন...।'

মিতা মুখ নামিয়ে চিন্তিত গলায় বলল, 'রোববার দিন চল। আমি কাল রমাকে বলে রাখব।'

আমি ওর কাছে একগ্লাস জল খেতে চাইলাম। ও জল আনতে গেল। ভেবে

দেখলাম, আমার উদ্ভট তত্ত্বের কথা এখন মিতাকে না বলাই ভালো।

কারণ, জন্মান্তরবাদে আমি এতটুকুও বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া, স্বপ্নের মধ্যে অ-শেখা ভাষায় কথা বলা, যাকে স্বপ্নতত্ত্বের বইতে 'রেসপন্সিভ জেনোগ্লসি' বলে, সেই ক্ষমতা তো কৈশোরের পরে-পরেই সাধারণত হারিয়ে যায়। তা হলে আমার বেলায় এরকম হচ্ছে কেন?

তিন

স্বপ্নের মিছিল যথারীতি চলতে লাগল। পাখির স্বপ্নটা আবার দেখলাম। শক্তিকে হত্যা করার দৃশ্যটাও দেখলাম বার তিন-চারেক। কখনও সম্পূর্ণ, কখনও-বা খানিকটা।

রাতের স্বপ্ন ছাড়াও আচমকা দিবাস্বপ্ন দেখলাম দুবার। সেই একইরকম—চোখের সামনে কালো পরদা নেমে গিয়ে উত্তেজনাময় কথা কাটাকাটি। আবার কখনও বা দেখলাম জেসমিনের কান্না, শক্তির ঘৃণা-ভরা তাচ্ছিল্য, টমাসের হিংসা।

এ ছাড়া নতুন-নতুন টুকরোও যোগ হতে লাগল পুরনো স্বপ্নের সঙ্গে। যেমন দেখলাম, ধু-ধু করছে সাদা বরফ, তুলোর সমুদ্র যেন। তার ওপরে মানুষের টানা স্লেজগাড়ি চলছে অসংখ্য। অনেকে জটলা করছে একপাশে দাঁড়িয়ে। দূরে বড়-বড় দুটো দো-চালা কাঠের বাড়ি। লাল রঙ। তবে ছাদ দুটো ঢেকে গেছে গুঁড়ো বরফে। সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল ট্যুরিস্টের ভিড়।

হঠাৎই একটা স্লেজগাড়ি থেকে নাম ধরে কে যেন আমাকে ডাকল। তাকিয়ে দেখি, জেসমিন। মাথায় লোমের টুপি। গায়ে লাল কোট। চোখে রোদ-চশমা। আমি ওর দিকে হাত তুলে বারকয়েক নাড়লাম। কিন্তু মনের ভেতরে রাগ আর ঘেন্না টগবগ করছিল। জেসমিন খুব হাসছিল। হঠাৎই পাশে তাকিয়ে দেখি টমাস আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্নটা তক্ষুনি শেষ হয়ে গেল।

আর-একটা স্বপ্নে দেখলাম, আমি জেসমিনকে বাংলা শেখাচ্ছি, ওর আধো-আধো উচ্চারণ শুনে হাসছি—ঠিক যেমনটি ও হেসেছিল আমাকে ওর ভাষা শেখানোর সময়। আবার দেখলাম, একটা বন্ধ ঘরে চারজন মানুষের সঙ্গে আমি বসে আছি। টেবিলে মদের বোতল আর গ্লাসের ছড়াছড়ি। আমরা তাস খেলছি। টেবিলে অনেক টাকাও রয়েছে। প্রত্যেকেই মদ খাচ্ছি, আর সেইসঙ্গে জুয়া খেলা চলছে। আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। তারপর জেগে উঠে আবার সেই ব্যথা।

রোববারের মধ্যেই এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল যে, ঘুমোলেই শক্তি আর জেসমিনের স্বপ্ন। তা ছাড়া, জেগে থাকার সময়টুকুতেও পুরোপুরি নিস্তার নেই। মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে শিউরে

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, স্বপ্নের মধ্যে স্পষ্ট শুনেছি।'

নবকৃষ্ণ সেন হাসলেন। ওঁর চামড়ার ভাঁজ সংখ্যায় বেড়ে গেল। বললেন, 'স্বপ্নের মধ্যে যদি ঠিক শুনে থাকো তা হলে তোমার শ্রুতিশক্তির প্রশংসা করতে হয়। সিম্ মানে পাখি।'

আমি কৌতূহল চাপতে পারছিলাম না। খাতাটা হাতের মধ্যে ঘেমে উঠছিল। জিগ্যেস করলাম তৎক্ষণাৎ, 'কোন ভাষায়?'

ডক্টর সেন জবাব দেওয়ার আগেই একটা ঘটনা ঘটল।

অবশ্য ঘটনা না বলে দুর্ঘটনাও বলা যেতে পারে।

হঠাৎই আমার চোখের সামনে সব আঁধার হয়ে গেল। রমা, মিতা, ডক্টর সেন, সবাই ঝাপসা হয়ে গিয়ে শুধু জেসমিন ভেসে উঠল।

একটা ঘরে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ঠিকভাবে বলতে গেলে দাঁড়িয়ে নেই, মদের নেশায় টলছি। হাতে বোতল। জেসমিন কান্না মেশানো গলায় কথা বলল। ভাষা বুঝলাম না, তবে কোনও অলৌকিক ক্ষমতায় তার অর্থ বুঝে গেলাম 'বউয়ের পয়সায় নেশা করতে তোমার লজ্জা করে না?'

অসহ্য রাগে তীব্র গলায় ওই একই ভাষায় জবাব দিলাম আমি, 'বিয়ের আগে পয়সা তোমার ছিল, এখন আমার!'

তারপর গুনগুন করে গান গেয়ে হা-হা করে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠলাম। জেসমিন কাঁদতে-কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

চোখের সামনে আবার নবকৃষ্ণ সেনের ঘরটা ফুটে উঠল। রমা ভয়ার্ত চোখে আমাকে দেখছে। মিতা মুখ নিচু করে বসে আছে। ওর দেহ অল্প-অল্প কাঁপছে। বোধহয় কান্না চাপতে চেষ্টা করছে। আর ডক্টর সেন কপালে ভাঁজ ফেলে আমাকে দেখছিলেন।

আমি মাথার পেছনটায় হাত বোলাচ্ছিলাম। বেশ ব্যথা করছে। ইতস্তত করে বললাম, 'হঠাৎ-হঠাৎ এরকম হয়ে যাচ্ছে। কী যে অসুখ কিছুতেই বুঝতে পারছি না—।'

নবকৃষ্ণ সেন চশমাটা লেখার কাগজের ওপরে নামিয়ে রাখলেন। বললেন, 'আমি অসুখের ডাক্তারি জানি না, ভাষার ডাক্তারি করি। তাতে যদি তোমার অসুখের কোনও উপকার হয় তা হলে যথেষ্ট শান্তি পাব। যে-ভাষা তুমি বাজিয়ে শোনালে, বা এইমাত্র বললে, তা খাসিয়াদের ভাষা। খাসি ল্যাঙ্গুয়েজের আগে ওদের লেখার কোনও ভাষা ছিল না। সাহেবরা—মানে, বিদেশি ধর্মযাজকেরা খ্রিস্টধর্মের প্রচার করতে এসে ওদের লেখার ভাষা তৈরি করে দেয়। তাই ওদের ভাষার হরফগুলো ইংরেজি।'

উনি থামলেন। মিতা আড়চোখে আমার দিকে দেখছিল। আমি কী যে বলব

বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ডক্টর সেন ধীরে-ধীরে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি আর কিছু জানতে চাও, বাবা?

আমি বললাম, 'না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আজ উঠি।' টেপরেকর্ডার আর খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নবকৃষ্ণ সেন সামান্য হাসলেন। চশমাটা আবার চোখে পরে নিলেন।

ঘর থেকে বেরোনোর সময় খেয়াল করলাম আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বারান্দায় পুরনো আমলের ঘষাকাচের বাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। কার্নিশের পায়রাগুলো ডানা ঝাপটা-ঝাপটি করছে। হয়তো ঘুমোনোর জায়গা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে।

আমার সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ছিল। আলোর আকর্ষণে রাতের কুয়াশা ভেদ করে উড়ে আসছে রঙ-বেরঙের পাখি। ঠিক শ্যামাপোকার মতো। আমার হাতে লিকলিকে বাঁশের লাঠি। বাতাস কাটার সাঁই-সাঁই শব্দ হচ্ছে। আমার পাশে জেসমিন হাততালি দিচ্ছে, হাসছে। পাখির দল আসছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে আলোর কাছে। সিম্! সিম্! সিম্!

সিম্ মানে পাখি। কিন্তু স্বপ্নের ওই জায়গাগুলো আসলে কোথায়? আমাকে সেটা জানতেই হবে। যেমন করেই হোক।

রমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ে স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, একটা অদ্ভুত চাপা রাগ মনের ভেতরে টগবগ করছে।

ডক্টর প্রধানের দেওয়া টনিক আমি নিয়মিত খাচ্ছিলাম। কিন্তু নবকৃষ্ণ সেনের বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর সেগুলো খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। ব্রাহ্মীশাক ঘি দিয়ে ভেজে একবার খেতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এতই তেতো যে, দ্বিতীয়বার খাওয়ার চেষ্টা করিনি। বুঝতে পারছিলাম, আমার অসুখ শরীরের ওষুধে সারবে না।

সোমবার অনেকগুলো কাজ সারলাম।

সমীরের টেপরেকর্ডার ফেরত দিলাম। তবে ক্যাসেটটা অনুমতি নিয়ে নিজের কাছেই রাখলাম। তারপর ডক্টর প্রধানের নির্দেশ মতো ক্লিনিকে গিয়ে মাথার এক্স-রে করালাম। সন্ধেবেলায় এক্স-রে ছবি নিয়ে এসে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে জাতিস্মর, স্বপ্নতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে নানান গল্প করলাম। কিন্তু আশার কোনও আলো দেখলাম না। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েও যে খুব একটা লাভ হবে সেরকম মনে হল না। একটু মনমরা হয়েই বাড়ি ফিরলাম।

মিতা আর মা দুজনে বসে টিভি দেখছিল। আমার হাতে হলদে খাম দেখেই

জিগ্যেস করল এক্স-রে-তে কিছু পাওয়া গেছে কি না। ছবিটা বের করে ওদের দেখালাম। আমি আগেই দেখেছি। একটা নরকরোটি। আমাদের চোখে এর বেশি কিছু ধরা পড়বে না। এখন ডক্টর প্রধানের ডাক্তারি চোখ কী বলে সেটাই জানার বিষয়।

টিভিতে খবর পড়া হচ্ছিল। মিতার চোখ সেদিকে হলেও বুঝতে পারছিলাম ওর একটুও মনোযোগ নেই। হয়তো ভাবছে, রাজ্যের খাসিয়া ভাষা কী করে আমার মগজে ঢুকে গেল।

মা আমাকে কিছুক্ষণ ধরে দেখল। তারপর বলল, 'একমাসের ছুটিতে একটু বিশ্রাম করিস। আর টনিকগুলো ঠিকমতো খাচ্ছিস তো?'

আমি ছোট্ট করে 'হুঁ' বললাম। আমার মাথার মধ্যে জেসমিন আর শক্তির কথা ঘুরছিল। তা হলে কি স্বপ্নে আমি যে জায়গাগুলো দেখেছি সেগুলো খাসিয়াদের দেশ? আসাম, মেঘালয় এসব অঞ্চলে খাসিয়ারা থাকে শুনেছি। শক্তিকে দেখে যতটুকু বুঝেছি, সে বাঙালি। সে ওখানে, ওদের মাঝে গিয়ে হাজির হল কেমন করে!

খবর শেষ হতেই মিতা উঠে পড়ল। বলল, 'দাদা, তুই এখন আর বেরোস না, তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসছি। চা খাবি তো?'

টিভির পরদাতে চোখ ছিল। বললাম, 'হ্যাঁ, একটু আদা দিয়ে করিস।'

ঘাড় নেড়ে রান্নাঘরের দিকে রওনা হল মিতা। যাওয়ার সময় গুনগুন করে গান করছিল—বোধহয় নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করছে। আমি ওর ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটায় বসে পড়লাম, মায়ের পাশে।

একটি স্পেশাল রিপোর্ট দেখানো হচ্ছে এই ঘোষণা করে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্যচিত্র গোছের কিছু একটা শুরু হল। তার প্রথম দৃশ্যটি দেখেই আমার বুকের ধকধক শব্দ কয়েক গুণ বেড়ে গেল। কপালে ঘামের বিন্দু ফুটতে শুরু করল।

গাঢ় অন্ধকার রাত। আলোর আকর্ষণে পাখি উড়ে আসছে নানা দিক থেকে। হ্যাজাক লণ্ঠন সামনে রেখে লম্বা লিকলিকে লাঠি হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে শিকারিরা। উড়ন্ত পাখি মাথার ওপরে এলেই সাঁই-সাঁই করে লাঠি চালাচ্ছে চাবুকের মতো।

এ যে আমার স্বপ্ন! কোনও ভুল নেই তাতে।

আমি মেরুদণ্ড সোজা করে বসলাম।

ঘোষক তার ধারাবিবরণী শুরু করল।

জায়গাটির নাম জাটিঙ্গা। আসামের নর্থ কাছাড় হিল্‌স জেলার একটি গ্রাম। আয়তন মাত্র পাঁচ-ছ' বর্গ কিলোমিটার। হাজার-দেড়েক খাসিয়া উপজাতির মানুষ সেখানে বাস করে। অন্ধকার কুয়াশার রাতে অনুকূল বাতাস থাকলে উজ্জ্বল আলোর

আকর্ষণে উড়ে আসে হাজার-হাজার পাখি। আলোর কাছে এসে সম্মোহিতের মতো বসে থাকে। স্থানীয় খাসিয়াদের অনেকেই আলোর কাছাকাছি উড়ন্ত পাখিদের লম্বা লাঠি দিয়ে আঘাত করে। তারপর তাদের মেরে খায়। অবশ্য পাখিগুলো ধরে অনেকে ওদের পোষ মানানোর চেষ্টাও করেছে, কিন্তু পাখিগুলো বাঁচেনি। ওরা মানুষের দেওয়া খাবার খায় না। শেষপর্যন্ত একরকম অনশনেই ওরা মারা যায়।

দু-একটা স্থিরচিত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হচ্ছিল। একইসঙ্গে চলছিল ধারাভাষ্য। আলোর আকর্ষণে শ্যামাপোকার মতো পাখি উড়ে আসে এমন ঘটনা পৃথিবীর আর কোথাও কখনও শোনা যায়নি। জাটিঙ্গা গ্রামে কমপক্ষে নব্বই বছর ধরে ঘটছে এই ঘটনা। কিন্তু কৌতূহল নিয়ে রহস্যময় পাখির বিষয়টা বিশ্লেষণ করতে কোনও বিজ্ঞানী এতদিন পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। এই প্রথম ডক্টর ধীরেন রায় নামে এক কৃতী বাঙালি বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছেন সমস্যার সমাধানে। আজ টিভিতে তাঁরই সাক্ষাৎকার প্রচারিত হবে। তিনি সম্প্রতি জাটিঙ্গা গিয়েছিলেন সরেজমিনে গবেষণা করতে। দীর্ঘ একমাস পর প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল নিয়ে ফিরে এসেছেন। সেই বিষয়েই তাঁকে প্রশ্ন করবেন শ্রীসমর মুখোপাধ্যায়...।

আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। দেখলাম, সেই দৃশ্যটা। রাতের আঁধারে পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমি সাঁই-সাঁই শব্দে লাঠি চালাচ্ছি। নাকে সুরভির সুবাস। পাশে খুশি-মাতাল জেসমিন। পায়ের কাছে হ্যাজাকের আলো।

দু-হাতে মাথা চেপে ধরে আমি ভীষণ গলায় চিৎকার করে উঠলাম—বুকফাটা যন্ত্রণার চিৎকার। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে গেলাম মেঝেতে।

মা ভয়ে চিৎকার করে প্রায় ছুটে এল আমার কাছে। মাথাটা কোলে তুলে নিল। ডাকল, 'রুণু! রুণু!'

ঝাপসা চোখে দেখলাম, মিতা চা-জলখাবারের ট্রে হাতে করে ঘরে এসে ঢুকল। চোখ বড়-বড় করে ডেকে উঠল, 'দাদা! দাদা!'

মা হাউমাউ করে এবার কেঁদে ফেলল। জড়ানো গলায় কোনওরকমে বলল, 'মিতু, শিগগিরই ডাক্তার ডাক!'

টিভিতে ইন্টারভিউ তখন পুরোদমে চলছে। আর শরীরে অবসাদের ভার পাথরের মতো হওয়া সত্ত্বেও টের পাচ্ছিলাম, আমি বিড়বিড় করে কথা বলছি—।

'জাটিঙ্গা! জাটিঙ্গা! জেসমিন। শক্তি। টমাস। জাটিঙ্গা...।'

তারপর আর কিছু মনে নেই।

চার

শুক্রবার রওনা হলাম জাটিঙ্গার পথে।

সেদিন রাতে পাড়ার ডক্টর বোসকে ডেকে এনেছিল মিতা। উনি ইঞ্জেকশান দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সারারাত মা আর মিতা বসেছিল আমার মাথার কাছে। সকালে ঘুম ভাঙতে মিতার কাছে শুনলাম, সারারাত ধরেই নাকি আমি জেসমিন, শক্তি, টমাস, জাটিঙ্গা—এই শব্দগুলো ক্রমাগত উচ্চারণ করেছি। আর দুবার ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার করে উঠেছি।

মঙ্গলবার দিনটা বেশ অসুবিধের মধ্যে কেটেছে আমাদের। কারণ, সেদিন থেকে হঠাৎই মা জ্বরে পড়েছে। জ্বর কম হলেও মায়ের বয়েস ও মনের অবস্থা চিন্তা করে সেটাকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আমরা দোতলায় থাকি। তিনতলায় থাকেন যোগেশবাবুরা। আমি যোগেশদা বলি। ভদ্রলোক পি. ডব্লিউ. ডি.-তে চাকরি করেন। খুব ভালো লোক। উনি আর ওঁর স্ত্রী ভীষণ সাহায্য করলেন। বরাবরই করেন। যোগেশদা অফিস কামাই করে ফেললেন। মিতাও ইউনিভার্সিটিতে গেল না।

মঙ্গলবার রাতে আমি একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। আর তখন থেকেই জাটিঙ্গা যাওয়ার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগল। মনে একটা অদ্ভুত ধারণা তৈরি হয়ে গেল যে, জাটিঙ্গা গেলেই আমার স্বপ্ন-রহস্যের জট খুলে যাবে। আর আমিও বেঁচে উঠব এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে।

অতএব বুধবার সকালে শরীরটা একটু জুত লাগতেই মিতাকে বলে বেরিয়ে পড়লাম।

রাসেল স্ট্রিটের 'অসম হাউস'-এ গিয়ে জাটিঙ্গা সম্পর্কে বহু খবরাখবর জোগাড় করলাম। এক্স-রে প্লেটটা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলাম। ফেরার পথে সেটা ডক্টর প্রধানের চেম্বারে জমা দিয়ে চলে এলাম। উনি তখন ছিলেন না। থাকবেন না জানতাম। তা ছাড়া, ওঁর ডাক্তারি মতামতের ওপরে আমার আর কোনও আগ্রহ ছিল না।

বৃহস্পতিবার মা একটু ভালো হয়ে উঠল। এই প্রথম মা ও মিতাকে বললাম, আগামীকাল আমি জাটিঙ্গা রওনা হচ্ছি।

মিতা আগেই বোধহয় কিছুটা আঁচ করেছিল। মা তো কেঁদেই ফেলল।

আমি বললাম, 'তুমি কি চাও তোমার একমাত্র ছেলে সারা জীবন পাগল হয়ে বেঁচে থাকুক?'

মা কাঁদতে-কাঁদতেই মাথা নাড়ল। মিতা চুপ করে রইল।

আমি আবার বললাম, 'মা, ডিপার্টমেন্ট থেকে একমাস ছুটি নিতে আমাকে

একরকম বাধ্য করেছে। এটা যে ঠিক কী ধরনের অপমান তুমি বুঝবে না। তা ছাড়া, ক্লাসে, মিতার বন্ধুর বাড়িতে, সব জায়গায় ওই স্বপ্নের রোগ আমাকে অপদস্থ করেছে। সে যে কী লজ্জা তোমাকে কী করে বোঝাব!'

মা মুখে আঁচল গুঁজে ছিল। আঁচল সরিয়ে বলল, 'বুঝি রে, সব বুঝি। তবু—।'

মিতা এতক্ষণে কথা বলল, 'দাদাকে বাধা দিয়ো না, মা। ওর যাওয়া দরকার।'

আমি দু-হাতে মাথার চুল খামচে ধরে বললাম, 'আমার মাথার ভেতরে দিন-রাত একটা আগ্নেয়গিরি জ্বলছে। যে-কোনও মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে গরম লাভা। মনে হচ্ছে, আমার নাক, কান, মুখ, চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে গরম লাভার স্রোত। এ যে কী সাঙ্ঘাতিক যন্ত্রণা তা তোমাকে বোঝানো যাবে না। ওঃ—!'

মা চোখের জল মুছল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল 'জোর করে কাউকে ধরে রাখা যায় না। তোর বাবাকে ধরে রাখতে পারিনি। তুই কোথায় যাবি বলছিস, যা। মাথার ওপরে যিনি আছেন তিনিই যা করার করবেন—।'

মিতা জিগ্যেস করল, 'ক'দিন লাগবে রে?'

'কী জানি। আমি সময় করে চিঠি দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে তোরা কোনও চিঠিপত্র দিস না। আমি কোথায় থাকি-না-থাকি তার তো কোনও ঠিক নেই!' একটু থেমে আবার বললাম, 'তুই মাকে নিয়ে সাবধানে থাকিস। তা ছাড়া, যোগেশদা-বৌদিকে বলে যাব'খন। কোনও অসুবিধে হলে ওঁদের বলিস।'

মা নির্জীব গলায় বলল, 'মিতু, রুপুর জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিস—।'

সে-দিনটা ঘোরাঘুরি করে টাকার ব্যবস্থাপত্র করলাম। পরদিন গোছগাছের কাজে মন দিলাম।

শুক্রবার রওনা হওয়ার আগে মনে করে দুটো জিনিস সঙ্গে নিয়েছিলাম। সমীরের থেকে ধার করা ক্যাসেটটা, আর ছোট খাতাটা—যার মধ্যে স্বপ্নগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লেখা আছে।

জাটিঙ্গায় পৌঁছে চোখ একেবারে জুড়িয়ে গেল।

গাঢ় সবুজ বরাইল পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। কচ্ছপের পিঠের মতো জমির ওপরে ছড়ানো-ছেটানো গোটা গ্রামের ঘর-বাড়ি। ঘর-বাড়ি বলতে টিনের চাল বা খড়ের চাল দেওয়া কাঠ-দরমা-সিমেন্টের ঘর। প্রতিটি ঘরের লাগোয়া সুন্দর ফুলের বাগান। আমার সবকিছু কেমন চেনা-চেনা লাগছিল।

শুক্রবার কলকাতা ছেড়ে ট্রেনে রওনা হয়েছিলাম। শনিবারে এসে পৌঁছেছি গৌহাটি। সেখান থেকে রাতের ট্রেন ধরে পরদিন সকাল দশটা নাগাদ নেমেছি লোয়ার হাফলঙ স্টেশনে। স্টেশনটা নিচু জমিতে। একগাদা সিঁড়ি ভেঙে ওপরের রাস্তায় উঠে এসে শেয়ারের ট্যাক্সি—আসলে ঝাঁঝরা পুরোনো জিপগাড়ি—ধরলাম। আধঘণ্টার চড়াই রাস্তা ভেঙে জিপ আমাকে নামিয়ে দিল হাফলঙ বাজারের সামনে।

জায়গাটা আধা-শহর মতো। আজ রবিবার, তাই পথে ভিড় কম। তবু তারই মধ্যে চোখে পড়ছে বাঙালি, অসমীয়া আর মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ—নানান উপজাতির মানুষ। কেউ বা পোশাকে সাহেবি, আবার কেউ বা সনাতনী। পশ্চিমী সাজের কয়েকটি মেয়েকে চোখে পড়ল। আবার পিঠে শিশু বেঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে এমন মহিলাদেরও দেখলাম।

লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা গেস্ট-হাউসের সন্ধান পেলাম। সঙ্গে মালপত্র এমন এনেছি যাতে নিজেই বইতে পারি। অতএব বিশ-পঁচিশ মিনিটের হাঁটা পথ পেরিয়ে গেস্ট-হাউসে পৌঁছতে তেমন একটা অসুবিধে হয়নি।

যেমন সুন্দর গেস্ট-হাউস, তেমনই সুন্দর তার প্রাকৃতিক পরিবেশ। সবুজ ঘাসে ঢাকা উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো জমি। একটু দূরেই মনোরম সরোবর। সেখানে সাদা হাঁসের দল সাঁতার কাটছে। সরোবরের ওপরে একটা সরু সাঁকোও চোখে পড়ল। ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরের পর্বতমালা আর মেঘের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ওরা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

গেস্ট-হাউস যিনি দেখাশোনা করেন তাঁর কাছেই শুনেছি জাটিঙ্গা এখান থেকে প্রায় ন'কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ দিকে, ওই পর্বতমালার কোলে। ভদ্রলোক অসমীয়া। নাম হীরেন্দ্র ফুকন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলাম। জাটিঙ্গা ও হাফলঙ সম্পর্কে কিছু খবরাখবর পাওয়া গেল। একসময় আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনি এখানে কতদিন ধরে আছেন?'

উনি বললেন, 'তা প্রায় আটাশ বছর—।'

'আপনার আগে এই গেস্ট-হাউস কে দেখাশোনা করত?'

ফুকন হেসে ফেললেন। বললেন, 'আপনার প্রশ্নটা আমি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। আসলে আমি হাফলঙে আছি প্রায় আটাশ বছর। তার আগে গৌহাটিতে ছিলাম। আর এই গেস্ট-হাউস তৈরি হয়েছে ষোলো বছর।'

আমি দমে গেলাম। তবে তখনকার মতো। ফুকনের কাছে জাটিঙ্গা রওনা হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, 'জাটিঙ্গায় কী জন্যে যাবেন?'

বললাম, 'একটা কাজ আছে।'

'আজ তো রোববার। তা হলে আজ আর রওনা না হয়ে কাল ভোরে বাজারের

কাছ থেকে শিলচরের বাস ধরুন, আধঘণ্টায় জাটিঙ্গা পৌঁছে দেবে। বাসে না যান একটু বেলায় শেয়ারের ট্যাক্সিও পাবেন। আবার সন্ধেবেলায় বাস ধরে হাফলঙে ফিরে আসতে পারবেন।'

আমি শক্তি আর জেসমিনের কথা ভাবছিলাম। শক্তির পক্ষে এই গেস্ট-হাউসে থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ গেস্ট-হাউসটা যথেষ্ট পুরনো নয়। সে এখানে বিদেশি ছিল—হয়তো কোনও চাকরি বা ব্যবসার কাজে জাটিঙ্গা অথবা হাফলঙে, কি কাছাকাছি কোথাও এসে উঠেছিল সে। কিন্তু জেসমিন? জেসমিন তো জাটিঙ্গারই মেয়ে!

কী মনে করে প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করেই বসলাম, 'মিস্টার ফুকন, আপনি শক্তি বা জেসমিন নামে কাউকে চেনেন, বা নাম শুনেছেন?'

ভদ্রলোকের দু-চোখে বিমূঢ় ভাব দেখে একটু বিশদ হয়ে বললাম, 'ছেলেটি বাঙালি, আর মেয়েটি খাসিয়া, ওরা বিয়ে করেছিল...।'

ফুকন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'নাঃ, মনে পড়ছে না। তবে জেসমিন নামটা যেন একটু চেনা-চেনা ঠেকছে। জাটিঙ্গার মেয়ে জেসমিন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' আমি আগ্রহে তাঁর কাছে ঝুঁকে এলাম।

আমরা গেস্ট-হাউসের উঁচু লাউঞ্জে বসে আছি। সামনে পাইন গাছ। দাঁড়কাক কর্কশস্বরে ডাকছে। সামনের বারান্দার রেলিঙে চড়ুই পাখি কিচিরমিচির করে লাফালাফি করছে। দূরে লেকের জলে স্নান করছে দুজন লোক। দুপুরের নির্জনতা মন বিষণ্ণ করে দিতে চাইছে।

ফুকন বললেন, 'অনেক আগে বোধহয় ওই নামের একটি মেয়ে হাফলঙে চাকরি করত, ফরেস্ট অফিসে—।'

'কতদিন আগে?'

'তা প্রায় বাইশ-চব্বিশ বছর আগে, কি তার বেশি হবে—ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আপনি তাকে চিনতেন?'

'না, ঠিক চিনতাম না...তবে হাফলঙ তো আর গৌহাটি নয়, ছোট জায়গা। তাই অনেকেই অনেককে জানে। সেইরকম আর কি। মুখে চিনতাম, নাম জানতাম। তা ছাড়া, মেয়েদের নাম-টাম কি চট করে কেউ ভোলে? ভোলা যায়?' ফুকন খারাপভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, 'অবশ্য নামটা জেসমিন না জেসমি সেটা আমি খুব শিয়োর নই...তা ছাড়া, সে বাঙালি বিয়ে করেছিল বলে কিছু শুনিনি।'

আমার বয়েসের কথা ভাবলে এবং যদি আমি জাতিস্মর বলে নিজেকে ধরে নিই তা হলে, শক্তি ও জেসমিনের যে-কাহিনি আমার স্বপ্নে ধরা পড়েছে তা অন্তত

চল্লিশ বছরের পুরনো। শক্তি মারা গেছে। জেসমিন বেঁচে আছে না মারা গেছে জানি না। কোথায় আছে তা-ও জানি না। স্বপ্নে যে-লেক আমি দেখেছি তার সঙ্গে হাফলঙের এই লেকের কোনও মিল তো নেই-ই, উপরন্তু ফুকনের কাছে জেনেছি, এই লেক তৈরি হয়েছে মাত্র আঠেরো বছর। তা ছাড়া, জাটিঙ্গায় কোনও লেক নেই, কোনওকালে ছিল না। তা হলে কি শক্তির মৃত্যু হয়েছিল অন্য কোনও জায়গায়? এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে জেসমিন আবার ফিরে এসেছিল এখানে? চাকরি নিয়েছিল বন দপ্তরে? প্রশ্নের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। একই সঙ্গে জাটিঙ্গা রওনা হওয়ার জন্য মনটা আনচান করে উঠল।

ফুকন চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ একা-একা লাউঞ্জে ঘোরাফেরা করলাম। দূরের পাহাড় আর লেক আমাকে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

সেদিন রাতে গেস্ট-হাউসের আরামের বিছানায় ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন দেখলাম জেসমিনকে। তবে স্বপ্ন ভাঙার পর খেয়াল করলাম মাথার ব্যথাটা আগের চেয়ে অনেক কম লাগছে। ছোট খাতায় ব্যাপারটা টুকে রাখলাম। স্বপ্নটা পুরনো বলে আর নতুন করে লিখলাম না।

পরদিন ভোরে বাস ধরে পৌঁছে গেলাম আমার স্বপ্নের দেশ জাটিঙ্গায়।

যেখানে নেমেছি সেই জায়গাটার নাম পয়েন্ট—কন্ডাক্টরের কাছে শুনেছি। নেমেই দেখি উলটোদিকে একটা চায়ের দোকান। দরমার বেড়া, টিন, আর বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি। দোকানের পিছনে খাদ আর ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের বেশিরভাগই বাঁশগাছ।

খবর পেতে চাইলে প্রথমে এরকম চায়ের দোকান দিয়েই শুরু করা ভালো। সুতরাং দোকানের ভেতরে ঢুকলাম।

এখন সবে সাতটা পনেরো। আবহাওয়ায় পাতলা কুয়াশা রয়েছে। সূর্যের আলো এখনও বরাইল পাহাড়ের আড়ালে। একটু শীত-শীত করছে।

একটা ফরসা বেঁটে-খাটো অসমীয়া ছেলে দ্রুত হাতে চায়ের ব্যবস্থা করছিল। দোকানে আরও তিন-চারজন খদ্দের বসে রয়েছে। সবই উপজাতির মানুষ, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। অনেকটা কলকাতায় দেখা চীনা-জাপানি বা নেপালিদের মতো। সকলেরই পরনের বেশভূষা রুক্ষ, ময়লা।

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমি দোকানি ছেলেটিকে কাছে ডাকলাম। সবাইকে চা-বিস্কুট জোগান দেওয়ার পর তার হাত একটু খালি হয়েছিল। হাত মুছতে-মুছতে সে কাছে এল। আমি বললাম যে, জাটিঙ্গা গ্রামে আমি একজনের খোঁজ করতে এসেছি। কথাবার্তা ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম ছেলেটি বাংলা মোটামুটি জানে। দোকানের মালপত্র কিনতে প্রায়ই তাকে হাফলঙে যেতে হয়। সেখানে বাঙালিদের দোকানপাট কম নয়। ফলে বাংলা সে রপ্ত করে

ফেলেছে। তা ছাড়া, তার দেশ করিমগঞ্জেও বাঙালি অনেক আছে। অতএব কথাবার্তায় সুবিধেই হল।

আমি জেসমিন আর শক্তির নাম বললাম, টমাসের কথাও বললাম।

ছেলেটি কিছুক্ষণ কী ভাবল, তারপর বলল, জেসমিন বা শক্তির নাম সে শোনেনি, তবে এ-গাঁয়ে টমাস নামে দু-চারজন আছে।

আমি কী জবাব দেব ভাবছি, তখন সে বসে-থাকা অন্য খদ্দেরদের দিকে তাকিয়ে অচেনা ভাষায় খুব দ্রুত উচ্চারণে কী যেন বলল। মনে হল, খাসিয়া ভাষা।

উত্তরে তাদের একজন জবাব দিল। এরকমভাবে বারতিনেক কথা চালাচালির পর ছেলেটা আমার দিকে তাকাল। বলল, 'বাবু, ওই লোকটা জাটিঙ্গা গাঁয়েই থাকে। ও বলছে, ওদের গাঁয়ে জেসমিন নামে কেউ নেই। তবে টমাস তিনজন আছে। আপনার সেরকম দরকার থাকলে আপনি ওর সঙ্গে গাঁয়ে যান, সেখানে গিয়ে খোঁজখবর করুন। তবে গাঁওবুড়ার সঙ্গে একবার কথা বলে নেবেন—।'

'গাঁওবুড়া?' আমি একটু অবাক হয়ে বললাম।

দোকানি হাসল আমার অজ্ঞতায়। বলল, 'এ-গ্রামের হেডম্যান।'

অর্থাৎ, মোড়ল। ওর কাছে আরও শুনলাম, মোড়লই গাঁয়ের একরকম সর্বেসর্বা।

তারপর ছেলেটা 'জন' নাম ধরে ইশারায় একজন খদ্দেরকে ডাকল। যে একটু আগে তিনজন টমাসের সংবাদ দিয়েছে সে উঠে এল। ছোট-ছোট চোখ, মুখে অনেক ভাঁজ, ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি লেগে আছে। তবে কোথায় যেন একটা চাপা সতর্ক ভাব টের পাচ্ছিলাম।

দোকানি বলল, 'আপনি তা হলে জনের সঙ্গে কথা বলুন।' এই বলে সে আবার চা-ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমি জনকে আমার কাছে বসালাম। তারপর দুজনের জন্যে আবার চা-বিস্কুটের অর্ডার দিলাম। জন চওড়া হেসে আমার আতিথেয়তা স্বীকার করল। প্রশ্ন করে জানলাম, ও ইংরেজি বোঝে। অতএব এতক্ষণ ধরে যে-প্রশ্নটা বুকের ভেতরে ছটফট করছিল, সেটাই বেরিয়ে এল বাইরে।

'তোমাদের গাঁয়ে যে-তিনজন টমাস আছে তাদের বয়েস কীরকম হবে?'

কিছুক্ষণ ভাবল জন। তারপর বলল, 'দুজনের বয়েস আঠেরো থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। ঠিক কত বলতে পারব না, তবে আমার চেয়ে বেশ ছোট। আর তিন নম্বর যে-টমাস আছে তার কত হবে? এই পঞ্চাশ-ষাট।'

আমার বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজতে লাগল।

দোকানি চা-বিস্কুট দিয়ে গেল সামনে। চায়ের ধোঁয়া আমার চোখে-মুখে লাগছিল। স্বপ্নের টমাসের ঝাপসা মুখটা ভেসে উঠতে লাগল বারবার। মুখ স্পষ্ট না দেখতে

পেলেও তার চেহারার আদল, হাঁটা-চলা, সবই আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। স্বপ্নে যে-টমাসকে আমি যুবক দেখি, আমার বয়েস হিসেব করলে তার বয়েস এখন পঞ্চাশ-ষাটই হওয়ার কথা। অবশ্য সেক্ষেত্রে দুটো জিনিস আমাকে মেনে নিতে হবে। এক, আমিই আগের জন্মে শক্তি ছিলাম। দুই, টমাস এখনও বেঁচে আছে।

প্রশ্ন করে জানলাম, জনের বিশেষ কোনও কাজ নেই। আমাকে নিয়ে সে গ্রামে যেতে পারে। অতএব তাকে বললাম যে, পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়েসের টমাসের সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাই।

চা-বিস্কুটের দাম মিটিয়ে দিলাম। দুটো সিগারেট কিনে জনকে দিলাম। ও খুশি হয়ে 'থ্যাংক য়ু' বলে একটা ধরাল, অন্যটা পকেটে রেখে দিল। দোকানির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

তখন কুয়াশার স্তর কেটে গিয়ে বেশ সুন্দর পাহাড়ি রোদ ফুটেছে। টুকরো-টুকরো ছন্নছাড়া মেঘ বরাইল পাহাড়ের ছোট-বড় চূড়ায় কুলপি মালাইয়ের মতো আটকে আছে। কয়েকটা সবুজ বাঁশপাতি পাখি ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। আমি আর জন উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু করলাম।

আঁকাবাঁকা পিচের আস্তর দেওয়া সড়কের দু-পাশে বাঁশের ঘন জঙ্গল। সেখানে অদৃশ্য ঝিঁঝির দল তারস্বরে ডাকছে। কয়েকটা ট্রাক ও জিপ শব্দ করে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমরা হাঁটছি, আর জন জাটিঙ্গার গল্প বলে যাচ্ছে।

একটা জায়গায় এসে জন পিচের রাস্তা ছেড়ে বাঁ-দিকের পাহাড়ি পথ ধরল। পায়ে চলার সরু পথ। বেশ খাড়াই। দু-পাশে হিজিবিজি ঝোপঝাপ। তার মধ্যে নিশ্চয়ই জবা গাছও ছিল। কারণ, দেখলাম, ঝোপের মাথা ফুঁড়ে বেশ কয়েকটা বড়-বড় লাল জবা উঁকি মারছে।

একই পথ ধরে নেমে আসছে গ্রামের লোকজন। তাদের বেশিরভাগই মহিলা। প্রত্যেকের পিঠে শঙ্কু আকৃতির বেতের ঝুড়ি। ঝুড়ির চওড়া ফিতে মাথায় আটকানো, আর হাতে ছোট-ছোট পোঁটলা, ছুরি-কাটারি। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কেউ-কেউ খাসিয়া ভাষায় জনের সঙ্গে কথা বলছিল।

জনকে জিগ্যেস করে জানলাম, এই মহিলা ও পুরুষেরা ঝুমে, অর্থাৎ, বাগানে যাচ্ছে। বরাইল পাহাড়ের নানা জায়গায় এদের বাগান বা ক্ষেত আছে। সারাদিন সেখানে চাষবাসের কাজ করে বাগানের সবজি-ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে ওরা এই পথ ধরেই আবার গাঁয়ে ফিরবে। ঝুমে আদা, কমলালেবু, লঙ্কা ইত্যাদি নানান জিনিসের চাষ হয়। মেয়েরাই বেশিরভাগ সব দেখাশোনার কাজ করে। কারণ, এখানকার মাতৃতান্ত্রিক সমাজে তারাই মায়ের সম্পত্তি পায়।

একসময় চড়াই শেষ করে আমরা গ্রামে ঢুকে পড়লাম। মোটামুটি সমতল পথ।

লালমাটি ও পাথর মেশানো। দু-পাশে ঘর-বাড়ি চোখে পড়ছে। খড় বা টিনের চালে ছাওয়া একতলা বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া উঠোন আর ফুলের বাগান। মহিলারা গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত। দু-একটা বাচ্চা দাওয়ায় বসে আছে, খেলা করছে।

সমতল পথে মিনিটদশেক হাঁটার পর ডানহাতি ঢালু পথ বেয়ে নামল জন। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। পথের শেষে একটা সুন্দর বাড়ি। কালো আর নীল রঙ করা। সামনের বাগানে অসংখ্য রঙিন ফুল। উঠোনে মা-মুরগি তার ছানাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাবার খুঁটে খাচ্ছে।

সামনের দরজা হাট করে খোলা ছিল। ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। দুটো বেতের চেয়ার অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। জন দু-একবার উঁকি মারার চেষ্টা করল। তারপর গলা তুলে ডাকল, 'টমাস! এ টমাস! টমাস!'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। হঠাৎ টের পেলাম, একটা ভোঁতা খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন কেউ কাঠ কাটছে।

একটু পরেই বাড়ির ডানপাশের বাঁক ঘুরে একটা মানুষ এসে হাজির হল আমাদের সামনে। দেখে বয়েস বোঝার উপায় নেই। ভাঁজ পড়া কঠিন মুখ। শক্তিশালী মাঝারি চেহারা। গায়ে গেঞ্জি। পায়ে জিন্‌স। আর হাতে একটা ঝকঝকে কাটারি। ঘামে ভিজে মুখ-হাত-পা চকচক করছে। গেঞ্জিও অর্ধেকটা ভেজা।

জনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই লোকটার ভুরু কুঁচকে গেল।

কারণ, সে আমাকে দেখতে পেয়েছে। এবং আমার বুকে টিপটিপ শব্দ শুরু হয়ে গেছে।

জন তাকে কীসব বুঝিয়ে বলল। তখন কাটারিটা উঠোনের একপাশে ছুড়ে ফেলে সে আমাদের ঘরে ডাকল। ঘরে ঢোকার মুখে জন চাপা গলায় বলল যে, এই টমাস। আমি যেন একটু সতর্কভাবে কথাবার্তা বলি, কারণ, টমাস অল্পেতেই চটে যায়।

ঘরে ঢুকে আমরা দুটো বেতের চেয়ারে বসলাম। টমাস একটা পরদা সরিয়ে বাড়ির ভেতরে কোথায় চলে গেল। আমি ঘরটা চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম।

সুন্দর ছিমছামভাবে সাজানো বিশাল ঘর। ঘরে গোটা দশেক বাঁধানো ফটোগ্রাফ ঝুলছে। তার মধ্যে সাতটাই যিশু, জেরুজালেম ও মাতা মেরির। বাকি তিনটের মধ্যে একটা গ্রুপ ফটো, একটা একজন যুবকের, আর তৃতীয়টা টমাসের স্কুল ফাইনাল পাশের সার্টিফিকেট।

ঘরের মেঝে লাল সিমেন্টের, তবে দেওয়ালগুলো দরমার ও কাঠের—আকাশি রঙ করা। সিলিং মেসোনাইট দিয়ে ঢাকা।

ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম। আমরা যে-দুটো বেতের চেয়ারে বসেছি তা ছাড়া

রয়েছে তিনটে ছোট-বড় বেতের টেবিল, আর দুটো বেতের মোড়া। ঘরের কোণের দিকে রাখা একটা টেবিলে কয়েকটা পুরোনো খবরের কাগজ রয়েছে। আর তার পাশে বাঁশের তৈরি একটা অ্যাশট্রে।

জন আমার দেওয়া দ্বিতীয় সিগারেটটা এখন ধরাল। তারপর উঠে গিয়ে অ্যাশট্রেটা তুলে এনে রাখল আমাদের সামনের সেন্টার টেবিলে।

এমনসময় টমাস এসে ঘরে ঢুকল। গায়ে একটা ডোরাকাটা শার্ট। মুখ নড়ছে—বোধহয় পান চিবোচ্ছে। চোখে সতর্ক দৃষ্টি—তার সঙ্গে একটু সন্দেহও মেশানো রয়েছে। টমাসের হাতে একটা প্লেট—তাতে কয়েকটা পানের পাতা ও কাঁচা সুপুরি।

প্লেটটা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে টমাস একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। ইশারায় পান-সুপুরি খাওয়ার অনুরোধ জানাল। তারপর আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে রুক্ষ গলায় ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, 'কী চাই?'

আমার কপালে ঘাম ফুটতে লাগল। জনের সিগারেটের ধোঁয়া আমার মুখের আশেপাশে ঘুরছে। লক্ষ করলাম, টমাস বর্শার ফলার মতো দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। উত্তরের অপেক্ষা করছে।

আমার চোখের সামনে স্বপ্নগুলো আবার ভেসে উঠল। স্বপ্নের টমাসের অস্পষ্ট মুখটা আমার সামনে বসা বর্ষীয়ান টমাসের মুখের সঙ্গে ধীরে-ধীরে যেন মিলে যাচ্ছে।

'বলুন, কী দরকারে এসেছেন আমার কাছে?'

আমি দম বন্ধ করে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম, 'জেসমিন নামে কাউকে চেনেন?'

টমাস দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। ওর মুখের সতর্কভাব কিছুটা মুছে গেলেও সন্দেহের অংশটুকু থেকেই গেল।

শেষে ও বলল, 'জেসমিন নামে জাটিঙ্গায় কেউ থাকে না।'

আমি ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠছিলাম। তাই বললাম, 'এখন না থাকতে পারে, কিন্তু তিরিশ বছর আগেও কি এ-নামে জাটিঙ্গায় কেউ ছিল না?'

টমাস মাথাগরম করে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। জনকে একবার দেখল। তারপর বলল, 'কী জানি, তিরিশ বছর আগের কথা...ঠিকমতো মনে পড়ছে না...।'

'আমি একজনের নাম বলতে পারি। সে-নামটা শুনলে হয়তো মনে পড়তে পারে।' একটু থেমে আমি স্পষ্ট গলায় বললাম, 'শক্তি নামে কোনও ছেলেকে চিনতেন—তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে? বাঙালি ছেলে, শক্তি—।'

টমাস জবাব দিতে সময় নিল। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ফাঁদটা ঠিক কোন জায়গায় সেটাই ও আঁচ করতে চেষ্টা করছে। হিসেব করছে, সত্যি বলবে না মিথ্যে বলবে।

জন সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। তারপর প্লেট থেকে পান-সুপুরি তুলে নিয়ে ভাঙা বাংলা ও ইংরেজি মিশিয়ে আমাকে বলল, 'তাম্বুল খান—তাম্বুল দিয়ে

অতিথি আপ্যায়ন করাটা এখানকার রীতি—।'

আমি ওর কথা শুনছিলাম না। টমাসের দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম। টমাস জামার একটা বোতাম নাড়াচাড়া করতে-করতে বলল, 'শক্তি নামটা শোনা-শোনা লাগছে। কন্ট্রাক্টরি না কী একটা কাজে জাটিঙ্গায় এসেছিল—।'

আমি বুঝলাম, এভাবে বেশিদূর এগোনো যাবে না। তাই বললাম, 'আপনি কি জানেন, শক্তি জেসমিনকে বিয়ে করেছিল?'

টমাসের তামাটে মুখ সাদা হয়ে গেল।

এই প্রমাণটুকুই আমি খুঁজছিলাম।

জাটিঙ্গার স্বপ্নে টমাসকে আমি দেখিনি। তবে কেন যেন আমার মনে হয়েছিল টমাস জাটিঙ্গার লোক, খাসিয়া। এখন সেই ধারণা প্রমাণিত হল। কিন্তু টমাসের সঙ্গে জেসমিনের সম্পর্ক কী? আর সেই লেক, অথবা ফুলের বাগানই বা এখানে কোথায়?

টমাস উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো ছোট হল। রূঢ় গলায় জিগ্যেস করল, 'কে আপনি?'

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'আমার নাম রণবীর চৌধুরী।'

'শক্তি আপনার কে হয়?'

শক্তি আমার কে হয়? নিজেকেই প্রশ্ন করলাম আমি।

একদিক থেকে সে আমার কেউ নয়, আমাদের দুজনের রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ আমরা দুজনেই বোধহয় এক। শক্তি আমার আত্মীয় নয়, অথচ পরমাত্মীয়।

টমাসকে এসব কথা বলার কোনও মানে হয় না। সুতরাং জুতসই গল্প যা মনে এল সেটাই বলে দিলাম।

'আমি শক্তিদের ফ্যামিলির উকিল। রিসেন্টলি শক্তি অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছে। শক্তি বেঁচে নেই আমি জানি। কিন্তু তার স্ত্রী জেসমিন, বা তাদের কোনও ছেলেমেয়ে যদি থাকে তা হলে তারা লক্ষ টাকার এই সম্পত্তি পাক, ভোগ করুক, তাই আমি চাই। কলকাতায় একজনের কাছে আমি ওর বিয়ের খবর খুব সম্প্রতি পেয়েছি, শুনেছি জেসমিনের কথা, টমাসের কথা। আর খবর পাওয়ামাত্রই বেরিয়ে পড়েছি ওর স্ত্রী বা সন্তানের সন্ধানে।'

আমার গল্প শুনে টমাস ঘর কাঁপিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে হাসল। ওর চোখের কোণে জল এসে গেল। শেষে বলল, 'ওই ভিখারি কুত্তাটা লাখ টাকার সম্পত্তি পেয়েছে। ওঃ ক্রাইস্ট! ব্যাটা টাকার লোভে কী কাণ্ডটাই না করেছিল! জেসমিনের জীবনটা একদম শেষ করে দিয়েছিল। তারপর—।'

'তারপর?'

টমাস হঠাৎই সতর্ক হল। ভয় পেল, অপরিচিতের কাছে অসাবধানী হয়ে বিপদসীমার বাইরে মুখ খুলে ফেলেছে বলে। একটু আগেই ও বলেছিল, জেসমিন নামে এখানে কেউ ছিল কি না ওর মনে পড়ছে না।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, 'তারপর? জেসমিন এখন কোথায়? বেঁচে আছে, নাকি— ।'

আমার কথা কেড়ে নিয়ে টমাস বলল, 'শক্তি মরে গেছে। জেসমিন মরে গেছে। সব শেষ। তারপর আর কিছু নেই। আপনি এখন যেতে পারেন।'

জেসমিন মরে গেছে! সব শেষ! আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

টমাস সেটা বুঝতে পারল। ওর চোখের দৃষ্টি চঞ্চল হল। খাসিয়া ভাষায় জনকে কীসব বলল। জন উঠে দাঁড়াল রওনা হওয়ার জন্য।

অতৃপ্ত মন নিয়ে জনের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। সাদা আর নীল পোশাক পরা বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। আমি কুড়িটা টাকা বের করে জনের হাতে দিলাম। বললাম, টমাসের কাছ থেকে তো আর কোনও খবর পাওয়া যাবে না, তা হলে এখন কী করব? কার কাছে জেসমিনের খোঁজ করব?'

জন ইতস্তত করে টাকাটা পকেটে রেখে বলল, 'আপনি গাঁওবুড়ার সঙ্গে একবার কথা বলে নিন। তা হলে খোঁজখবর করতে সুবিধে হবে।'

অগত্যা জনের কথায় রাজি হলাম। বললাম, 'আমাকে হেডম্যানের কাছে নিয়ে চলো—।'

এদিক-সেদিক করে পাহাড়ি পথের চড়াই-উৎরাই ভেঙে জন এগিয়ে চলল। আমি অনভ্যস্ত সতর্ক পায়ে ওকে অনুসরণ করলাম। পথে বেশ খানিকটা খোলা জায়গায় একটা গির্জা চোখে পড়ল। জনের কাছে জানলাম, খাসিয়ারা প্রায় সকলেই খ্রিস্টান। ওরা প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত গির্জায় হাজিরা দেয়।

আমার মাথায় খুব দ্রুত একটা চিন্তা খেলে গেল।

জনকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমাদের বিয়ে কি গির্জায় হয়?'

ও বলল, 'হ্যাঁ। ফাদার বাইবেল পড়ে। তারপর—।'

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'ফাদারের নাম কী?'

'ফাদার ওবেস্টিন। এ গাঁয়েরই লোক, খাসিয়া। আমাদের গির্জায় বাইবেল পড়া হয় খাসিয়া ভাষাতেই।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'ফাদার ওবেস্টিনের বয়েস কত?'

একটু ভেবে জন বলল, 'ষাট-পঁয়ষট্টি হবে।'

'কতদিন ধরে উনি গির্জার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন?'

জন হেসে বলল, 'জানি না, তবে ছোটবেলা থেকেই ওঁকে গির্জায় দেখছি...।'

'আমি ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, কেমন?'

জন অদ্ভুতভাবে মাথা নাড়ল। তারপর আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'ওই যে, হেডম্যানের বাড়ি।'

একটা খাড়াই ঢালের কিনারায় ছোট্ট সমতল জমিতে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনের দড়িতে সার-সার ভিজে জামাকাপড় শুকোচ্ছে। একপাশে নানান রঙের ফুলের বাগান। বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো ছোট-ছোট ছেলে। তাদের হাতে লিকলিকে বাঁশের লাঠি, স্বপ্নে যেমনটি দেখেছি। লাঠি দুটো শূন্যে উঁচিয়ে ধরে ওরা দ্রুত এদিক-ওদিক নাড়ছে। সাঁই-সাঁই শব্দে বাতাস কাটার শব্দ হচ্ছে।

জন বলল যে, কুয়াশার রাতে পাখি মারার জন্য ওরা লাঠি চালানো রপ্ত করছে। পরশু রাতে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় পাখি এসেছিল। গতকাল আসেনি। আজ রাতে যদি আসে, এই আশায় ছেলেরা তৈরি থাকছে। পাখি ধরাটা ওদের কাছে একরকম খেলা।

হেডম্যানের নাম মিস্টার রূপ্সি। পাথরে খোদাই করা মঙ্গোলীয় মুখ। রঙ কালো। মাথার ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে হাতকাটা গেঞ্জি ও একটা ধুতি, যদিও ধুতিটা লুঙির মতো করে পরা হয়েছে।

আমাদের যত্ন করে বসিয়ে তাম্বুল দিয়ে আপ্যায়ন করলেন তিনি। সঙ্গে চা-ও জুটল। আলাপের পালা শেষ করে আমি জেসমিন আর শক্তির কথা তুললাম। শক্তির সম্পত্তি পাওয়ার গল্পটাও বললাম। জন তাঁকে আরও কীসব বুঝিয়ে বলল।

সঙ্গে-সঙ্গেই সব মনে করতে পারলেন তিনি।

বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে আছে। জেসমিন সুচ্যাঙ।' তারপর খাসিয়া ভাষায় জনকে কয়েকটি কথা বললেন। আবার আমার দিকে ফিরে যা বললেন তার সারমর্ম হল এই সে অনেকদিন আগের কথা। অন্তত বিশ-তিরিশ বছর তো হবেই। শক্তি সরকার নামে—সরকারই তো? ...হ্যাঁ, ওই নামে একজন কন্ট্রাক্টর এসেছিল জাটিঙ্গায়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ নিয়ে। বেশ কিছুদিন ছিল এখানে। কোথায়? জেসমিনদের বাড়িতে। এখানে তো হোটেল বলে কিছু নেই। জেসমিনের মা মিসেস সুচ্যাঙ সরকারবাবুকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে রেখেছিল। সেই সময়ে জেসমিনের সঙ্গে সরকারবাবুর ভালোবাসা হয়। সে নিয়ে বহুৎ ঝামেলা হয়েছিল। জেসমিন ছিল বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। আপনি তো জানেন, আমাদের সমাজে মেয়েরাই সব সম্পত্তি পায়। অতএব জেসমিন ছিল লাখ-লাখ টাকার মালিক। ওর বাবা মারা গিয়েছিল। ও আর ওর মা, বাড়িতে এই দুটি প্রাণীই থাকত। তার ওপর ওর মায়ের অসুখ

চলছে, শয্যাশায়ী, মরে কি বাঁচে ঠিক নেই। গাঁয়ের অনেকের তখন ধারণা হয়েছিল সরকারবাবু স্রেফ পয়সার লোভে জেসমিনকে ভালোবেসেছে, বিয়ে করতে চাইছে। কারণ, শক্তি সরকার লোকটা খুব সুবিধের ছিল না। নেশা-ভাঙ করত, জুয়া খেলত; তা ছাড়া, মেয়েদের ব্যাপারেও স্বভাব খারাপ ছিল—।

আমি মিস্টার রূপ্সিকে বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'এত কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

হেডম্যান বললেন, 'কিছুটা আমার নিজের জানা। বাকিটা জেনেছি আমার বাবার কাছ থেকে। সে-সময়ে বাবা গাঁওবুড়া ছিলেন। শক্তিবাবুর নামে কয়েকজন মেয়ে বাবার কাছে এসে অভিযোগও করেছিল। কিন্তু জেসমিন আর জেসমিনের মায়ের জন্যে তক্ষুনি তাকে গাঁ থেকে বের করে দেওয়া যায়নি। অবশ্য তার কিছুদিন পরে সরকারবাবু জেসমিনকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যায়। জাটিঙ্গার বসতবাড়িটা বাদে আর সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিল জেসমিন, বেশ কয়েক লাখ টাকা পেয়েছিল।'

'ওর মা কিছু বলেনি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রূপ্সি 'কী আর বলবে! তা ছাড়া, বুড়ির তো তখন মরো-মরো অবস্থা। মাকে ওই অবস্থাতে ফেলে রেখেই জেসমিন চলে যায়।'

'জেসমিনের মা কি এখনও—।'

'না, মারা গেছে। জেসমিন গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী!'

'আচ্ছা, টমাসের সঙ্গে জেসমিনের কি কোনও সম্পর্ক ছিল?'

রূপ্সি হাসলেন 'এ-গাঁয়ে সকলেই সকলের আত্মীয়, মিস্টার চৌধুরী। ছোট জায়গা, লোকজনও কম, তাই আমাদের বিয়ে-থা হয় বলতে গেলে নিজেদের মধ্যেই—অবশ্য ভাই-বোন বাদ দিয়ে। টমাসের সঙ্গে জেসমিনের ওইরকম ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক ছিল বলে জানি না।'

রূপ্সি কথা থামিয়ে চোখ ছোট করে জিগ্যেস করলেন, 'শক্তিবাবুর সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু টমাসও কি বখরা-টখরা কিছু পাচ্ছে নাকি?'

প্রশ্নের মধ্যে ঠাট্টা তো ছিলই, উপরন্তু চাপা একটা সাবধানবাণীও যেন টের পেলাম। নিজের সীমা ছাড়িয়ে বেশি দূর পা বাড়ানোটা ঠিক নয়। উপজাতির মানুষগুলোকে বোঝা মুশকিল, কারণ ওদের মুখে অভিব্যক্তি বলে কিছু নেই। জেসমিন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেল বটে, তবে না জানাও অনেক কিছু রয়ে গেল।

জনকে ইশারা করে গাঁওবুড়ার কাছে বিদায় চাইলাম।

উঠোন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে রূপ্সি বললেন, 'আপনি উকিল, ওকালতির

দরকারে জেসমিন সম্পর্কে যত খোঁজখবর করতে চান করুন। তবে গাঁয়ের লোকজন যদি বিরক্ত হয়ে আমার কাছে অভিযোগ করে তা হলে কিন্তু আপনার অসুবিধে হবে। তখন গাঁ থেকে আপনাকে আমি বের করে দেব।'

শেষের কথাটাও রূপসি বেশ সহজভাবে বললেন। কিন্তু সহজভাবে বললেও কথাটার গুরুত্ব যে এতটুকুও কম নয় তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ওঁকে শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আর জন পাহাড়ি পথ ধরলাম।

ঠিক সেই সময়ে হেডম্যান খাসিয়া ভাষায় ধমকের সুরে জনকে কী যেন বললেন। জন মাথা নিচু করে শুনল। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে অস্পষ্টভাবে কী বলল। তারপর আমার পাশে এসে পা মেলাল। যেটুকু আঁচ করলাম তা হল, এরপর থেকে জনের সাহায্য আমাকে হারাতে হবে। এবং হলও তাই।

পিচের রাস্তায় পৌঁছে জন অনুনয়-বিনয় করে আমার কাছ থেকে মুক্তি চাইল। আমি পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। কিন্তু তাতেও কাজ হল না। ও বারবার কাতরভাবে সাহায্য করার অক্ষমতা জানাতে লাগল। হেডম্যানের কথায় ও ভয় পেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ওকে বললাম, 'তোমাকে আর কোনও সাহায্য করতে হবে না। শুধু ফাদার ওবেস্টিনের সঙ্গে পরিচয়টুকু করিয়ে দাও। তারপরই তোমার ছুটি।'

জনের হাতে আবার একটা বিশ টাকার নোট গুঁজে দিলাম। ও নিমরাজি হল। বলল, 'ফাদার রাত জেগে পড়াশোনার কাজ করেন, দিনে বিশ্রাম নেন। ওঁর সঙ্গে সন্ধেবেলা চার্চে দেখা করাই ভালো।'

শুনে আমি বললাম, 'আজ আর নয়। আজ ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কাল সন্ধেবেলা আমি আসব। পয়েন্টের চায়ের দোকানে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো—।'

জন ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। তারপর বলল, 'মূর্তির কাছে চলুন। সেখানে হাফলঙ যাওয়ার জিপ পাওয়া যেতে পারে—আপনাকে গাড়িতে তুলে দিই।'

জিগ্যেস করলাম, 'মূর্তি মানে?'

জন বলল, 'এ-গাঁয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইউ. লাখোনবঙ সুচ্যাঙের মূর্তি। ১৯০৫ সালে জেমি নাগাদের কাছ থেকে এই গ্রাম কিনে নিয়েছিলেন লাখোনবঙ সুচ্যাঙ। তাঁর মূর্তির কাছেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। ওটা আমাদের গাঁয়ের সীমানা।'

সুতরাং আমরা দুজনে ইউ. এল. সুচ্যাঙের মূর্তির দিকে এগোলাম। চড়া রোদ্দুর মাথায় করে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। একইসঙ্গে খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। ফলে হাফলঙের গেস্ট-হাউসে কতক্ষণে পৌঁছব সে-কথাই ভাবতে লাগলাম।

হাফলঙে ফিরেই আজকের তদন্তের ফলাফল ছোট খাতাটায় টুকে নিতে হবে। যে করে হোক, জেসমিনকে আমি খুঁজে বের করবই। জীবিত অথবা মৃত!

সন্ধেবেলা গেস্ট-হাউসের লাউঞ্জে বসে ছিলাম, এমনসময় হীরেন্দ্র ফুকন এসে পাশে বসলেন। খবরাখবর জিগ্যেস করলেন। ওঁকে বললাম যে, জাটিঙ্গায় পুরো কাজ এখনও মেটেনি। আগামীকাল আবার যেতে হবে। কথায়-কথায় উনি বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, গতকাল আপনাকে ঠিকই বলেছিলাম। দেড় যুগ আগে ফরেস্ট অফিসে জেসমিন নামে একটি মহিলা কাজ করত। তবে বেশিদিন কাজ করেনি, এই বছরখানেক। তারপর সে আবার উধাও হয়ে যায়।'

শক্তিকে খুন করার পর জেসমিন হাফলঙে এসেছিল। থাকত নিশ্চয়ই জাটিঙ্গায়। কই, হেডম্যান তো আজ সকালে সে-কথা আমাকে বললেন না! অথচ জেসমিনের অনেক খবরই তো দিলেন! কিন্তু জেসমিন জাটিঙ্গায় ফিরে এসেছিল কেন? তাও আবার শক্তিকে খুন করার দশ-বারো বছর পর, অন্তত আমার অঙ্কের হিসেব তো সেই কথাই বলছে!

ফুকনকে খবরের জন্য ধন্যবাদ জানলাম। তারপর হেডম্যান ও ফাদার ওবেস্টিন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলাম।

উত্তরে ফুকন বললেন, 'রূপসি লোকটা বেশ ভালো—মানে ভালো ছিল। ইদানীং ঠাটবাটের দিকে নজর গেছে। মডার্ন হতে চায়, বোঝেন না! তার ওপর ব্যবসা শুরু করেছে। কমলালেবু সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, জাটিঙ্গার কমলালেবু তো বিখ্যাত। এ ছাড়া টুকটাক ঠিকাদারির কাজ করছে। ফরেস্টের পয়সা তো, কোনও হিসেব নেই। সব মিলিয়ে লোকটা বেশ ভালোই আছে। তবে ওর গাঁয়ের লোকেদের মুখেই শুনেছি পরের ইলেকশনে ও আর জিততে পারবে না। কে এক স্কুলমাস্টার আছে—সে নাকি জিতবে।'

'আর ফাদার ওবেস্টিন?'

হীরেন্দ্র ফুকনের মুখে খুশির উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। বললেন, 'ওরকম লোক হয় না, মিস্টার চৌধুরী। সারাটা জীবন শুধু পরের জন্যেই করে গেলেন। ওরকম জ্ঞানী-গুণী মানুষ জাটিঙ্গায় কেন, হাফলঙেও পাবেন না। আপনার কাজের ব্যাপারে কোনও প্রয়োজন হলে ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন, প্রাণ দিয়ে ফাদার আপনাকে সাহায্য করবেন...।'

মনটা আমার নেচে উঠল। ফাদার ওবেস্টিন যদি আমাকে সাহায্য করেন তা হলে সত্যিই আমার কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। ঠিক করলাম, কাল বিকেলে জিপ ধরে জাটিঙ্গা যাব। রাতে যদি কোনও গাড়ি-টাড়ি ধরে লিফট্ নিয়ে ফিরতে পারি ভালো, নইলে ফাদারের বাড়িতে বা পয়েন্টের চায়ের দোকানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেব। ফুকনকে সেই কথাই বললাম।

রাতে মাকে আর মিতাকে আলাদা করে দুটো মামুলি চিঠি লিখলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম।

স্বপ্নে জেসমিনের মুখটা আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল। ওকে দেখলেই আমি এখন চিনে নিতে পারব। চাপা নাক, ছোট চোখ, কিন্তু ফুটফুটে সুন্দরী। জানি না, যদি বেঁচে থাকে, তা হলে এই সৌন্দর্যের কতটুকু এখন অবশিষ্ট আছে।

তারপর একইসঙ্গে দেখা দিল শক্তি ও টমাস। টমাসের মুখ একেবারে ছবির মতো স্পষ্ট। আজ যে-টমাসের সঙ্গে কথা বলেছি তাকে ঠেলে তিরিশ-বত্রিশটা বছর পিছিয়ে দিলে স্বপ্নের টমাসকেই যে দেখতে পাব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওদের দুজনকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে শরীরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করলাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন টের পেলাম মাথার ব্যথাটা একদম নেই। আমার অসুখ কি তা হলে ধীরে-ধীরে সেরে যাচ্ছে?

ফাদার ওবেস্টিন বেশ লম্বা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মাথার চুল প্রায় সবই সাদা। মুখে অসংখ্য ভাঁজ। ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি।

উপাসনা শেষ হওয়ার পর আমি গির্জার ভেতরে ঢুকেছি। সেখানে বেঞ্চিতে বসে জন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

জাটিঙ্গায় নেমে জনকে চায়ের দোকানে পাইনি। শুনলাম যে, উপাসনার সময় হয়ে যাওয়ায় সে চার্চে চলে গেছে। আমাকে সেখানে দেখা করতে বলেছে।

হীরেন্দ্র ফুকনের পরামর্শে সঙ্গে টর্চ নিয়েছিলাম। এখন সেটা কাজে লাগল। চারিদিকে গাঢ় কুয়াশা। আকাশে চাঁদ-তারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুনলাম, বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টিও নাকি হয়ে গেছে। অগত্যা দোকানীর কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে আঁকাবাঁকা পিচের রাস্তা ধরে রওনা হলাম। দু-পাশে অন্ধকার জঙ্গল। সেখান থেকে ভেসে আসছে কান-ফাটানো ঝিঁঝির ডাক।

পাহাড়ি পথে বার চার-পাঁচ আছাড় খেয়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চার্চের কাছে পৌঁছলাম। সেখানে তখন উপাসনা চলছে। লাউডস্পিকারে শোনা যাচ্ছে ধর্মযাজকের কণ্ঠস্বর।

চার্চের সামনে বেশ বড় কম্পাউন্ড, ঘাসে ছাওয়া। সীমানায় বড়সড় কয়েকটা গাছ রয়েছে, তবে কুয়াশার জন্য পুরোপুরি ঠাহর করা যাচ্ছে না।

চার্চের বাড়িটা পুরনো। তার দু-পাশের দুটো দরজা খোলা। মাঝে একটা বন্ধ রঙিন কাচের জানলা। এক দরজার মাথায় একটা সাইনবোর্ড, তার ওপরে টিমটিমে একটা বাল্‌ব জ্বলছে। খুব কাছে এগিয়ে বড় হরফের লেখাগুলো পড়া গেল।

ইংরেজিতে লেখা প্রেসবিটারিয়ান চার্চ, স্থাপিত ১৯১০ সাল।

বাইরে দাঁড়িয়ে উপাসনা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। চার্চে এখনও লোকজন ঢুকছে। দেরি হলেও ঈশ্বরের আবাসে নিয়মিত হাজিরাটি জাটিঙ্গার খাসিয়াদের কাছে একান্ত জরুরি। আমার জেসমিনের কথা মনে পড়ল। ও-ও নিশ্চয়ই ঈশ্বর-ভক্ত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদ্যপ জুয়াড়ি স্বামীকে খুন করতে ওর হাত কাঁপেনি। টমাসেরও না। অবশ্য সব দেশেই ঈশ্বর-ভক্ত খুনির সংখ্যা কম নয়।

বেশ শীত-শীত করছিল। তার মধ্যে আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। চার্চের দরজার সামনে টিনের দোচালা ছোট ছাদন ছিল, তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরে উপাসনা শেষ হল। লোকজন বেরোতে শুরু করল। আর বৃষ্টিও যেমন আচমকা এসেছিল, সেরকম আচমকাই থেমে গেল।

এমনসময় টমাসকে লক্ষ করলাম।

অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। সঙ্গী দু-একজন লোকের সঙ্গে কথাও বলছিল। হঠাৎই আমার দিকে ওর চোখ পড়ল। আমাদের চোখাচোখি হল।

টমাস ক্রুদ্ধ চোখে জোরালো পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল, চার্চের সামনে আমি কোন প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি বললাম যে, ফাদার ওবেস্টিনের সঙ্গে দেখা করব। তাতে ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপরই আগুন-ঝরা চোখে আমাকে ভস্ম করে দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা করে ও চলে গেল। মনে হল, ও ভয় পেয়েছে। আর একইসঙ্গে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমিও যে এখন মরিয়া। সুতরাং গির্জায় ঢুকে পড়লাম...।

আমি, জন ও ফাদার ওবেস্টিন গির্জা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। রূপসির ধমকে ওর ভয় এখনও কাটেনি। ফাদারের সামনে ওকে আর কিছু বললাম না। শুধু বললাম, কাল যদি ওকে খোঁজ করি তা হলে কোথায় পাব। ও বলল, পয়েন্টের চায়ের দোকানে খবর রেখে যাবে।

ফাদার আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

যথারীতি চা ও তাম্বুলে আপ্যায়িত হলাম। পথে ফাদারকে জেসমিনের কথা বলেছিলাম। উনি সঙ্গে-সঙ্গে বলেছেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো চিনি। বাঙালি বিয়ে করেছিল তো? আমি নিজের হাতে ওর বিয়ে দিয়েছি। চলুন, বাড়িতে চলুন, সেখানে বসে সব কথা হবে।'

বাড়িতে পৌঁছে নিজেকে উকিল বলে পরিচয় দিলাম এবং শক্তির সম্পত্তিলাভের কথা বললাম।

ফাদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'মনে পড়ছে। শক্তি সরকার, কন্ট্রাক্টরির কাজে জাটিঙ্গায় এসেছিল। তারপর জেসমিনকে বিয়ে করে। বাঙালির সঙ্গে বিয়ে বলেই ঘটনাটা আমার এখনও মনে আছে। তবে শক্তি সরকার লোকটি খুব ভালো ছিল না। নাস্তিক, মদ্যপ, জুয়াড়ি, আরও অনেকরকম দোষ ছিল তার, গাঁয়ের লোকের কাছেই শুনতাম—।'

আমার খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ফাদারের অভিযোগগুলো যেন আমাকে লক্ষ করেই। জন্মান্তরের পাপবোধ আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল।

ফাদার তখন বলছিলেন, 'বিয়ের পর ওরা জাটিঙ্গা ছেড়ে চলে যায়। যদ্দুর শুনেছি কাশ্মীরে...টমাস ভালো বলতে পারবে। আপনি ওকে হয়তো চেনেন না, এ-গাঁয়েরই লোক। ওর সঙ্গে জেসমিনের যোগাযোগ ছিল।'

ফাদার ওবেস্টিনের শেষদিকের কথাগুলো আমার কানে ঢুকছিল না। শুধু ভাবছিলাম, কাশ্মীর! কাশ্মীর! জেসমিন শক্তিকে নিয়ে কাশ্মীরে চলে গিয়েছিল! তা হলে কি স্বপ্নে যে-লেক আমি দেখি সেটা ডাল লেক? লেক...আলোকমালা...ছিপ...ফুলের বাগান!

স্বপ্নের ছবিগুলো আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। বিস্ময় আমাকে অভিভূত করে দিল। কাশ্মীরে আমি কখনও যাইনি। কিন্তু অনেক পড়েছি, গল্পও শুনেছি। ডাল লেক...হাউসবোট...শিকারা...চশমাশাহি...নিশাতবাগ...গুলমার্গ...পহেলগাঁও...!

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখের সামনে আচমকা অন্ধকার পরদা নেমে এল। আমি দু-হাত ছুড়ে খাসিয়া ভাষায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করলাম। জেসমিনের নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগলাম। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই টলে পড়ে গেলাম মেঝেতে।

সংবিত ফিরতেই দেখি ফাদার আমার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। তাঁর দু-চোখে অবাক বিস্ময় খেলা করছে। কী বলবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

আমাকে ধরে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিলেন ফাদার। এমনসময় একটি কিশোরী অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করে একগ্লাস দুধ দিয়ে গেল।

ফাদার বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, দুধটা খেয়ে নিন।'

ঢকঢক করে গ্লাসটা খালি করে দিলাম।

ফাদার খালি গ্লাসটা মেঝেতে একপাশে নামিয়ে রাখলেন। তারপর মুখ তুলে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি খাসিয়া ভাষা কোথায় শিখলেন?'

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে ফাদারের দু-হাত চেপে ধরলাম। বললাম, 'ফাদার, আমিই গতজন্মে জেসমিনকে বিয়ে করেছিলাম। ও-জন্মের কনট্রাক্টর শক্তি সরকার

এ-জন্মের অধ্যাপক রণবীর চৌধুরী। বিশ্বাস করুন, ফাদার, ঈশ্বরের শপথ নিয়ে বলছি! আমাকে আপনি সাহায্য করুন। ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন।'

আমার গলা জড়িয়ে আসছিল। ফাদার আমার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'তুমি কি জানো, গতজন্মে জেসমিন তোমাকে খুন করেছিল?'

আমি ভাঙা গলায় বলে উঠলাম, 'সব জানি, ফাদার, সব জানি—।'

ফাদার ওবেস্টিন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'বেচারি জেসমিন!'

আমি সংক্ষেপে ফাদারকে সব খুলে বললাম। বললাম যে, জেসমিনের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আমার জীবন নরক হয়ে উঠেছে। আমি বেঁচে থেকেও প্রতি মুহূর্তে মরে যাচ্ছি।

তখন ফাদার বললেন, 'জন্মান্তরের গল্প অনেক শুনেছি, কিন্তু জাতিস্মর আমি স্বচক্ষে কখনও দেখিনি। আজ দেখলাম। তোমাকে সাহায্য না করলে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন না। জেসমিন পাপ করেছে। কিন্তু শক্তি সরকার অমানুষ ছিল, আর জেসমিনকেও আমি বড় স্নেহ করতাম। তাই ওর পাপ আমি প্রকাশ করিনি। তা ছাড়া, কোনও পাপীর অনুতাপ, অনুশোচনা এলে যিশু তাকে ক্ষমা করেন। সেখানে আমি শাস্তি দেওয়ার কে!'

আমাকে শক্তি সরকার ধরে নিয়ে ফাদার দিব্যি বলে যেতে লাগলেন, 'তোমাকে বিয়ে করার পর জেসমিন কাশ্মীর চলে যায়, তোমার সে-কথা মনে নেই। তার মাস ছয়েক পর টমাস চলে যায় জাটিঙ্গা ছেড়ে। শুনেছি, জেসমিন নাকি টমাসকে নিয়মিত চিঠি দিত। আগেই বলেছি, শক্তি সরকার, মানে তুমি, এক জঘন্য অমানুষ ছিলে। স্রেফ টাকার লোভে তুমি বিয়ে করেছিলে জেসমিনকে। তা ছাড়া, সেই সময়ে তোমার ব্যবসায় কাঁচা টাকার টান পড়েছিল। আমরা জেসমিনকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু ও কারও কথাই শোনেনি, প্রেম এমনই অন্ধ! সে যাই হোক, জেসমিনের চিঠিতে টমাস জানতে পারে তুমি ওর ওপরে নিয়মিত অত্যাচার করছ। টমাস বোধহয় জেসমিনকে পছন্দ করত। তাই ওর দুঃখ-কষ্টের কথা জানতে পেরে টমাস চলে যায় কাশ্মীরে। প্রায় বছর দশ-বারো পরে টমাস ও জেসমিন জাটিঙ্গায় ফিরে আসে। শক্তির সম্পর্কে কোনও কথাই ওরা বলত না। প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যেত, সে শ্রীনগরে আছে। কিন্তু একদিন রাতে চার্চে এসে আমার সামনে ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি করল জেসমিন। আমি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই কি প্রেমের পরিণতি!

'জেসমিন স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল। সেই সুবাদে হাফলঙে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেতে কোনও অসুবিধে হল না। চাকরি করে ও টাকা জমাতে

লাগল। টমাসও ওকে বেশ কিছু টাকা দিয়েছিল বলে শুনেছি। এইভাবে বছরখানেক চাকরি করার পর হঠাৎ একদিন জেসমিন আবার জাটিঙ্গা ছেড়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে সম্পত্তির শেষ কণাটুকুও বিক্রি করে দিয়ে গেল। টমাস ওর সঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই ফিরে আসে। তারপর থেকে টমাস মাঝেমাঝেই জাটিঙ্গা ছেড়ে উধাও হয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। জানি না, ওর সঙ্গে জেসমিনের এখনও যোগাযোগ আছে কি না। তবে আমার ধারণা, জেসমিন যদি বেঁচে থাকে তা হলে শ্রীনগরেই আছে। টমাস তোমাকে হয়তো বিশদ খবর দিতে পারবে। তুমি ওর কাছে যাও—।'

কৃতজ্ঞতায় ফাদারের হাত জড়িয়ে ধরলাম আবার। তাঁর হাতে চুমু খেলাম। চোখ বুজে উনি বললেন, 'গড বি উইথ য়ু। উইশ য়ু বেস্ট অফ লাক।'

ফাদার ওবেস্টিনের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম পাহাড়ি পথে। টমাসের সঙ্গে আমি আর-একবার কথা বলতে চাই। গতকাল ও বলেছিল জেসমিন মরে গেছে। মনে হচ্ছে, সে-কথা সত্যি নয়। সত্যি হতে পারে না।

আমার বুকের ভেতরে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছিল।

অন্ধকারে কুয়াশায় পথ ভুল করে কোন দিকে চলেছিলাম জানি না, হঠাৎ চাপা গলায় কেউ আমাকে ডাকল।

টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফেলতেই জনকে দেখতে পেলাম। একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

ওকে বললাম যে, টমাসের বাড়ি যেতে চাই। শুনে জন বলল, 'ওকে কি এখন বাড়িতে পাবেন? হয়তো পাখি মারতে বেরিয়েছে। আজ রাতে পাখি পড়বে। দেখছেন না, সবাই হ্যাজাক জ্বালিয়েছে।'

কথাটা ঠিক। গাঢ় কুয়াশার মধ্যেও পাহাড়ি গাঁয়ের এখানে-ওখানে হ্যাজাকের আলো চোখে পড়ছিল। শুনতে পাচ্ছি লিকলিকে লাঠি চালানোর সাঁই-সাঁই শব্দ, আর ক্বচিৎ-কদাচিৎ পাখির ডাক।

জনকে বললাম, 'তবু চলো, একবার দেখে আসি।'

ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল। ওকে দশটা টাকা দিলাম, বললাম, 'জাটিঙ্গায় আমার আপন লোক বলতে তুমি। তোমার কথা আমি মনে রাখব।'

জন ধন্যবাদ জানিয়ে জিগ্যেস করল, ফাদার ওবেস্টিনের কাছে আমার কাজ সফল হয়েছে কি না। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হয়েছে। হয়তো আগামীকালই আমি তোমাদের গ্রাম ছেড়ে, হাফলঙ ছেড়ে, চলে যাব।'

ও একপলক আমার দিকে তাকাল। কিছু বলল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

টমাসের বাড়িতে পৌঁছে দেখি বসবার ঘরের দরজা খোলা। ঘরে অল্প পাওয়ারের একটা বাল্‌ব জ্বলছে। টমাসকে দেখতে পেলাম না।

চাপা গলায় জনকে বললাম, 'চুপ, কোনও শব্দ কোরো না। এখানে দাঁড়াও, আমি ঘরটা একবার দেখে নিই।'

এপাশ-ওপাশ দেখে চুপিসাড়ে ঢুকে পড়লাম ঘরে। সোজা গিয়ে হাজির হলাম দেওয়ালে টাঙানো গ্রুপ ফটোটার সামনে। আলো কম হচ্ছিল, তাই হাতে টর্চ জ্বেলে তাক করলাম ছবির দিকে। কাল দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, এখন তার প্রমাণ পেলাম। কারণ, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওদের তিনজনকে আমি খুঁজে পেলাম।

জেসমিন, টমাস ও শক্তি।

শক্তিকে চিনতে কোনও ভুল হল না। কারণ, ছবিতে সবাই খাসিয়া, কেবল শক্তি সরকারই বাঙালি। জেসমিনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জেসমিন! আমার হত্যাকারী!

বাতাস কাটার 'সাঁই' শব্দটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার পিঠটা কেউ যেন ব্লেড দিয়ে চিরে দিল। যন্ত্রণার এলোমেলো তরঙ্গ রক্ত-মাংস বেয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে গেল মাথার দিকে, মস্তিষ্কের ভেতরে। হাজারটা দেশলাইকাঠি ফস্‌ করে জ্বলে উঠল একসঙ্গে। ঘুরে তাকালাম।

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় আঘাতটা এসে পড়ল হাতের ওপরে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। আঘাতটা সামলে উঠতে চেষ্টা করলাম। ততক্ষণে টমাস তৃতীয় আঘাতের জন্য তৈরি হয়েছে। ওর হাতে পাখি মারার বাঁশের লাঠি। মুখে হিংস্র হাসি। একইসঙ্গে নিজস্ব ভাষায় উত্তেজিতভাবে কিছু বলে চলেছে।

আমি জনের নাম ধরে বার-তিনেক ডেকে উঠলাম, কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না। যন্ত্রণায় কণ্ঠস্বর যে কতখানি বিকৃত হয়ে যেতে পারে সে-বিষয়ে কোনও ধারণা ছিল না। ফলে নিজের গলা শুনে নিজেই ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। আর তখনই তৃতীয় আঘাতটা এসে পিঠের ওপর পড়ল। মনে হল, কেউ গ্যাস-কাটার দিয়ে আমার শরীরটা কাটছে—কাটছে—কাটছে।

হাতের লাঠি ফেলে টমাস এবার জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড রাগ ও যন্ত্রণায় হাতের টর্চটা আধপাক শূন্যে ঘুরিয়ে সজোরে বসিয়ে দিলাম। টমাসের মাথায়।

ওর হাত হিংস্র শক্তিতে আমাকে খামচে ধরেছিল। টর্চের আঘাতটা করামাত্রই একটা 'ওঁক' শব্দ বেরিয়ে এল টমাসের মুখ থেকে, এবং ওর হাতের বাঁধুনি শিথিল হয়ে গেল।

আমি আহত চিতাবাঘের মতো উঠে দাঁড়ালাম, যদিও পুরোপুরি সোজা হতে পারছিলাম না। অধ্যাপক রণবীর চৌধুরীর পোশাকটা কখন যেন আমার গা থেকে খুলে পড়ে গেছে। তার বদলে আগের জন্মের অমানুষটা ঢুকে পড়েছে আমার শরীরে। চোখের সামনে শিকারটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। রাতের আঁধারে ডাল লেকের জল কেটে আমার কাছে এগিয়ে আসছে। শিকারায় বসে আছে জেসমিন, আর এই লোকটা—যে এখন আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে, শরীরের সাড় ফেরানোর চেষ্টা করছে।

নিচু হয়ে টর্চটা এলোপাতাড়ি বসিয়ে দিতে লাগলাম টমাসের গায়ে, মাথায়, হাতে, পায়ে, যেখানে খুশি। আমার ধুনুরিদের কথা মনে পড়ছিল। এই লোকটা আগের জন্মে আমার শত্রু ছিল। ও বলেছিল, জেসমিন মরে গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে! না, সব শেষ হয়নি। শেষঅঙ্কের এই তো সবে শুরু!

যখন আমার উন্মত্ততা কমল তখন বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছি। শরীরের ঘাম কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে। পিঠ জ্বালা করছে, মন জ্বালা করছে। অশক্ত পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। টমাসের বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। আর থাকলেও আমি পরোয়া করি না। জেসমিনের ঠিকানা আমাকে জানতেই হবে।

সুতরাং তুবড়ে যাওয়া টর্চটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে টমাসের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওকে ঝাঁকুনি দিলাম। নাম ধরে ডাকলাম কয়েকবার।

কিছুক্ষণ পরে ও নড়ে উঠল সামান্য। যন্ত্রণার টুকরো-টুকরো আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর ঠোঁট চিরে। ঘরে আলোর তেজ কম থাকায় ওর শরীরের আঘাতগুলো ঠিকমতো নজরে পড়ছে না। তবে থেঁতলে যাওয়া চোয়ালটা বেশ স্পষ্ট।

'টমাস! টমাস!'

যন্ত্রণাক্লিষ্ট গলাতেই ও চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'হু দ্য হেল আর ইউ বাস্টার্ড?'

আমি সপাটে এক লাথি কষিয়ে দিলাম ওর কোমরে। বললাম, 'আমি শক্তি, জেসমিনের স্বামী। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ও কোথায়? শীগ্‌গিরি বলো কোথায় আছে ও?'

অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনাটা ঘটে গেল।

টমাস গড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বড়-বড় চোখ মেলে দেখতে চেষ্টা করল আমাকে। বুঝতে পারছি, ও আমাকে ঝাপসা দেখছে। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের ক্ষমতা সেই মুহূর্তে ওর ছিল বলে আমার মনে হয়নি।

'হোয়াট? শক্তি! শক্তি তো মরে গেছে। তিরিশ বছর আগে।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ডাল লেকের নীচে লতাপাতায় জড়িয়ে ও শুয়ে আছে।

ওকে খুন করেছে জেসমিন, আর তুমি।'

টমাস ভয় পেল। কোনওরকমে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। ভাঙাচোরা গলায় জিগ্যেস করল, 'তুমি কী করে এসব জানলে?'

আমি হাসলাম, বললাম, 'সত্যিই তো, কী করে জানব! তখন তো আমি মরে গেছি!'

'ওঃ গড!' টমাস চোখ বুজল।

আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। মাথা দপদপ করে উঠল আচমকা। আমি খাসিয়া ভাষায় চিৎকার করে উঠলাম। বললাম, 'আমি ফিরে এসেছি, টমাস! জেসমিনকে আমার চাই! বলো, ও কোথায় থাকে?'

টমাস সত্যি-সত্যি কেঁপে উঠল। তারপর আতঙ্কঘন চোখে আমাকে দেখতে লাগল। শেষে অস্ফুট গলায় বলল, 'ডাল লেক, নেহরু পার্ক, শ্রীনগর। হাউসবোটে থাকে— ।'

তারপরই ওর ঘাড়টা একপাশে কাত হয়ে গেল।

ওর নাকের কাছে হাত রেখে বুঝলাম, মরেনি। জ্ঞান হারিয়েছে। মাথার আঘাতগুলো বোধহয় খুব আস্তে হয়নি। কে জানে, ইন্টারনাল হেমারেজ শুরু হয়েছে কি না!

গ্রুপ ফটোটা দেওয়াল থেকে খুলে নিলাম। ফটোর ফ্রেম-কাচ আছড়ে ভেঙে ছবিটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকালাম। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে দরজা খুলে অন্ধকার কুয়াশায় বেরিয়ে এলাম।

দূর থেকে ভেসে আসছে বাতাস কাটার 'সাঁই-সাঁই' শব্দ, আর 'সিম্ সিম্' রবের কোলাহল। খাসিয়া ছেলেরা পাখি মারছে। তিরিশ বছর আগে শক্তিও মেরেছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, সময়ের ব্যবধানটা আর নেই। এই মুহূর্তে বাঁশের লাঠি নিয়ে পিটিয়ে পাখি মারতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। গতজন্মের অমানুষটা আমার শরীর ছেড়ে এখনও যায়নি।

অন্ধকারে পাহাড়ি পথ ধরে ফিরতে লাগলাম। যে করে হোক, পয়েন্টের চায়ের দোকানে আমাকে পৌঁছতে হবে। কোনও লরি-ট্রাক-জিপ যা হোক ধরে এক্ষুনি রওনা হতে হবে হাফলঙে। জাটিঙ্গায় কোনও হইচই হওয়ার আগেই। তারপর কাল সকালেই আমার নতুন যাত্রা শুরু হবে। জেসমিন। শ্রীনগর।

আমার শরীর অসম্ভব জ্বালা করছিল।

ছয়

ভূস্বর্গ কাশ্মীর।

নাম বহুবার শুনেছি, তবে পদার্পণ এই প্রথম।

হাফলঙ থেকে গৌহাটি হয়ে দিল্লি, দিল্লি থেকে জম্মু, সেখান থেকে দশ ঘণ্টার বাস-জার্নি করে শ্রীনগর।

পথে আবার দুটো চিঠি দিয়েছি মাকে আর মিতাকে। ওরা নিশ্চয়ই ভীষণ চিন্তায় আছে আমার জন্য। ওদের জন্য আমার চিন্তাও কি কম!

এর মধ্যে বেশ কয়েকবার স্বপ্ন দেখেছি জেসমিনকে। স্পষ্টভাবে দেখেছি ওর মুখ। আর সঙ্গে আনা ছবিটার সঙ্গে বারবার মিলিয়ে নিতে চেয়েছি সেই মুখকে। যতবার দেখছি ততবার ডাল লেকে পৌঁছনোর জন্য মনটা ছটফট করে উঠছে। দেখতে ইচ্ছে করছে কোথায় আমি মারা গিয়েছিলাম।

বাসে জম্মু থেকে রওনা হয়েছিলাম সকালে। খুব ইচ্ছে থাকলেও জানলার ধারে সিট পাইনি। সেটি পেয়েছে বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের এক তরুণী। ফরসা। ধারালো নাক-মুখ। ঈষৎ বাদামী চোখ। বড়-বড় চোখের পাতা। আমি আসন পেয়েছি তার পাশে। সুতরাং জানলার ধারে বসতে না পাওয়ার দুঃখ কিছুটা পুষিয়ে গিয়েছিল।

সফরের লম্বা পথ। সুতরাং মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করলাম।

নাম নিকিতা। জম্মু ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। হোস্টেলে থাকে। মাস-দুয়েক বাদে এম. এসসি. ফাইনাল পরীক্ষা। এখন ক্লাস শেষ হওয়ায় ছুটিতে বাড়ি ফিরছে। বাড়ি শ্রীনগরে।

আমি সংক্ষেপে আমার নাম ও পেশা জানালাম। বললাম, 'কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছি, একা।'

আলাপে জানা গেল আমরা দুজনেই ফিজিক্সের লোক। সে নিয়ে কিছুটা হাসাহাসিও হল। এবং আমি ওকে 'তুমি' বলার অধিকার পেলাম।

আমি মুগ্ধ হয়ে পথের নিসর্গ-সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। আমার গলা উঁচু করে জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখার চেষ্টায় নিকিতা হেসে বলল, 'আমাদের সিট দুটো বদল করলে কোনও আপত্তি আছে?'

আমি বললাম, 'তোমাকে বঞ্চিত করে আমি সুযোগ নিতে চাই না।'

ও হাসল, বলল, 'এ-দৃশ্য আমি তো বহুবার দেখেছি। হয়তো আরও কতবার দেখব। কিন্তু আপনি তো ট্যুরিস্ট। আবার কবে আসেন না আসেন—।'

সুতরাং দুজনে আসন বদল করলাম। গায়ে-গায়ে ছোঁওয়া লাগল। জানি, উচিত নয়, তবুও আমার ভালো লাগল। হয়তো নিকিতার হালকা প্রসাধনের সৌরভ, ওর সৌন্দর্য, আর জানলার বাইরের মনোরম প্রকৃতি আমাকে দুর্বল করে তুলছিল, অবশ করে দিচ্ছিল চেতনা।

পথের দৃশ্য আমাকে জাতিস্মার কথা ভুলিয়ে দিচ্ছিল। ভুলিয়ে দিচ্ছিল সেই মুহূর্তগুলোর কথা, যখন আমি শক্তি সরকার হয়ে টমাসের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলাম। গতজন্মের প্রভাব আমাকে তখন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন সুন্দর সকাল, সোনালী রোদ, সবুজ গাছপালা, উঁচু-নিচু পাহাড়, মেঘ-আকাশ আর পাশে বসা নিকিতা আমার সব আশঙ্কা ভুলিয়ে দিয়েছে।

আমি কাশ্মীর নিয়ে ছেলেমানুষের মতো নানান প্রশ্ন করছিলাম আর নিকিতা ধৈর্য ধরে হাসিমুখে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। বলছিল ঝিলম নদীর কথা, কল্‌হনের লেখা 'রাজতরঙ্গিণী'-র কথা, সম্রাট অশোকের কথা। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক শ্রীনগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে যে-শ্রীনগর শহর সকলে দ্যাখে সেটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দ্বিতীয় প্রবরসেনা। ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ রাজধানী শ্রীনগর ভ্রমণে এসে শহরটিকে যেখানে দেখেছিলেন শহরটি এখনও ঠিক সেই জায়গাতেই আছে। সম্রাট আকবর যখন এই উপত্যকা দখল করেন তখন বিভিন্ন মসজিদ ও ফুলবাগিচায় মোগল সাজে সাজিয়ে তোলেন শ্রীনগরকে। ১৮১৯ সালে মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময়ে শেষ মোগলরাজ পরাজিত হন শিখদের কাছে। ১৮৪৬-এ 'অমৃতসর চুক্তি' অনুসারে ডোগ্‌রাদের হাতে কাশ্মীর তুলে দেয় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী। শেষে ১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ হিসেবে ঘোষিত হয়।

আমি একসময় হেসে বললাম, 'শুনে তো মনে হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট ফিজিক্স নয়, হিস্ট্রি।'

নিকিতা হাসল, বলল, 'তা নয়, আসলে আপনি ভুলে যাচ্ছেন এটা আমার দেশ, জন্মভূমি।'

আমার কলকাতার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মায়ের কথা, মিতার কথা।

সুদীর্ঘ পথ খুব সুন্দরভাবে কেটে গেল।

সন্ধের পর বাস আমাদের পৌঁছে দিল ট্যুরিস্ট সেন্টারে। বিদায় নেওয়ার সময় নিকিতাকে বললাম, 'সাহস করে একটা প্রস্তাব করতে পারি?'

ও বলল 'নিশ্চয়ই।'

'আমি তো ট্যুরিস্ট, তোমাদের অচেনা দেশে বেড়াতে এসেছি। আর তোমার ছুটির সবে শুরু। তোমার পড়াশোনার যদি তেমন ক্ষতি না হয়, তা হলে শ্রীনগরটা আমরা দুজনে মিলে কি ঘুরে-ফিরে দেখতে পারি?'

নিকিতা হেসে বলল, 'গাইড হতে বলছেন?'

'না, গাইড নয়, বরং অন্ধের যষ্টি হতে বলছি।'

ও সুন্দর করে হাসল। কিছুক্ষণ কী ভেবে বলল, 'কোন হোটেলে উঠছেন?'

বললাম, 'গ্রিন ভিউ হোটেলে।'

হাফলঙে হীরেন্দ্র ফুকনের কাছে এই হোটেলের কথা শুনেছিলাম। হোটেলটা নেহরু পার্কের কাছাকাছি।

নিকিতা বলল, 'ঠিক আছে, কাল সকাল ন'টা নাগাদ আপনার হোটেলে আসব। থাকবেন।'

ওর চোখে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'আমার সৌভাগ্যের সীমা নেই। কাল সকালের জন্যে এখন থেকেই অপেক্ষায় রইলাম।'

নিকিতা চলে গেল।

আমি মুগ্ধ হয়ে ওর চলে যাওয়া দেখতে থাকলাম। ট্যুরিস্ট সেন্টারের ভিড়, টিউব লাইটের আলো, কলগুঞ্জন, কিছুই আমাকে স্পর্শ করছিল না।

পরের তিনটে দিন স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল।

এ-স্বপ্নে শক্তি নেই, জেসমিন নেই। রয়েছে শুধু নিকিতা, আর আমি। আমি এখন শুধুই রণবীর চৌধুরী। নিকিতার সাহচর্যে আমার মন থেকে গতজন্মের শক্তি সরকার কোথায় যেন মিলিয়ে যেতে লাগল। তার বদলে ক্রমেই প্রকাশিত হয়ে উঠল আগের স্বাভাবিক রণবীর চৌধুরী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা ভ্রমণবিলাসী হয়ে ভূস্বর্গের রূপ-রসের আস্বাদ নিতে লাগলাম।

শ্রীনগরের দেখার জায়গাগুলো একে-একে আমাকে ঘুরিয়ে দেখাল নিকিতা। নেহরু পার্ক, চশমাশাহি, নিশাতবাগ, শালিমারবাগ, শঙ্করাচার্যের মন্দির, হজরতবল, কিছুই বাদ দিলাম না আমরা। বেড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে লালচকে গিয়ে কিছু কেনাকাটাও সেরেছি, আবার ডাল লেকের জলে ভেসে বেড়িয়েছি শিকারা নিয়ে।

ডাল লেকের সবুজ জলের দিকে তাকিয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছে বারবার। শিকারায় ভেসে বেড়ানোর সময়ে চলমান জলের দিকে নজর ছুটে গেছে ক্ষণে-ক্ষণে। জলের নীচে নানারকম ঝাঁজির নড়াচড়া দেখতে-দেখতে মনে হয়েছে এই বুঝি খুঁজে পাব তিরিশ বছর আগেকার পুরনো একটা লাশ। মুখে-মাথায় লতাপাতা জড়ানো, ফুলে ওঠা দেহ, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ, গলায়-বুকে প্রাচীন ক্ষতচিহ্ন। আমার গতজন্মের মৃতদেহ।

আমার অস্বস্তি বোধহয় নিকিতার নজর এড়ায়নি। ও জিগ্যেস করেছে, 'কী হল? কোনও অসুবিধে হচ্ছে?'

আমি বলেছি, 'না, কিছু না।'

ঠিক একইরকম অস্বস্তি পেয়েছি চশমাশাহি বাগানে গিয়ে। এ-বাগান আমার

কতদিনের চেনা! গতজন্মে জেসমিনকে পাশে নিয়ে এখানে আমি বহুবার ঘুরে বেড়িয়েছি।

শেষদিন আমরা গিয়েছিলাম গুলমার্গে। যদিও এখন বরফের সময় নয়, তবুও জায়গাটাকে আমি চিনতে পারলাম।

দূরে একটা লাল রঙের কাঠের বাড়ি : হোটেল। আরও নতুন কয়েকটা ঘরবাড়ি চোখে পড়ল। তিরিশ বছর নেহাত কম সময় নয়। অনেককিছুই পালটে গেছে।

গুলমার্গের সাবলীল উঁচু-নিচু জমি এখন ফুলে-ফুলে ঢাকা। ট্যুরিস্টের জমজমাট ভিড়। নিকিতার সৌরভ আমার নাকে আসছে। সব মিলিয়ে মনটা যেন বলে উঠল বারবার : এখানে আমি এসেছি! এখানে আমি আগেও এসেছি!

তিনটে দিন আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলল।

নিকিতা হয়ে গেল নিকি। আর আমি ওর বন্ধু হয়ে গেলাম। ওকে বললাম, 'জানো, আমার আর কোনও সুন্দরী বন্ধু নেই।

ও হেসে বলল, 'যাক, একটা অভাব অন্তত মেটাতে পেরেছি।'

তিনদিনে কত কথা যে আমরা বলেছি তার কোনও হিসেব নেই। এমনকী পদার্থবিজ্ঞান, জন্মান্তরবাদ, স্বপ্ন—এসব বিষয়ও আলোচনায় ঢুকে পড়েছে বারবার। সময় কোথা দিয়ে পেরিয়ে গেছে তার কোনও হিসেব পাইনি আমরা।

প্রতিদিন সন্ধেবেলা নিকি চলে যেত। আসত আবার পরদিন সকালে। আমরা আবার বেরিয়ে পড়তাম কাশ্মীর দেখতে।

সন্ধে সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ ও যখনই চলে যেত, তখনই আমার মনটা কেমন ভারী হয়ে যেত। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগত নিজেকে। হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম আঁধার-সুন্দরী ডাল হ্রদকে। অসংখ্য হাউসবোটের আলোকমালা ডাল লেকের জলে ছড়িয়ে দিয়েছে নানা বর্ণের আলোকতরঙ্গ।

দেখতে-দেখতে আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেত। ছবিটাকে আমি নিশ্চিতভাবে চিনতে পারতাম। কল্পনার চোখে দেখতাম, অন্ধকার জলে আমি সাঁতার কাটছি, আর একটা ভয়ঙ্কর শিকারা শ্লথ অথচ অমোঘ গতিতে এগিয়ে আসছে আমাকে লক্ষ করে। আমার বুক কেঁপে উঠত আশঙ্কায়। মনে পড়ে যেত, আমার উদ্দেশ্যর কথা, আমার কাশ্মীরে আসার আসল কারণ, জেসমিনকে খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞার কথা।

হোটেলের মালিককে এবং দু'একজন কর্মচারীকে জেসমিন নামটা বলে একটু-আধটু জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। বলেছি, বছর তিরিশ আগে একজন যুবক ডাল লেকের জলে ডুবে মারা গিয়েছিল এরকম তারা শুনেছে কি না। অথবা, খুনের কোনও কাহিনি তাদের কানে এসেছে কি না। কিন্তু বিশদভাবে কেউই কিছু বলতে পারল

না। অবশ্য না পারাটা আশ্চর্যের নয়। কারণ, হোটেলের মালিক ও কর্মচারীদের বয়েস পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের নীচেই। তখন ঠিক করেছি, আশপাশের বয়স্ক লোকদের কাছে একটু খোঁজখবর করে দেখব। আর সেইরকম খোঁজ করতে গিয়েই আলাপ করলাম রসুলের সঙ্গে।

রসুল এক বৃদ্ধ শিকারা-মালিক। সে বলল যে, হ্যাঁ, বছর তিরিশ-পঁয়ত্রিশ আগে একজন বাঙালি যুবকের লাশ ভেসে উঠেছিল লেকে। তবে এদিকটায় নয়, চার চিনারের দিকটায়। ছেলেটি খুন হয়েছিল, কিন্তু খুনি ধরা পড়েনি। ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল সব। কারণ, শ্রীনগরে এসে বাঙালি ছেলে খুন হয়েছে এটা রটে গেলে ট্যুরিস্টরা ভয় পেয়ে যাবে, সকলের ব্যবসা মার খাবে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে কোথাও খুব একটা হইচই হয়নি।

'আচ্ছা, ছেলেটির বউ ছিল কি না মনে আছে?'

'ভাসা-ভাসা মনে পড়ছে যেন। মেয়েটা কাশ্মীরী ছিল না। লাশ যেদিন পাওয়া যায় সেদিন খুব কান্নাকাটি করেছিল।'

'সে কি এখনও বেঁচে আছে? কোথায় থাকে জানা আছে কি?'

'না, সেরকম কিছু জানি না। বিদেশি যখন, তখন নিশ্চয়ই এ-দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তবে এটা মনে আছে যে, মেয়েটা একটা হাউসবোটে থাকত।'

'কোন দিকটায়?'

নেহরু পার্ক থেকে লাল চকের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল রসুল।

সেদিকে তাকিয়ে অসংখ্য হাউসবোট আমার চোখে পড়ল। তার মধ্যে কোনটা সে দেখাতে চাইছে তা আল্লা জানেন।

এইরকম দু-একটা চেষ্টা অসফল হওয়ার পর যখন উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি, ঠিক তখনই রেসিডেন্সি রোডে টমাসকে আমি দেখতে পেলাম।

শীতের পোশাকে মুখ খানিকটা ঢাকা থাকায় টমাস আমাকে চিনতে পারেনি। তা ছাড়া, রাস্তায় লোকজনের ভিড় থাকায় তেমন করে খেয়ালও করেনি আমাদের। কিন্তু আমি ওকে স্পষ্ট চিনতে পারলাম। নিকির কাছ থেকে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়ে বললাম যে, পরের দিন সকালে ও যেন আমার হোটেলে আসে। আমার হঠাৎ একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেছে।

ও কিছু একটা ভাবছিল। হেসে বলল, 'ও. কে., তবে কাল তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।'

আমি বললাম, 'কী?'

ও বলল, 'উঁহু, কাল—।'

তারপর হাত নেড়ে চলে গেল।

আমিও হন্তদন্ত হয়ে টমাসকে অনুসরণ করলাম।

কিছুটা পথ হেঁটে টমাস ডাল লেকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা শিকারা ডেকে তাতে চড়ে বসল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগলাম শেষ পর্যন্ত ও কোথায় যায়।

সার-সার হাউসবোট ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মতো ডাল লেকের জলে দাঁড়িয়ে। সেদিকেই যাচ্ছে টমাসের শিকারা। সময় যেন্ আর কাটতে চায় না। আমার বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হতে লাগল।

একসময়ে টমাসের শিকারা গন্তব্যে পৌঁছল।

জানলাগুলো সবুজ পরদায় ঢাকা একটা সুদৃশ্য হাউসবোট। তার ছাদে বিশ্রাম-বারান্দা। বারান্দার মাথায় সবুজ কাপড়ের ছাউনি। শিকারা ছেড়ে টমাস ঢুকে গেল হাউসবোটটার ভেতরে।

ওটাই কি জেসমিনের ঠিকানা? নাকি-অন্যান্য অনেক ট্যুরিস্টের মতো টমাসও ওই হাউসবোটের বোর্ডার মাত্র? নেহরু পার্ক এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়! তা হলে কি...।

সামান্য হলেও এই আলোর ইশারাকে উপেক্ষা করা যায় না। অতএব মোটামুটি খুশিমনেই হোটেলে ফিরে এলাম। ঠিক করলাম, মাকে, মিতাকে আজ চিঠি লিখব। তারপর নিকিতার সারপ্রাইজের অপেক্ষায় থাকব।

জেসমিন ও টমাসের ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত শুরু করব পরশুদিন থেকে। কিন্তু তখন জানতাম না, নিয়তির অভিসন্ধি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম।

হোটেলে এসে নিকি বলল, 'চলো, আজ আমাদের বাড়িতে যাবে। সেখানে তোমার চায়ের নেমন্তন্ন।'

আমি বললাম, 'এটাই তোমার সারপ্রাইজ?'

ও বলল, 'হ্যাঁ—।'

আমি নিকিকে দেখছিলাম। মেরুন রঙের ফুলহাতা সোয়েটার। গলায় কালো স্কার্ফ। আর সাদা জিন্‌স।

ও এত কাছে বসে অথচ মায়া বলে ভ্রম হচ্ছিল। লাউঞ্জে আমরা ছাড়াও আরও দু-চারজন বসেছিল। মাঝে-মাঝে লক্ষ করে দেখেছি পুরুষদের মুগ্ধ চোখ নিকিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর উঠে বসলাম একটা সুসজ্জিত শিকারায়। ডাল লেকের জল কেটে শিকারা এগিয়ে চলল। আমরা তখন গল্পে মশগুল।

হঠাৎই একসময় নিকি বলল, 'মাকে তোমার কথা বলেছি।'

আমার যেন চমক ভাঙল। নিকি সবসময় আমাকে নিজের কথাই বলেছে, বাড়ির কথা বিশেষ বলেনি। আমিও কোনও প্রশ্ন করিনি। সবসময়ই ভেবেছি, ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার অধিকার আমি পেয়েছি কি না। তাই আজ ওর কথা শুনে ভীষণ ভালো লাগল। মনে হল, হয়তো আমার স্বপ্ন একেবারে অলীক নয়। বুকটা কেঁপে উঠল আনন্দে-প্রত্যাশায়। সেই মুহূর্ত থেকে নিকিকে নিয়ে আমি নতুন-নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

স্বপ্ন ভাঙল জেসমিনকে দেখে।

আমাদের শিকারা তখন একটা হাউসবোটের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছে।

চমক ভেঙে দেখি, বোটের জানলায় সবুজ পরদা। ছাদে সবুজ চাঁদোয়ার ছাউনি। এই হাউসবোটেই কি গতকাল আমি টমাসকে ঢুকতে দেখেছিলাম? কী জানি!

জেসমিন হাউসবোটের সামনের রেলিঙ ঘেরা ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। জেসমিন! সেই জেসমিন! আমার গতজন্মের জেসমিন!

মাথায় পঞ্চাশভাগ রুপোলি চুল। মুখের একদা-মসৃণ চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। পরনে আধুনিক পোশাক। কপালে একটা লাল পটি বাঁধা।

জেসমিন নিকির দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওর হাসিটা সেই আগের মতোই আছে। হাসির বয়েস এতটুকু বাড়েনি। হাসির মৃত্যু হয়নি, পুনর্জন্ম হয়নি। কিন্তু দীর্ঘকাল কাশ্মীরে থাকার জন্যে মুখ থেকে খাসিয়া বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকটাই মিলিয়ে গেছে। আমার সবকিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল। আর একইসঙ্গে বুকের ভেতরে কেউ যেন এভারেস্ট আর কাঞ্চনজঙ্ঘা গড়িয়ে দিচ্ছে। বারবার ডিমডিম শব্দে বেজে উঠছে দুন্দুভি। ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে সেই বাজনা।

নিকি তখনই ডেকে উঠল, 'মা! এই দ্যাখো, কাকে ধরে নিয়ে এসেছি!'

আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসতে চাইল। একটা অদ্ভুত জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরতে লাগল পাঁজরের খাঁচায়। পাহাড়গুলো ঠোকাঠুকি লেগে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল।

শিকারা থেকে হাউসবোটের সিঁড়িতে পা রাখল নিকি। আমাকে হাত ধরে সাহায্য করল। জেসমিনের হাউসবোটে পা রাখলাম। বোটের গায়ে নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড ঝুলছে: 'ওয়াটার-বার্ড, ডাল লেক, শ্রীনগর।'

জাতিস্মার পাখির কথা জেসমিন তা হলে ভোলেনি!

বারান্দায় দাঁড়িয়েই নিকি পরিচয় করিয়ে দিল।

'মা, ওর কথাই তোমাকে বলেছিলাম। রণবীর—রণবীর চৌধুরী। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের লেকচারার...আমার সাবজেক্ট।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে নিকি বলল, 'আমার মা—।'

জেসমিন হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, 'গত কয়েকদিন ধরে মেয়ের মুখে খালি তোমার কথা। "তুমি" বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো!'

আমি কথা বললাম এই প্রথম, 'না, না, মনে করার কী আছে।'

জেসমিনের হাত ধরলাম। ঠান্ডা অথচ কোমল। ভাবতে অবাক লাগে, এই কোমল শীতল হাত গতজন্মে আমাকে খুন করেছিল। আর যখন খুন করেছিল, তখন আমার ভালোবাসার পরমাণু আশ্রয় নিয়েছিল ওর শরীরে। প্রতি পলে অনুপলে বেড়ে উঠছিল।

সেই পরমাণু এখন নিকি? সত্যিই কি? তা হলে ওর বয়েস দেখে যা মনে হয়, তা নয়। নিকি আমার প্রায় সমবয়েসী। হয়তো কোনও কারণে, বাধা-বিপত্তিতে, ওর পড়াশোনা পিছিয়ে গেছে।

আমি আশ্চর্য চোখে মা ও মেয়েকে দেখছিলাম। নিকিকে আমার এখনও ভালো লাগছিল।

জেসমিন আমাকে ডাকল, 'এসো, ভেতরে এসো—।'

কার্পেট বিছানো সরু করিডর ধরে ওকে অনুসরণ করলাম। আমার পিছনে নিকি। ও তখন কাশ্মীর নিয়েই কীসব কথা বলছিল। আমার কানে কিছু ঢুকছিল না। আমি জেসমিনকে দেখছিলাম। আশ্চর্য! মাথার চুলটুকু ঢেকে দিলে পিছন থেকে দেখে ওর বয়েস বোঝা শক্ত। ওর চলার ছন্দে এখনও হিল্লোলের অবশেষ রয়েছে।

একটা সুদৃশ্য ঘরে গিয়ে বসলাম আমরা।

মোগল কায়দায় সুসজ্জিত ঘর ও ঘরের আসবাবপত্র। নিকিকে সে-কথা বলায় ও বলল, সেটাই নাকি রেওয়াজ।

ঘরের কার্পেট, কাঠের দেওয়ালের কারুকাজ, জাফরি, টেবিল-চেয়ার, সবই যেন আকবরী আমল থেকে তুলে আনা। সব মিলিয়ে ঘরটাকে যেন চেনা মনে হল। কিন্তু চেনা হওয়ার তো কথা নয়! কারণ, শক্তি ও জেসমিন একটা হাউসবোট ভাড়া করে তাতে ট্যুরিস্ট হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। আর এই 'ওয়াটার-বার্ড'-এর মালিক জেসমিন নিজে। হয়তো সব হাউসবোটের সাজসজ্জা অনেকটা একরকম।

আলো কম হওয়ায় নিকি সুইচ টিপে দুটো মনোহারী বাতি জ্বেলে দিল। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বলল, 'তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বলো, আমি কিচেন থেকে আসছি—।'

নিকি চলে গেল।

আমি জেসমিনকে দেখতে লাগলাম। ও মাথার লাল পটিটা খুলে ফেলল। সেটা ভাঁজ করে পাশের একটা ছোট টেবিলের ওপরে রাখল। কিছুক্ষণ উসখুস করার

পর জেসমিন কথা বলল, 'কাশ্মীর কেমন ঘোরা হল তোমার?'

বললাম, 'ভালো। নিকি না থাকলে কী যে করতাম...।'

'নিকিকে তুমি পছন্দ করো?' সন্দেহ ফুটে উঠল জেসমিনের চোখে।

'হ্যাঁ, ভীষণ—।'

আঙুলের ডগায় আঙুল ঠেকিয়ে চোখ নামিয়ে বলতে লাগল ও, 'অনেক ট্যুরিস্টই বেড়াতে আসে, এসে এখানকার মেয়েদের পছন্দ করে। তারপর—।'

আমি কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম। কী করে আসল কথা শুরু করব সেটাই এতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম। জেসমিনের কথা শুনে খানিকটা রাগ হল। সঙ্গে বিরক্তিও। ও কি শক্তি সরকারের কথা ভেবে এসব ইঙ্গিত করছে? সুতরাং প্রথম তির ছুড়ে দিলাম।

'আমি কন্ট্রাক্টরির কাজ করি না। আপনি যা বলতে চাইছেন, বুঝেছি। নিকিকে আমি ভালোবাসি। ওকে আমি বিয়ে করতে চাই—যদি অবশ্য ওর আপত্তি না থাকে।' একটু থেমে স্পষ্ট স্বরে যোগ করলাম, 'আর, আপনার সম্পত্তির একটি পয়সাও আমি চাই না।'

পরিষ্কার লক্ষ করলাম জেসমিন ধাক্কা খেল। ও অবাক চোখে আমাকে দেখতে লাগল, আমাকে বুঝতে চাইল।

এমনসময় নিকি এসে ঘরে ঢুকল। হাতে চা ও খাবারের ট্রে। টেবিলে সব নামিয়ে রেখে হুকুম করল, 'স-ব খেতে হবে। তোমার পছন্দ এ-ক'দিনে জেনে গেছি, সেগুলোই তৈরি করেছি। অবশ্য মা-ও অনেক সাহায্য করেছে।'

আমি হেসে খাবারের প্লেটের দিকে হাত বাড়ালাম। আড়চোখে দেখলাম, জেসমিন তখনও প্রথম ধাক্কা সামলে উঠে সহজ হতে পারেনি।

নিকি ওর মায়ের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলছিল।

আমি হঠাৎ জিগ্যেস করলাম, 'তুমি খাসিয়া ভাষা জানো?'

নিকি আমার দিকে ঘুরে তাকাল। বলল, 'অল্প-অল্প, তবে মা ভালো জানে।'

আমি জেসমিনের চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'সিম্ মানে কী বলতে পারেন?'

জেসমিন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিল। বলল, 'পাখি। কিন্তু হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করছ?'

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। সুরভিত চা। নেশা ধরে যায়।

'আসামের জাটিঙ্গা নামে একটা পাহাড়ি গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে কুয়াশা ভরা রাতে আলো দেখলে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ে আসে—ঠিক শ্যামাপোকার মতো। তখন খাসিয়া ছেলেছোকরাগুলো "সিম্! সিম্!" বলে চেঁচায়, তাই জিগ্যেস করছি...।'

নিকি শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেল। বলল, 'সত্যি! আমাকে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যাবে! আমি তোমাকে কাশ্মীর ঘুরিয়ে দেখিয়েছি, তার বদলে তুমি আমাকে জাটিঙ্গা ঘুরিয়ে দেখাবে। প্রমিস!'

'না!'

জেসমিনের আচমকা ধমকে আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম।

'কী বলছ, মা!'

জেসমিন নিকিকে শাসনের সুরে কী একটা বলল। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ও কান্না চাপতে-চাপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে আমার চোয়াল শক্ত হল। যুদ্ধের জন্য নিজেকে তৈরি করলাম।

সন্দেহ-কুটিল চোখে আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে জেসমিন প্রশ্ন করল, 'সত্যি করে বলো, তুমি কে?'

শান্ত গলায় বললাম, 'রণবীর চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স পড়াই।'

মনে পড়ল, টমাসও আমাকে একইরকম প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু টমাস এখন কোথায়?

আমার উত্তরে জেসমিন কী বুঝল কে জানে। নিজেকে সংযত করে বলল, 'আমার মেয়েকে তুমি ছেড়ে দাও।'

'আমি ছেড়ে দেওয়ার কে! তা ছাড়া, হঠাৎ আপনি এ-কথা বলছেনই-বা কেন!'

জেসমিন থতমত খেল। সহজ হওয়ার চেষ্টা করল। বলল, 'না, মানে, তোমার বাড়ির তরফে আপত্তি উঠতে পারে। তা ছাড়া—।'

আমি বললাম, 'বাড়ির আপত্তি উঠবে না। আপনার আপত্তি না থাকলেই হল।'

একটু থেমে আবার বললাম, 'অবশ্য নিকির বাবার মতামতটাও নেওয়া দরকার—।'

জেসমিন অনেকক্ষণ ধরে আমার চোখে কী যেন খুঁজল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এসো আমার সঙ্গে—।'

আমি দুরুদুরু বুকে ওকে অনুসরণ করলাম।

যে-নতুন ঘরটায় এসে আমরা ঢুকলাম, সেটা শোওয়ার ঘর। নীল-সবুজ বেডকভারে ঢাকা বিছানার ঠিক পাশেই একটা ছোট টেবিল। টেবিলের ওপরে শক্তি সরকারের ফটো। ফটোর সামনে কয়েকটা রঙিন ফুল।

আমার কেমন অদ্ভুত লাগছিল।

জেসমিন ছোট্ট করে বলল, 'নিকির বাবা।'

আমি ছবিটা দেখছিলাম। চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না গতজন্মে এই ছবিটা কখন কোথায় কে তুলেছিল।

জেসমিন আবার বলল, 'নিকির জন্মের আগেই ওর বাবা মারা যায়—।'

আমি চুপচাপ শক্তিকে দেখছিলাম।

'অনেক কষ্ট করে আমি নিকিকে মানুষ করেছি, পড়িয়েছি, শিখিয়েছি, বড় করেছি। ওর হোস্টেলের খরচ চালানোর জন্যে আমাকে একসময় চাকরিও করতে হয়েছে—।'

'কোথায়? হাফলঙের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে?'

জেসমিনের মুখ পাথর হয়ে গেল। ও আমাকে দেখতে লাগল। মুখ ফ্যাকাশে, সাদা। কোনওরকমে ও কথা শেষ করল, 'আমি চাই নিকি সুখী হোক—।'

'আমিও চাই।'

কথাটা বলেই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

করিডরে পা রেখেই নিকিকে দেখতে পেলাম। বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মনটা কেমন ভারী হয়ে গেল। সেইসঙ্গে খুব রাগ হল জেসমিনের ওপরে। নিকি আমার! ওকে কেউ কষ্ট দিলে আমার বুক ভেঙে যায়। যেমন এখন যাচ্ছিল।

বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে পেছনে পায়ের শব্দ পেলাম। তাকিয়ে দেখি বিহ্বল-বিমূঢ় জেসমিন আমাকে অনুসরণ করেছে।

বারান্দায় এসে নিকিকে ডাকলাম, 'নিকি—।'

ও ঘুরে তাকাল। বুকটা মুচড়ে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে। নিকির চোখে জল। হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরলাম। নিচু অথচ স্পষ্ট গলায় বললাম, 'তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

আমার বুকের ভেতরে একটা ক্ষ্যাপা চিতাবাঘ দাপাদাপি করছিল। নিকিকে পেয়ে হারানোর কথা আমি ভাবতে পারছিলাম না। স্থান-কাল ভুলে গিয়ে নিকির চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। ও অল্প-অল্প হাসতে চেষ্টা করল।

জেসমিন সব দেখছিল। হঠাৎ ক্ষিপ্তভাবে চিৎকার করে মেয়েকে কী যেন বলল। তারপর আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে বলল, 'চলে যাও, এখানে আর কোনওদিন এসো না—।'

আমার মাথায় ভিসুভিয়াস জ্বলে উঠল, বললাম, 'আমাকে শক্তি সরকার পাওনি। আমাকে শেষ করা অত সহজ হবে না।'

স্পষ্ট দেখলাম, শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে জেসমিন বারান্দার রেলিং শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল।

একটা শিকারা ডেকে আমি তাতে উঠে বসলাম। শক্তির মৃত্যু-দৃশ্যটা চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগল।

ঝকঝকে সূর্য তখন ডাল লেকের জলে কাঁপছে।

সাত

অস্থির মন নিয়ে হোটেলের ঘরে বসেছিলাম। টমাসের ঘর থেকে নিয়ে আসা জেসমিনের ফটোটা দেখছিলাম। জেসমিন কি সত্যিই শক্তিকে এখনও ভালোবাসে? নইলে এখনও ওর ছবিতে নিয়মিত ফুল দেয় কেন? অথচ এই স্বামীকেই তিরিশ বছর আগে নিজের হাতে ও খুন করেছিল!

আমার সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। তিরিশ বছরের পুরনো এক আবর্তে আমি যেন ঘুরপাক খাচ্ছি। নিকিতা আমাকে হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে, অথচ আমি বারবার পিছলে তলিয়ে যাচ্ছি অশান্ত ঘূর্ণিতে। জেসমিন আর টমাস যেন আমার পা ধরে টানছে। আমার নাকে-মুখে জল ঢুকে যাচ্ছে অনবরত। টমাস কি জেসমিনকে সাহায্য করতেই জাটিঙ্গা থেকে ছুটে এসেছে এখানে? গতবারের মতো?

সকালবেলা টমাসকে আমি হাউসবোটে দেখিনি। হয়তো কোথাও বেরিয়েছিল। কিন্তু ও কবে এসে উঠেছে জেসমিনের বোটে? এর মধ্যে কি জাটিঙ্গার সমস্ত ঘটনা ও জেসমিনকে বলেনি? জেসমিন এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছে আমিই জাটিঙ্গায় ওর খোঁজখবর করে বেড়িয়েছি। হয়তো ভাবছে, আমি পুলিশের লোক। কিংবা কোনও বেসরকারি গোয়েন্দা, তিরিশ বছর আগেকার একটা খুনের তদন্ত করে বেড়াচ্ছি। আমার আসল পরিচয়টা নিশ্চয়ই ও জানে না। কারণ টমাসও সেটা ঠিক বুঝতে পারেনি।

শ্রীনগরে এসে শরীরটা যত সুস্থ হয়ে উঠছে, মনটা যেন ততই অস্থির হয়ে পড়তে চাইছে। স্বপ্নের মিছিল এখন আর একেবারে নেই। মাথার ব্যথা যে কোনওদিন ছিল তা বিশ্বাসই হতে চায় না। ঘুম বেশ গভীর হচ্ছিল ক'দিন ধরে। কিন্তু আজ সকাল থেকেই সব এলোমেলো হয়ে গিয়ে দুশ্চিন্তার জটিল জাল ভর করেছে মাথায়। এখন আমি কী করব? পালিয়ে যাব কাশ্মীর ছেড়ে? ভুলে যাব জেসমিনের কথা, টমাসের কথা, তিরিশ বছর আগেকার কথা? ভুলে যাব নিকির কথা? তা হলেই কি বাকি জীবনটা নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারব আমি? কে দেবে এমন প্রতিশ্রুতি?

এমনসময় দরজায় কেউ নক করল। হাতের ফটোটা রেখে দিলাম বিছানার ওপরে।

সূর্য অস্ত গিয়ে আকাশ আঁধারি হয়েছে। জানলার কাচের গায়ে হিম জমছিল। ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

জেসমিন!

ঢোলা পোশাকের ওপরে একটা কালো শাল জড়িয়ে এসেছে ও। শালের ঘোমটা থেকে ওর ফরসা মুখটুকু শুধু উঁকি মারছে। সে-মুখে হত্যাকারীর ছাপ নেই, বরং

দেখা যাচ্ছে বিপর্যস্ত-বিহ্বল এক মাকে।

জেসমিন দ্রুত আমাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। দরজা ভেজিয়ে আমি ঘুরে তাকালাম। জেসমিন তখন বিছানায় রাখা ফটোটা দেখছে। দু-চোখে শঙ্কার গভীর ছাপ।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, টমাস ওকে জাটিঙ্গার সব ঘটনাই খুলে বলেছে।

আমি এক পা এগিয়ে যেতেই জেসমিন ঘুরে তাকাল আমার দিকে : 'তুমি কে? কী চাও আমার কাছে?'

আমি হাসলাম 'আমি কে সে তো জানেন। আর, কী চাই? ....সে কি আমি নিজেই ঠিকমতো জানি!'

একটা চেয়ার দেখিয়ে ওকে বললাম, 'বসুন। বলুন, কী দরকারে এসেছেন আমার কাছে?'

জেসমিন চেয়ারে বসল। মাথা নিচু করে শালের প্রান্ত খুঁটতে লাগল। সময় নিচ্ছে ও। হিসেব কষছে মনে-মনে।

অনেকক্ষণ পরে ও বলল, 'শক্তি সরকার তোমার কে হয়?'

আমি কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। কী জবাব দেব এ-প্রশ্নের! লক্ষ করলাম, জেসমিন আমার দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছে।

কিছুক্ষণ পরে ও আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি জাটিঙ্গায় গিয়েছিলে কেন? কেন খোঁজ করছিলে আমার, শক্তির?'

'আপনার গল্পটা আমার জানতে ইচ্ছে করছিল।'

জেসমিন সন্দেহ-কুটিল চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি ঠিক করলাম, আর নয়। জেসমিনকে সরাসরি কিছু বলা দরকার। কাশ্মীরে আসার আগে আমি শুধু জেসমিন, শক্তি ও টমাসের গল্পটাই জানতে চেয়েছি, খুঁজেছি। জেসমিনকে খুঁজে পেলে কী বলব, কী করব, তাও মোটামুটি একরকম ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু নিকিতা—নিকি, আমার সব হিসেব ওলটপালট করে দিয়েছে। ওর কথা জাটিঙ্গাতেও কেউ বলেনি। হয়তো জেসমিন ও টমাস দুজনেরই এই মেয়েটির কথা সকলের কাছে গোপন করে এসেছে।

জেসমিন বলল, 'সকালে চলে আসার আগে তুমি ওই কথাটা বললে কেন? শক্তির বিষয়ে তুমি কতটুকু জানো?'

আমাকে শক্তি সরকার পাওনি, আমাকে শেষ করা অত সহজ হবে না।

জেসমিন কথাটা ভুলতে পারেনি।

সুতরাং ওকে বললাম, 'শক্তি সরকার কন্ট্রাক্টরির কাজে জাটিঙ্গা গিয়েছিল। তোমাকে ভালোবেসে ও বিয়ে করে। অবশ্য টাকার লোভেও হতে পারে। কারণ,

তখন ওর ব্যাবসায় টাকার টান পড়েছিল। ফাদার ওবেস্টিন তোমাদের বিয়ে দেন জাটিঙ্গার গির্জায়। তারপর তোমরা হানিমুন কাটাতে চলে আস এখানে, শ্রীনগরে। শক্তির স্বভাব খারাপ ছিল। নেশা করত, জুয়া খেলত, অন্য মেয়েদের দিকে নজর দিত। তোমাকে মারধোরও করত হয়তো। খুব কুৎসিত ছিল ওর মুখের ভাষা, তোমাকে কম খারাপ কথা ও বলেনি। টমাস তোমাকে হয়তো ভালোবাসত—জানি না। ও জাটিঙ্গা থেকে ছুটে এসেছিল তোমার দুঃখের খবর পেয়ে। তোমার চিঠি ওকে শ্রীনগরে টেনে এনেছিল। তারপর—।'

'তারপর?' জেসমিনের মুখে লালচে আভা ফুটে বেরোচ্ছে। ও আঙুল তুলে বাঁ-চোখের নীচটা বারকয়েক চুলকে নিল।

আমি লম্বা শ্বাস নিলাম। বললাম, 'তারপর একদিন সন্ধ্যায়, অথবা রাতে, শক্তি সরকার মারা গেল।'

জেসমিন উঠে দাঁড়াল। সাপের চকিত ছোবলের মতো ছিটকে এল আমার কাছে। তীব্রস্বরে বলল, 'মিথ্যে কথা!'

আমার মাথার মধ্যে আগুনের শিখাটা ফুঁসে উঠছিল। হঠাৎই সেটা তিন-চার হাত লাফিয়ে উঠল দপ্ করে।

বললাম, 'হ্যাঁ, মিথ্যে কথা তো বটেই! এও মিথ্যে কথা যে, তুমি আর টমাস মিলে ওকে লাঠির বাড়ি মেরে, বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুন করেছ! এও মিথ্যে কথা যে, ওর বুকে বর্শার শেষ আঘাতটা তুমিই দিয়েছিলে!' আমি জেসমিনের দু-কাঁধ খামচে ধরলাম, 'আর এও মিথ্যে কথা যে, তোমার ডান ঊরুর কোলে একটা বাদামি তিল আছে?'

জেসমিন আমার দু-হাতের মধ্যে কাঁপতে লাগল। কোনওরকমে বলল, 'তুমি, তুমি এসব কী করে জানলে?'

আমার চোখ জ্বালা করছিল। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'সত্যিই তো, কী করে জানব, আমি তো সেদিন মরে গেছি! লেকের জল আমার নাকে-মুখে ঢুকে পড়েছিল। ঝাঁজি জড়িয়ে গেছিল হাত-পায়ে—।'

জেসমিনের চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। ও একটা আর্ত চিৎকার করে উঠল। ওর শরীর অবশ হয়ে গেল আচমকা। আমি দু-হাতে ওর ওজন সামলাতে পারছিলাম না। ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল ঘরের মেঝেতে।

আর ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গেল শব্দ করে।

টমাস দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠে। বাঁ-হাতে একটা বর্শা অথবা বল্লম। সেটা লাঠির মতো ভর দিয়ে রেখেছে মেঝেতে। ওর চোয়ালে কালশিটের দাগ এখনও রয়েছে। জাটিঙ্গার স্মৃতি। অবশ্য আমার গায়ের দাগগুলোও এখনও মেলায়নি।

জেসমিন অসহায়ভাবে আমাকে দেখছিল। ওর বয়েস যেন একশো পেরিয়ে গেছে। টমাসকে হাজির হতে দেখেই বোধহয় কিছুটা আশ্বস্ত হল ও। উঠে দাঁড়াল ধীরে-ধীরে।

টমাস দাঁতে দাঁত চেপে কী একটা বলল। তারপর ক্ষিপ্র পায়ে একটু ঢুকে এল ঘরের ভেতরে। বল্লমটা উঁচিয়ে ধরে বলল, 'তিরিশ বছর আগে একটা বাঙালি খুন হয়েছিল এখানে। আজও একটা খতম হবে।'

সামনের দিকে চোখ রেখেই পা দিয়ে লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করে দিল টমাস। আরও কয়েক পা এগিয়ে এল।

জেসমিন একবার আমাকে দেখছে, আর-একবার দেখছে টমাসকে। কী করবে বা বলবে ঠিক যেন ভেবে উঠতে পারছে না। টমাস আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই জেসমিন চাপা আর্তনাদ করে উঠল। বল্লমের ফলা আমার বাঁ-হাতে গেঁথে গেল। আমি ডানহাতে লাঠিটা চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। টমাস টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে এল সামনে। আমি গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে এক প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে দিলাম ওর দু-পায়ের ফাঁকে।

জেসমিন জানলার দিকে সরে গেল ভয়ে। কান্না মেশানো গলায় কী যেন বলল টমাসকে। অনুনয়ের সুর স্পষ্ট ধরা পড়ল সেই কথায়। কিন্তু টমাসের তখন জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা নেই। বল্লম খসে পড়েছে হাত থেকে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে চেপে ধরেছে দু-পায়ের সন্ধিস্থল।

আমার হাত কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। ঘরটা যেন দুলছে চোখের সামনে। দৃষ্টিও কি ঝাপসা হয়ে আসছে?

দেখলাম, টমাস বল্লমটা আবার তুলে নিল। প্রচণ্ড চেষ্টায় সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। ওর ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা।

জেসমিন আবার চিৎকার করে উঠল আতঙ্কে। দু-হাত তুলে ইশারায় মানা করল বারবার। তারপর ছুটে গেল টমাসের কাছে। টমাস বাঁ-হাতের ঝটকায় ওকে ছিটকে ফেলে দিল। তারপর ইংরেজিতে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'জেসমিন, শক্তির মতো এই লোকটাও তোমাকে বিপদে ফেলতে চায়। নইলে তোমার কষ্টের দিনে এ ছিল কোথায়! যখন তুমি সর্বস্ব দিয়ে নিকিতাকে মানুষ করছিলে তখন এই লোকটা আসেনি কেন! না, ওকে আজ ছাড়ছি না!'

জেসমিনের নিষেধ, কান্না, সবই অগ্রাহ্য করে মারমুখো টমাস আরও এগিয়ে এল। আমার মাথার ভেতরে অসংখ্য হাউই আগুনের লেজ নেড়ে একসঙ্গে উঠে গেল আকাশে। তারপর শুরু হল বিস্ফোরণ—একের পর এক।

টমাস যখন আমার বুক লক্ষ করে বল্লম চালাল তখন দু-হাতে চকিতে চেপে ধরলাম বল্লমের লাঠিটা। টাল সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। টমাস লাঠির পিছনে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। এই কি শেষ? গতজন্মের মতো এ-জন্মেও কি আমার অপমৃত্যু হবে? মা, মিতা, নিকি, ওদের ছেড়ে চলে যেতে হবে?

শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে এক ঝটকা দিলাম। বল্লমটা ঘুরিয়ে দিলাম মেঝের দিকে। টমাসের কাঁধে পা দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিলাম। ওর দেহটা লাট্টুর মতো চারপাক ঘুরে ছিটকে পড়ল হাত-কয়েক দূরে। বল্লম ঠিকরে গেল ওর হাত থেকে।

আমি ক্ষ্যাপা নেকড়ের মতো লাফিয়ে উঠে ঝটিতি তুলে নিলাম বল্লমটা। বুকের ভেতরে শক্তি সরকার জেগে উঠল। টমাস তখনও নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি। বল্লমটা দু-হাতে উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে বললাম, 'মরতে আমি ভয় পাই না, জেসমিন। কারণ, মরলেও আবার আমি ফিরে আসব। তোমরা আমাকে জন্মের মতো শেষ করতে পারবে না! আবার আমি আসব! অন্য নাম নিয়ে অন্য মুখ নিয়ে আবার আমি ফিরে আসব!'

জেসমিন কাঁদতে-কাঁদতে খাসিয়া ভাষায় কী যেন বলল টমাসকে। সঙ্গে-সঙ্গে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল টমাস। ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। তাজ্জব চোখে দেখতে লাগল আমাকে। মেঝে থেকে ওঠার চেষ্টাও করল না এতটুকু। ও বোধহয় এই মুহূর্তে জানল আমার দু-জন্মের কথা।

আমি ওর দিকে এক পা এগোতেই দরজায় শব্দ হল। উদভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকে পড়ল নিকিতা। ওর পেছনে হোটেলের দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে।

ঘরের দৃশ্য দেখে নিকি চিৎকার করে উঠল।

রক্তে আমার জামাকাপড় মাখামাখি। টমাস মেঝেতে শুয়ে। আর জেসমিন হাতে মুখ ঢেকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

জেসমিন নিকির নাম ধরে ডাকল। ও ফিরে তাকাল না। শুধু আমাকেই দেখছিল। আমি বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছিলাম। বল্লমটা ফেলে দিলাম মেঝেতে। আর নিকি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে।

আমি ওকে জাপটে ধরলাম। অস্ফুট যন্ত্রণা মেশানো এক টুকরো কান্না বেরিয়ে এল আমার ঠোঁট চিরে। নিকি আমার মাথায় তখন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

একটু পরে নিকিকে ছেড়ে আমি সবাইকে দেখলাম। আশ্চর্য! নিকির উপস্থিতি মানুষগুলোকে যেন আমূল পালটে দিয়েছে। টমাস উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জেসমিনের পাশে। দুজনেই চুপ। আর অপরিচিত অথচ মুখ-চেনা তিনজন মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে হতভম্ব।

আমি নিকিকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসালাম, নিজেও বসলাম। আজ পর্যন্ত ওকে আসল কথাগুলো বলা হয়নি, বলিনি। এখন সব বললাম সংক্ষেপে। শেষে বললাম, 'আমি এখনও তোমাকে ভালোবাসি।'

ও গলার স্কার্ফ খুলে আমার আহত হাতটা বেঁধে দিল। বলল, 'আমিও।'

নিকি শান্তভাবে সব শোনার পর উঠে গিয়ে হোটেলের লোকদের কী সব বলল। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চলে গেল। তখন নিকি তাকাল টমাসের দিকে। আদেশের সুরে কী যেন বলল। টমাস চোখ নামিয়ে বল্লমটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। নিকি ওর পিছন-পিছন গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর জেসমিনকে বলল, 'মা, রণবীরকে তোমরা আর যন্ত্রণা দিয়ো না। গতজন্মে ও অনেক কষ্ট পেয়েছে। এ-জন্মে আমরা সুখী হতে চাই।'

জেসমিন এখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। ও অবাক স্বরে বলল, 'কী বলছিস তুই! গতজন্মে ও কে ছিল জানিস?'

নিকি হাসল। বলল, 'জানতে চাই না। ও-নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও। আমি শুধু এ-জন্মের কথা ভাবতে চাই।'

আমি বললাম, 'জেসমিন, তোমরা যদি আমাকে রেহাই দাও তা হলে গতজন্মের খুনের কথা আমি ভুলে যাব। তা ছাড়া, শক্তি সরকার মানুষটা সত্যিই অমানুষ ছিল। সেই সময়ে তোমার অবস্থাটার কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিছু-কিছু কথা আমার এখনও মনে আছে—।'

জেসমিনকে আমি আর কী শাস্তি দেব! একজন্মেই ও অনেক কষ্ট পেয়েছে।

জেসমিন নিকিকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। নিকি মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল পিঠে হাত বুলিয়ে।

জেসমিন শান্ত হলে নিকি বলল, 'তোমার সঙ্গে কিছুদিন আমার দেখা হবে না, মা। রণবীরের সঙ্গে আমি চলে যাব—।'

জেসমিন আবার কেঁদে উঠল। বিহ্বল চোখে আমাকে দেখতে লাগল। হয়তো আমার মধ্যে গতজন্মের শক্তির মুখটা ও খুঁজে পেতে চাইছিল প্রাণপণে।

নিকি বলল, 'টমাসকে বোলো, আজকের ঘটনা যাতে বেশিদূর না গড়ায় সে-ব্যবস্থা করতে। নইলে তোমাদেরই অসুবিধে হবে—।'

জেসমিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিকিকে চুমু খেল। তারপর দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল, আমি ওকে ডাকলাম। বিছানা থেকে মলিন ফটোটা তুলে নিয়ে দিলাম ওর হাতে। ও ডুকরে উঠে বুকে চেপে ধরল ফটোটা। তারপর আঙুল বাড়িয়ে আমার গাল, ঠোঁট, চিবুক স্পর্শ করল। গভীর চোখে অনেকক্ষণ ধরে দেখল আমাকে। আমিও তাকিয়ে রইলাম এই অসহায় মহিলার দিকে। সারাটা জীবন কী কষ্টই না ওকে করতে হয়েছে!

অস্ফুট গলায় জেসমিন বলল, 'গুড বাই, শক্তি—।'

তারপর সর্বহারা পায়ে বেরিয়ে গেল ঘরের দরজা খুলে। একঝলক ঠান্ডা বাতাস ঘরে ঢুকল।

দরজাটা বন্ধ করে নিকি আবার আমার কাছে এল। বলল, 'চলো, তোমাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'তেমন দরকার নেই। কাল গেলেও হবে।'

ও বলল, 'না, এখনই। কারণ, কাল থেকে আবার আমরা কাশ্মীর দেখতে বেরোব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন? একবার তো দেখেছি—।'

ও বলল, 'সে-দেখাকে দেখা বলে না। তখন তোমার মধ্যে দু-জন্মের দুটো মানুষ ছিল। এখন শুধু তুমি, রণবীর চৌধুরী।'

আমি ওকে কাছে টেনে নিলাম। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের পর আবার যেন চাঁদ ধীরে-ধীরে ফুটে উঠছে। আমার মনটা ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছিল। নাম-না-জানা কোনও সৌরভ ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমার নাক। নিকির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'কাল থেকে কি আমাদের হানিমুন শুরু হবে?'

ও ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ। তারপর তোমার সঙ্গে সোজা কলকাতা।'

আমি বললাম, 'এম. এসসি. ফাইনালের তা হলে কী হবে?'

'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি এর মধ্যেই উঠে গেছে?' নিকি বলল।

আমি হাসলাম 'হ্যাঁ, প্রায় সেইরকমই অবস্থা। কারণ, সেখানকার মাস্টারমশাই এখন কাশ্মীরে হানিমুনের পরিকল্পনা ভাঁজছে।'

নিকি আমার চুল ধরে টেনে দিল।

আমি ওর কাঁধে মুখ ঘষতে-ঘষতে বললাম, 'এ-জন্মে আমি আর মরতে চাই না।'

ও নরম গলায় বলল, 'আমিও।'
